অনুবর্তন

ওয়েলেসলি স্ট্রীটের আর পিটার লেনের মোড়ে ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল-বাড়িটা বেশ সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। বেলা দশটা। ছাত্রের দল ইতিমধ্যে আসিতে শুরু করিয়াছে, বড়লোকের ছেলেরা মোটরে, মধ্যবিত্ত ও গরিব গৃহস্থের বাড়ির ছেলেরা পদব্রজে। স্কুলের পুরানো চাকর মথুরাপ্রসাদ ছেঁড়া ও মলিন খাকির চাপকান পরিয়া তৈরি, চাপকানের হাতের কাছটাতে রাঙা সুতায় একটাফুটবলের শিল্ডের মতো নকশার মধ্যে ইংরেজি ‘এম’ ও ‘আই’ অক্ষর দুইটি জড়াপট্টি খাইয়াশোভা পাইতেছে; কারণ, স্কুলের নাম মডার্ন ইনস্টিটিউশন, যদিও হেডমাস্টার ক্লার্কওয়েল সাহেবের ব্যক্তিগত চিঠির উপরে ছাপানো আছে‘ক্লার্কওয়েল’স মডার্ন ইনস্টিটিউশন’, আসলেসেটা ভুল; কারণ স্কুলটি সাহেবের নিজের নয়, অনেক দিনের পুরানো স্কুল, কমিটির হাতে আছে, ক্লার্কওয়েল সাহেব আজ পনেরো বছর এখানকার বেতনভোগী হেডমাস্টার মাত্র।

এই স্কুল-বাড়ির দোতলায় পিছন দিকের তিনটি ঘর হেডমাস্টারের থাকিবার জন্য নির্দিষ্ট আছে—ঘরের সামনেই ক্লাসরুম, কাজেই পর্দা ফেলা। ক্লার্কওয়েলের বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি, মাথার চুল সাদা, মোটাসোটা, সর্বদা ফিটফাট হইয়া থাকেন, টাইটা এদিক ওদিক নড়িবার জো নাই, শার্টের সামনেটা নিখুঁত ইস্ত্রি করা, চকচকে কলার, ভাল কাটছাঁটের কোট, পেন্টালুনের পাদুটিতে চমৎকার ভাঁজ, যাহাকে বলে নাইফ্-এজ-ক্রিজ’—ছুরির ফলার মতো সরু খাঁজ। সাহেবঅবিবাহিত, কেউ কেউ বলে সাহেবের স্ত্রী আছে, কিন্তু সে সাহেবের কাছে থাকে না। তবে এখানে মিস্ সিবসন নামে একজন তরুণী ফিরিঙ্গী মেম সাহেবের সঙ্গেই থাকে, কেউ বলে সাহেবের শালী, কেউ বলে কীরকম বোন, কেউ বলে আর কিছু—মিস্ সিবসনও স্কুলের টিচার, নীচের ক্লাসে ইংরেজি পড়ায় ও উচ্চারণ শেখায়।

মিস্ সিবসনের নামে এ স্কুলে নীচের ক্লাসের দিকে ছোট ছোট ছেলের বেশ ভিড়। আশপাশের অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা মেমসাহেবের কাছে পড়িতে পাইবে ও নিখুঁত ইংরেজি উচ্চারণ শিখিতে পাইবে, এই লোভে ছেলেদের এই স্কুলে ভর্তি করে। বেলা দশটা বাজিতে না বাজিতে ছোট ছোট ছেলেরা স্কুলের সামনের কম্পাউন্ডে ছুটাছুটি করিতেছে, মার্বেল খেলিতেছে, মারামারি করিতেছে, হৈ-চৈ, চিৎকার লাফালাফি দাপাদাপি জুড়িয়া দিয়াছে।

হঠাৎ দোতলার জানালাপথে ক্লার্কওয়েল সাহেবের মুখখানা বাহির হইল ও বিষম বাজখাঁই চিৎকার শোনা গেল : ও, ইউ মথুরা, স্টপ দি নয়েজ—বাবালোগকো চুপ করনে বোলো—

মুহূর্তে সব চুপ।

ছেলেরা মুখ উঁচু করিয়া হেডমাস্টারকে দেখিয়া লইল, এবং এ ওর মুখের দিকে চাহিয়াযে যাহার মার্বেল পকেটের মধ্যে পুরিয়া ফেলিল ও উদ্যত ঘুষি নামাইল।

—মথুরা—এই মথুরা—পুনরায় হেডমাস্টারের গম্ভীর আওয়াজ।

নীচের ছোট্ট কুঠুরির মধ্যে বসিয়া চাপকান-পরিহিত বৃদ্ধ মথুরা তামাক খাইতেছিল, সে তাড়াতাড়ি হুঁকা রাখিয়া বাহির হইয়া আসিয়া উপরের দিকে চাহিল।

—পহেলা ঘণ্টি মারো, সওয়া দশ হো গিয়া—

দিক্‌বিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া দীর্ঘসময়ব্যাপী স্কুল বসিবার প্রথম ঘণ্টা বাজিয়া চলিল— থামিতে আর চায় না। অনেক ছোট ছোট ছেলের মন বিষণ্ণ হইয়া উঠিল—এই এখন যে স্কুলবসিবার ঘণ্টা পড়িতেছে, কলির সবে শুরু। এযাত্রা কি আর ছুটির ঘণ্টা বাজিবার সম্ভাবনা আছে? মোটে সওয়া দশ, আর কোথায় সেই সাড়ে তিন। সাড়ে তিনটাতে নীচের ছোটছেলেদের ক্লাসের ছুটি।

ক্লার্কওয়েল তাড়াতাড়ি টেবিলে বসিয়া এক প্লেট সরু চালের ভাত, দুইটি কাঁচা টোমাটো, একটা বড় কাঁচকলা-সিদ্ধ, কিছু কাঁচা লেটুস শাক ও কপির পাতা কুচানো, এক ফালি নারিকেলও দুইখানা মুরগির ঠ্যাং-সিদ্ধ খাওয়া শেষ করিয়া হাঁকিলেন, কেবলরাম!

বাবুর্চী কেবলরাম হিন্দু। সাহেবের কাছে অনেক দিন আছে, সেও কায়দা-দুরস্তভাবে সাদা উর্দি পরিয়া, মাথায় সাদা পাগড়ি বাঁধিয়া তৈরি—সাহেবের বাবুগিরি করে এবং স্কুলের সময়েরেজিস্ট্রি-খাতাপত্র এ ক্লাস হইতে ও-ক্লাসে বহিয়া লইয়া যায়, জল তোলে, ছেলেদের জল দেয়—এজন্য স্কুল হইতেই সে বেতন পাইয়া থাকে, সাহেবের খানা পাকাইবার জন্য সে কেবলসাহেবের কাছে খোরাকি পায় মাত্র।

কেবলরাম শশব্যস্ত হইয়া বলিল, হুজুর!

—মেমসাহেব কাঁহা?

—এখনও আসতেছেন না কেন, অনেকক্ষণ তো গেছেন! আলেন বলে হুজুর, ধর্মতলায়ওষুধ আনতি গেছেন।

কেবলরামের বাড়ি যশোর ও খুলনার সীমানায়।

—মেমসাহেবকো খানা টেবিলমে রাখ দো। আউর তুম চলা যাও ইউনিভার্সিটি, পিওনবুককা অন্দর দো লেফাফা হ্যায়—

—হুজুর, ইউনিভার্সিটি এখনও খোলেনি, এগারো বাজলি তবে বাবুরা আসবেন—মেমসাহেবের খানা দিয়ে তবে গেলি চলবে না হুজুর?

—বহুৎ আচ্ছা, চা দো।

সকালে ভাত খাওয়ার পর চা-পান ক্লার্কওয়েলের বহুদিনের অভ্যাস।

এই সময় উঁচু গোড়ালির জুতা খটখট করিতে করিতে মিস সিবসন ঘরে ঢুকিল।কৃশাঙ্গী, লম্বা, মুখে পুরু করিয়া পাউডার, ‘ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষা, হাতে হ্যান্ডব্যাগ ঝোলানো। বয়সকম হইলেও গালে ইতিমধ্যেই মেছেতা পড়িতেছে। মুখ ফিরাইয়া চোখ ঘুরাইয়া বলিল, ডিয়ারি, ইউ হ্যাভ ফিনিশড অলরেডি?

—ইয়েস, ডু ইউ গবল আপ কুইক্‌লি, ফার্স্ট বেল ইজ গন্‌, ইউ আর রাদার লেট ফর মীল!সরু গলায় গানের সুরে কথা বলিয়া মেমসাহেব পাশের ঘরে ঢুকিল।

ক্লার্কওয়েল উঠিয়া দাঁড়াইলেন, স্কুলের পোশাক পরিয়াই তিনি খানার টেবিলেবসিয়াছিলেন, বাহিরে চাহিয়া পর্দার ফাঁক দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন, ক্লাসরুমে ছেলেআসিয়াছে কি না। ঢং ঢং করিয়া স্কুল বসিবার ঘণ্টা পড়িল। ক্লার্কওয়েল শশব্যস্ত হইয়া ঘরেরবাহির হইয়া নীচের গাড়িবারান্দায় স্কুলের ছেলেদের সমবেত প্রার্থনায় যোগ দিতে নামিয়া গেলেন।

ক্লার্কওয়েল দোর্দণ্ডপ্রতাপ জাঁহাবাজ হেডমাস্টার। ছাত্র ও মাস্টারেরা সমানভাবে ভয়ে কাঁপে তার দাপটে—পুরো অটোক্র্যাট, কথা বলিলে তার নড়চড় হইবার জো নাই, হুকুমের বিরুদ্ধে কমিটিতে আপীল নাই—কমিটির মেম্বাররা সবাই বাঙালি, সাহেবকে খাতির করিয়া চলা তাহাদের বহুদিনের অভ্যাস, স্কুলের মাস্টারদের ডিক্রি ডিসমিসের একমাত্র মালিক তিনিই।

সুতরাং আশ্চর্য না যে, তাহার সিঁড়ি দিয়া দুপ দুপ করিয়া নামিবার সময় দুই-একজন মাস্টার, যাঁহারা হেডমাস্টারের অলক্ষে তাড়াতাড়ি হাজিরা-বই সই করিতে দোতলায় আপিসঘরেযাইতেছিলেন, তাহারা একটু সঙ্কুচিত সুরে ‘গুডমর্নিং স্যার’ বলিয়া এক পাশে রেলিং ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া হেডমাস্টারকে নামিবার পথ বাধামুক্ত করিয়া দিলেন—যদিও তাহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক; কারণ চওড়া সিঁড়ি উভয় পক্ষের নামিবার ও উঠিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত। ইহা বিনয়েরএকপ্রকার রূপ, প্রয়োজনের কার্য নহে।

ক্লাস বসিয়া গেল। ক্লার্কওয়েল হাজিরা-বই খুলিয়া দেখিয়া হাঁকিলেন, মি. আলম।

সফরুদ্দিন আলম এম-এ, স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার। বয়স ত্রিশের মধ্যে, আইন পাশ করিয়া আজ বছর চার-পাঁচ মাস্টারি করিতেছে, ধূর্ত চোখ, চটপটে ধরনের চালচলন—লোক ভাল নয়। হেডমাস্টারের দক্ষিণ-হস্তরূপ, মাস্টারেরা ভয় করিয়া চলে, ভালবাসে না।

আলম বলিল, ইয়েস স্যার।

—আজ প্রেয়ারের সময় শ্রীশবাবু আর যদুবাবু অনুপস্থিত। ওদের ডাকাও।

—স্যার, যদুবাবু আর শ্রীশবাবুকে বলে বলে পারলাম না, রোজ লেট স্যার, আপনি একটুবলে দিন ওদের।

লাগাইতে-ভাঙাইতে আলমের জুড়ি নাই বলিয়া মাস্টারের দল তাহাকে বিশেষ সমীহকরিয়া চলে।

আলম মাস্টারদের ঘরে গিয়া সুমিষ্ট স্বরে বলিল, যদুবাবু, শ্রীশবাবু, হেডমাস্টারআপনাদের স্মরণ করেছেন। শরৎবাবু কোথায়?

যদুবাবু বয়সে প্রবীণ, চালচলন ক্ষিপ্রতাবর্জিত, রোগা, মাথার চুল কাঁচা-পাকায় মিশানো।তিনি ধীরে ধীরে টানিয়া বলিলেন, কেন আমায় অসময়ে স্মরণ—

—আপনি প্রেয়ারের সময় কোথায় ছিলেন ?

—আসতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। কেন?

—হেডমাস্টার নোট করেছেন—

যদুবাবু উষ্মাসহকারে বলিলেন, ওঃ, তবেই আমার সব হল! নোট করেচেন তো ভারিইকরেচেন! গেরস্ত মানুষ, ঘড়ির কাঁটা ধরে আসা সব সময় চলে না।

মি. আলম চুপ করিয়া রহিল।

টিফিনের পর যদুবাবুর পুনরায় ডাক পড়িল আপিসে। ক্লার্কওয়েল বলিলেন, ওয়েলযদুবাবু, আমার স্কুলে শুনলাম আপনার অসুবিধে হচ্ছে?

যদুবাবু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, কেন স্যার? বুঝিলেন, আলমের কাছে ওবেলা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সাহেবের কানে উঠিয়াছে।

—আপনার রোজ লেট হচ্ছে স্কুলে, অথচ ঘরের কাজ ঠিকমতো করতে পারছেন নাশুনলাম!

—ঘরের কাজ? না স্যার, ঘরের কাজ ঠিক—তার জন্যে কি—

ক্লার্কওয়েল সাহেব বলিলেন, বসুন ওখানে। এখন কোন্ ক্লাস আছে?

—আজ্ঞে, থার্ড ক্লাসে হিস্ট্রির ঘণ্টা।

—আচ্ছা, যাবেন এখন। আপনি আজ প্রেয়ারের সময় ছিলেন না, রোজই থাকেন না।

—আমি কেন স্যার, শ্রীশ থাকে না, হীরেনবাবু থাকে না, ক্ষেত্রবাবু থাকে না।

—আমি জানি কে কে থাকে না। আপনার বলার আবশ্যক নেই। আপনি ছিলেন না কেন? লেট করেন কেন রোজ ?

—খেতে একটু দেরি হয়ে যায় স্যার। —বেশ, মাই গেট্ ইজ ওপন্। আপনার অসুবিধে হলে আপনি চলে যেতে পারেন।

যদুবাবু নিরুত্তর রহিলেন। সাহেবের আড়ালে যাহাই বলুন, সামনাসামনি কিছু বলিবার সাহস তাহার নাই। অন্তত একদিন কেহ দেখে নাই।

—আচ্ছা, যান ক্লাসে। কাল থেকে আমার আপিসে এসে সই করবেন আগে।

যদুবাবু পরের ক্লাসের ঘণ্টা পড়িলে আপিসে আসিয়াই ক্ষেত্রবাবুকে সামনে দেখিতে পাইলেন। তখনও অন্য কোনো শিক্ষক আপিস-ঘরে আসেন নাই।

ক্ষেত্রবাবু সুর নীচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তলব হয়েছিল কেন ?

মধুবাবু বলিলেন, ওঃ, অত আস্তে কথা কিসের? বলব সোজা কথা, তার আবার অতঢাক-ঢাক গুড়-গুড়—

হঠাৎ যদুবাবুকে বাক্শক্তিরহিত হইতে দেখিয়া ক্ষেত্রবাবু সবিস্ময়ে পিছন ফিরিয়াচাহিলেন। একেবারে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার মি. আলমের সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল।

আলম বলিল, ক্ষেত্রবাবু, ফোর্থ ক্লাসে একজামিনের পড়া দেখিয়ে দিয়েছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—যদুবাবু?

—কাল দেব।

—কেন, আজই দিন না।

—কাল দিলে ক্ষতি কিছু নেই।

অল্পক্ষণ পরে হেডমাস্টারের আপিসে যদুবাবুর আবার ডাক পড়িল।

হেডমাস্টার বলিলেন, যদুবাবু, আপনি ফোর্থ ক্লাসে কী পড়ান?

—হিস্ট্রি স্যার।

—ওদের উইকলি পরীক্ষা হবে এই শনিবার, পড়া দেখিয়ে দিয়েছেন?

—না স্যার, কাল দেব।

—ওরা ক'দিন সময় পাবে তৈরিহতে, তা ভেবে দেখলেন না! ছেলেদের কাজ যদি নাহয়, তেমন মাস্টার এ স্কুলে রাখাও যা, না রাখাও তাই। মাই ডোর ইজ ওপন্—আপনার না পোষায়, আপনি চলে গেলে কেউ বাধা দেবে না।

যদুবাবু বিনীতভাবে জানাইলেন, তিনি এখনই ক্লাসে গিয়া পড়া বলিয়া দিতেছেন।

—তাই যান। পড়া দিয়ে এসে আমাকে রিপোর্ট করবেন।

—যে আজ্ঞে স্যার।

আপিসে আসিয়া যদুবাবুলম্ফঝম্প আরম্ভ করিলেন। অন্য কেহ সেখানে ছিল না, শুধু হেডপণ্ডিত ও ক্ষেত্রবাবু।।

—ওই আলম, ওটা একেবারে অন্ত্যজ—লাগিয়েছে গিয়ে অমনি হেডমাস্টারের কাছে। কথা পড়তে না পড়তে লাগাবে—এমন করলে তো এ স্কুলে থাকা চলে না দেখছি! বললাম যেফোর্থ ক্লাসের একজামিনের পড়া দিচ্ছি দেখিয়ে—তা না, অমনি লাগানো হয়েছে! এ রকমকরলে কি মানুষ টেকে মশাই?

বলা বাহুল্য, যদুবাবু জানিতেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার এ ঘণ্টায় নীচের হলে অ্যাডিশনালহিস্ট্রি ক্লাস লইতেছেন।

ক্ষেত্রবাবু নীরব সহানুভূতি জানাইয়া চুপ করিয়া থাকাই নিরাপদ মনে করিলেন। তিনিছাপোষা মানুষ, আজ সতেরো বছর ত্রিশ টাকা বেতনে এই স্কুলে চাকরি করিতেছেন। বেলেঘাটা অঞ্চলে একটিমাত্র ঘর ভাড়া লইয়া আছেন, সকালে ও সন্ধ্যায় সামান্য একটু হোমিওপ্যাথিকরিয়া আর কিছু উপার্জন করেন। চাকুরিটুকু গেলে এ বাজারে পথে বসিতে হইবে।

হেডপণ্ডিত মশায় বৃদ্ধ লোক, তিনি ক্লার্কওয়েল সাহেবের পূর্ব হইতে এ স্কুলে আছেন—তিনি আর নারাণবাবু। অনেক মাস্টার আসিল, চলিয়া গেল, তিনি ঠিক আছেন। মেজাজ দেখাইতে গেলে চাকরি করা চলে না। তবে তিনি ইহাও জানেন, লম্ফঝম্প করা যদুবাবুর স্বভাব, শেষ পর্যন্ত কোনো দিক হইতেই কিছু দাঁড়াইবে না।

এই সময় নারাণবাবু ঘরে ঢুকিলেন। তিনিও বৃদ্ধ, এই স্কুলেরই একটি ঘরে থাকেন—নিজে রান্না করিয়া খান। আজ পঁয়ত্রিশ বছর এ স্কুলে আছেন এবং এইভাবেই আছেন। বৃদ্ধের নিকটকেহ কখনও তাহার কোনো আত্মীয়স্বজনকে আসিতে দেখে নাই। রোগা, বেঁটে-চেহারার মানুষটি, পাকশিটে গড়ন, গায়ে আধময়লা পাঞ্জাবি, ততোধিক ময়লা ধুতি, পায়ে চটি জুতা।

নারাণবাবু পকেট হইতে একটি টিনের কৌটা বাহির করিয়া একটি বিড়ি ধরাইলেন।ক্ষেত্রবাবু হাত নাড়াইয়া বলিলেন, দিন একটা, কাঠিটা ফেলবেন না।

নারাণবাবু বলিলেন, কী হয়েছে, আজ যদুবাবুকে হেডমাস্টার ডাকিয়েচে কেন?

যদুবাবু চড়াগলায় মেজাজ দেখানোর সুরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, সেই কথাই তোবলছি। শুধু শুধু ওই অন্ত্যজটা আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে—

নারাণবাবু বলিলেন, আস্তে, আস্তে—

যদুবাবু গলা আরও এক পর্দা চড়াইয়া বলিলেন, কেন, কিসের ভয়? যদু মুখুজ্জে ওসবগ্রাহ্যি করে না। অনেক আলম দেখে এসেছি, থার্ড ক্লাস এম-এ—তার বাবার প্রতাপটা কিসেরহ্যাঁ? কেবল লাগানো-ভাঙানো সব সময়! অত লাগানোর ধার ধারে কে? উনি ভাবেন, সবাইওঁকে ভয় করে চলবে। যে চলে সে চলুক, যদু মুখুজ্জে সে রকম বংশের—

বাহিরে বুট জুতার শব্দ শোনা গেল—মি. আলমের পায়ে বুট আছে সবাই জানে—যদুবাবু হঠাৎ থামিয়া গেলেন। ক্ষেত্রবাবু বলিয়া উঠিলেন, যাই, খড়িটা দিন নারাণবাবু দয়া করে, ক্লাস আছে।

নারাণবাবু বলিলেন, চল, আমিও যাই। ওরে কেবলরাম, ইন্ডিয়ার বড় ম্যাপখানা দে তো—

কিন্তু দেখা গেল, যে ঘরে ঢুকিল সে মি.আলম নয়, বইয়ের দোকানের একজন ক্যানভাসার—এক হাতে ব্যাগ ঝোলানো, অন্য হাতে কিছু নতুন স্কুল-পাঠ্য বই। ক্যানভাসারের সুপরিচিত মূর্তি। ক্যানভাসারের প্রশ্নের উত্তরে তাহাকে হেডমাস্টারের আপিস দেখাইয়া দিয়াযদুবাবু পুনরায় শুরু করিলেন, হ্যাঁ, আমি যা বলব এক কথা। কাউকে ভয় করে না এই যদুমুখুজ্জে। বলি বাবা, এ স্কুল গড়ে তুলেছে কে? ওই নারাণ বাঁড়ুজ্জে আর হেডপণ্ডিত। সাহেবএল তো কাল, উড়ে এসে জুড়ে বসেচে—আর ওই অন্ত্যজ—

মি. আলমের প্রবেশটা একটু অপ্রত্যাশিত ধরনে ঘটিল।

যদুবাবু হঠাৎ ঢোঁক গিলিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

মি. আলমের ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্র ও সংযত। মুখের উপর কেহ গালাগালি দিলেও মি.আলমের কথাবার্তা বা ব্যবহারে কখনও রাগ প্রকাশ পায় না। আলম বলিল, ক্ষেত্রবাবুর একটিদরখাস্ত দেখলাম হেডমাস্টারের টেবিলে, কাল আসবেন না। কী কাজ?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আজ্ঞে, কাল আমার ভাগ্নীর বিয়ে।

—তা একদিন কেন, দু’দিন ছুটি নিন না। আমি সাহেবকে বলে দেব এখন।

ক্ষেত্রবাবু বিনয়ে গলিয়া গিয়া বলিলেন, যে আজ্ঞে। তাই দেবেন বলে। আমার সুবিধে হয় তা হলে—থ্যাঙ্কস।

—নো মেনশন্।

ছুটির ঘণ্টা এইবার পড়িবে। শেষের ঘণ্টাটা কি কাটিতে চায় ? ক্ষেত্রবাবু ও যদুবাবুতিনবার ঘড়ি দেখিতে পাঠাইলেন। চারিটা বাজিতে পনেরো মিনিট, আট মিনিট—এখনও চারমিনিট।

স্কুল-ঘরের নীচের তলায় একটা অন্ধকূপ ঘরে থার্ড পণ্ডিত জগদীশ ভট্চাজ জ্যোতির্বিনোদ মশায় আছেন। বাড়ি পূর্ববঙ্গে, দশ বৎসর এই স্কুলে আছেন, কুড়ি টাকায়ঢুকিয়াছিলেন, এখনও তাই—গত দশ বৎসরে এক পয়সাও মাহিনা বাড়ে নাই। অবশ্য অনেকমাস্টারেরই বাড়ে নাই—হেডমাস্টার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার ছাড়া। হেডমাস্টারের মাহিনাগত চারি বৎসরের মধ্যে দুই শত টাকা হইতে দুই শত পঁচাত্তর এবং মি. আলমের মাহিনা ষাটহইতে পঁচাশি হইয়াছে।

ভুলিয়া যাইতেছিলাম, মিস সিবসনের মাহিনা গত দুই বৎসরে এক শত হইতে দেড় শতদাঁড়াইয়াছে।।

উপরের তিনজনের মাহিনা বছর বছর বাড়িয়া চলিয়াছে, অথচ নীচের দিকের শিক্ষকগণের বেতনের অঙ্ক গত দশ পনেরো বিশ বৎসরেও দারুব্রহ্মবৎ অনড় ও অচল আছেকেন—এ প্রশ্ন উত্থাপন করিবার সাহস পর্যন্ত কোনো হতভাগ্য শিক্ষকের নাই। সে কথা থাক।

জগদীশ জ্যোতির্বিনোদ সিক্সথ ক্লাসে বাংলা পড়াইতেছিলেন। তিনি শেষ ঘণ্টার দীর্ঘতায়অতিষ্ঠ হইয়া একটি ছেলেকে ঘড়ি দেখিতে পাঠাইলেন। আপিস-ঘরে ঘড়ি। সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া ঘাড় বাড়াইয়া চালাক ছেলেরা ঘড়ি দেখিয়া ফিরিয়া আসে, যাহাতে হেডমাস্টারের চোখে না পড়িতে হয়। কিন্তু ভাঙা পা খানায় পড়ে! জগদীশ জ্যোতির্বিনোদের প্রেরিত হতভাগ্য ছাত্রটিএকেবারে হেডমাস্টারের সামনে পড়িয়া গেল—ঘড়ি দেখিতে চেষ্টা করিবার অবস্থায়।

ক্লার্কওয়েল ভীমগর্জনে হাঁকিলেন, হোয়াট ইউ আর ট্রাইং টু লুক অ্যাট? ইউ! কাম আপ!

ছোট ছেলে, কাঁপিতে কাঁপিতে আপিস-ঘরে ঢুকিল। সেখানে মি. আলম বসিয়া ছিল।

আলম জিজ্ঞাসা করিল, কী করছিলে নন্দ?

—ঘড়ি দেখছিলাম স্যার।

—কেন ? ক্লাসে কেউ নেই?

—আজ্ঞে, থার্ড পণ্ডিতমশাই আছেন। তিনি ঘড়ি দেখতে পাঠিয়ে দিলেন।

আলম ও হেডমাস্টার পরস্পরের দিকে চাহিলেন।

—আচ্ছা, যাও তুমি।

মি. আলম বলিলেন, চলবে না স্যার। কতকগুলো টিচার আছে, একেবারে অকর্মণ্য, শুধুঘড়ি দেখতে পাঠাবে ছেলেদের। কাজে মন নেই। এই থার্ড পণ্ডিত একজন, যদুবাবু, হীরেনবাবু, শরৎবাবু আর ওই হেডপণ্ডিত—

একটা নোটিস লিখে দিন মি. আলম, স্কুল-ছুটির পরে মাস্টারেরা সব আমার সঙ্গে দেখা না করে না যায়। ঘণ্টা দিতে বারণ করে দিন, নোটিস ঘুরে আসুক।

মি. আলম হাঁকিল, কেবলরাম, ঘণ্টা দিয়ো না।

একে ঘণ্টা কাটে না, তাহার উপর ক্লাসে হেডমাস্টারের নোটিস গেল—ছুটির পর কোনো মাস্টার চলিয়া যাইতে পারিবে না, হেডমাস্টার তাহাদের স্মরণ করিয়াছেন।

হেডমাস্টারের আপিস-ঘরে একে একে যদুবাবু, শরৎবাবু, নারাণবাবু প্রভৃতি আসিয়া জুটিলেন। জ্যোতির্বিনোদ মশায় সকলের শেষে কম্পিত দুরুদুরু বক্ষে প্রবেশ করিলেন; কারণতিনি সেই ছেলেটির মুখে শুনিয়াছেন সবকথা। তাহার জন্যই যে এই বিচার-সভার আয়োজন, তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকি নাই।

হেডমাস্টার বলিলেন, ইজ এভরিবডি হিয়ার?

মি. আলম উত্তর দিলেন, ক্ষেত্রবাবু আর হেডপণ্ডিতকে দেখছিনে।

নারাণবাবু বলিলেন, ক্লাসে রয়েছেন, আসছেন।

কথা শেষ হইতেই তাহারাও ঢুকিলেন।

—এই যে আসুন, আপনাদের জন্যে সাহেব অপেক্ষা করছেন।

ক্লার্কওয়েল শিক্ষকদের সভায় অতি তুচ্ছ কথা বলিবার সময়ও জজসাহেবের মতোগাম্ভীর্য ও আড়ম্বর প্রদর্শন করিয়া থাকেন, বাজেট সভায় বাজেট পেশ করিবার সময় অর্থসচিবযত না বাগ্মিতা দেখান তদপেক্ষা বাগ্মিতা দেখাইয়া থাকেন। তিনি বর্তমানে চেয়ার ছাড়িয়াউঠিয়া টাই ধরিয়া কখনও দক্ষিণে কখনও বামে

হেলিয়া গম্ভীর সুরে আরম্ভ করিলেন, টিচার্স, আজ আপনাদের ডেকেচি কেন, এখনি বুঝবেন। আমরা এখানে কতকগুলি তরুণ আত্মারউন্নতির জন্যে দায়ী (বড় বড় কথা বলিতে ক্লার্কওয়েল সাহেব খুব ভালবাসেন), আমরা শুধু মাইনে নিয়ে ছেলেদের ইংরেজি শেখাতে আসিনি, আমরা এসেছি দেশের ভবিষ্যৎ আশার স্কুলবালকদের সত্যিকার মানুষ করে তুলতে। আমরা তাদের সময়নিষ্ঠা শেখাব, কর্তব্যনিষ্ঠাশেখাব—তবে তারা ভবিষ্যতে সুনাগরিক হয়ে দেশের বড় বড় কার্যভার হাতে নিয়ে নিজেদের জীবন সার্থক করে তুলতে পারবে, সেই সঙ্গে দেশেরও শ্রীবৃদ্ধি হবে।

দুই-একজন শিক্ষক বলিলেন, ঠিক কথা, ঠিক কথা।

—এখন দেখুন, যদি আমরাই তাদের সময়নিষ্ঠা ও কর্তব্যানুরাগ না শিখিয়ে ফাঁকি দিতেশেখাই, যদি আমরা নিজেরা নিজেদের কর্তব্য-কাজে অবহেলা করি, তবে সে যে কত বড় অপরাধ, তা ধারণা করবার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে অনেকের নেই দেখা যাচ্ছে। শিক্ষকতা শুধু পেটের ভাতের জন্যে চাকরি করা নয়, শিক্ষকতা একটু গুরুতর দায়িত্ব—এই জ্ঞান যাদের না থাকে, তারা শিক্ষক এই মহৎ নামের উপযুক্ত নয়।

দুই-চারিজন শিক্ষক মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিলেন।

—আমি জানি, এখানে এমন শিক্ষক আছেন যাদের মন নেই তাদের কাজে। তাঁদের প্রতিআমার বলবার একটিমাত্র কথা আছে। মাই গেট ইজ্ ওপন—তাঁরা দিব্যি তার মধ্যে দিয়ে হেঁটেবেরিয়ে চলে যেতে পারেন, কেউ তাঁদের বাধা দেবে না।

হেডমাস্টার কটমট করিয়া যদুবাবু, থার্ডপণ্ডিত ও হেডপণ্ডিতের দিকে চাহিলেন।

—আজকের ঘটনাই বলি। আপনাদের মধ্যে কোনো একজন শিক্ষক আজ আপিসে ঘড়িদেখতে পাঠিয়েছিলেন একটি ছেলেকে। তিনি যে কতবড় গুরুতর অন্যায় করেছেন, তা তিনিবুঝতে পারছেন না। এতে প্রমাণ হল যে, কর্তব্যকাজে তাঁর মন নেই, কখন ঘণ্টা শেষ হবেসেজন্য তাঁর মন উসখুস করছে—তাঁর দ্বারা সুচারুরূপে শিক্ষকের কর্তব্য কখনই সম্পন্ন হতে পারে না।সুকুমারমতি বালকদের সামনে তিনি কী আদর্শ দাঁড় করাবেন? কাজে ফাঁকি দেবার আদর্শ, কর্তব্যে অবহেলার আদর্শ—কী বলেন আপনারা?

সকলেই মাথা এক পাশে হেলাইয়া বলিলেন, ঠিক কথা।

—এখন আমি আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সে শিক্ষকের প্রতি আর ভালব্যবহার করা চলে কি? তাঁর দ্বারা এ স্কুলের কাজ চলে কি? বলুন আপনারা? আমি মি. আলমকেএই প্রশ্ন করচি। মি. আলম একজন কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষক বলে আমি জানি। আর একজন ভালশিক্ষক আছেন—নারাণবাবু, তার প্রতিও আমি এই প্রশ্ন করচি।

ক্ষেত্রবাবু, যদুবাবু ও থার্ড পণ্ডিত তিনজনেরই মুখ শুকাইল। তিনজনেই ঘড়ি দেখিতেপাঠাইয়াছিলেন, তিনজনের প্রত্যেকেই ভাবিলেন তাহার উদ্দেশেই হেডমাস্টারের এই বক্তৃতা।নারাণবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, একটা কথা আছে আমার স্যার।

—কী, বলুন?

—এবার তাঁকে ক্ষমা করুন, তিনি যেই হোন, আমার নাম জানবার দরকার নেই, এবার তাঁকে ক্ষমা করুন। ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিন স্যার।

হেডমাস্টারের কণ্ঠস্বর ফাঁসির হুকুম দিবার প্রাক্কালে দায়রা-জজের মতো গম্ভীর হইয়াউঠিল।

—না নারাণবাবু, তা হয় না। আমি নিজের কর্তব্য-কর্মে অবহেলা করতে পারব না—আমিএই ইনস্টিটিউশনের হেডমাস্টার, আমার ডিউটি একটা আছে তো? আমি চোখ বুজে থাকতে পারি নে। আমার কর্তব্য এখানে সুস্পষ্ট, হয়তো তা কঠোর, কিন্তু তা করতে হবে আমায়। আমিসেই টিচারকে সাসপেন্ড করলাম।

হঠাৎ যদুবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, স্যার, আমি ঘড়ি দেখতে কোনোদিন পাঠাইনিআজ পাঠিয়েছিলাম, তার একটা কারণ ছিল স্যার, আমার স্ত্রী অসুস্থ, ডাক্তার আসবে চারটের পরেই—তাই—এবারটা আমায়—

তিনি এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া এই কৈফিয়তটি তৈরি করিতেছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশাস, তাঁহারই উদ্দেশে হেডমাস্টার এতক্ষণ ধরিয়া বাক্যবাণ বর্ষণ করিলেন। বলা বাহুল্য, কৈফিয়তটিরমধ্যে সত্যের বালাই ছিল না।

হেডমাস্টারের চোখ কৌতুকে নাচিয়া উঠিল। তাহার একটা কারণ, যদুবাবু কোনোদিনইবাগ্মী নহেন, বর্তমানে ভয় পাইয়া যে কথাগুলি বলিলেন, সেগুলির ইংরেজি বারো আনা ভুল।অথচ যদুবাবু ব্যাকরণ পড়ান ক্লাসে—ইংরেজির কী কী ভুল হইল, তিনি নিজেও তাহা বলিবারপরক্ষণেই বুঝিয়া লজ্জিত হইয়াছেন, কিন্তু বলিবার সময় কেমনহইয়াযায় সাহেবের সামনে।

হেডমাস্টার বলিলেন, আপনি প্রায়ই ও-রকম করে থাকেন কিনা সে সব এখানে বিচার্যবিষয় নয়। আপনার কর্তব্য-কর্মে অবহেলা একবারও আমি ক্ষমা করতে পারিনে।

নারাণবাবু উঠিয়া বলিলেন, এবার আমাদের অনুরোধটা রাখুন স্যার।

—আচ্ছা, আমি একজনের সম্বন্ধে সে অনুরোধ মানলাম। কারণ তার বাড়িতে গুরুতর পারিবারিক কারণ আছে তিনি বলছেন। একজন শিক্ষক মিথ্যে কথা বলছেন, এ রকম ধরেনেওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আমি থার্ড পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করি, তাঁর কী কারণ ছিল ঘনঘন ঘড়ি দেখবার? তিনি স্কুলেই থাকেন। তাঁর কোনো তাড়াতাড়ি দেখি না। তাঁকে ক্ষমা করতে পারিনা, তাকে আমি সাসপেন্ড করলাম।

থার্ড পণ্ডিত এবার দাঁড়াইয়া কাঁদো কাঁদো সুরে বাংলায় বলিলেন, (তিনি ইংরেজি জানেননা), সাহেব, এবার আমায় ক্ষমা করুন, আমি এমন আর কখনও করব না। . ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন, খুব বাঁচিয়া গিয়াছি এ যাত্রা। আমিও যে ঘড়ি দেখিতে পাঠাই, সেটাকেহ জানে না।

হেডমাস্টার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, আমার হুকুম নড়ে না। ছেলেদের প্রতি কর্তব্যপালন আগে করতে হবে, তারপর ব্যক্তিগত দয়া-দাক্ষিণ্য। সামনের বুধবারে স্কুল কমিটির মিটিংআছে, সেখানে আমি আপনার কথা ওঠাব। কমিটির অনুমতি নিয়ে আপনার শাস্তির ব্যবস্থাহবে। আপনি কাল থেকে আর ক্লাসে যাবেন না। কতদিন আপনাকে সাসপেন্ড করা হবে, সেটা কমিটি ঠিক করবেন।

সভা ভঙ্গ হইল। হেডমাস্টার গটগট করিয়া আপিস ছাড়িয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। মাস্টারেরাও একে একে সরিয়া পড়িলেন—তাহারা যদি কিছু বলেন, ফুটপাথে গিয়া বলিবেন।

সন্ধ্যার সময় ক্লার্কওয়েল সাহেব মোটরে খয়রাগড়ের রাজকুমারকে পড়াইতে চলিয়া গেলেন ল্যান্সডাউন রোডে। মোটা টাকার টুইশানি, তাহারাই মোটর পাঠাইয়া লইয়া যায়। সাহেববাহির হইয়া যাইবার পরে মিস্ সিবসন ঘরে বসিয়া সেলাই করিতেছে, এমন সময় দরজার বাহিরে খুসখুস শব্দ শুনিয়া বলিল, হু? কোন্ হ্যায়?

বিন সঙ্কোচে পর্দা সরাইয়া থার্ড পণ্ডিত একটুখানি মুখ বাহির করিয়া উঁকি মারিয়াবলিলেন, আমি মেমসাহেব।

—ও, পান্ডিট! কাম্ ইন্। হোয়াট'স হোয়াট?

থার্ড পণ্ডিত হাত জোড় করিয়া কাঁদো-কাঁদো সুরে বলিলেন, সাহেব আমাকে সাসপেন্ডকরেচেন।

—বেগ ইওর পার্ডন্?

থার্ড পণ্ডিত সাসপেন্ড কথাটার উপর জোর দিয়া কথা বলিয়া নিজের দিকে আঙুল দিয়াদেখাইয়া বলিলেন—মি, হাম—

মিস্ সিবসন্ আস্‌লী বিলাতী, নানা দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়িয়া ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলে চাকরি লইতে বাধ্য হইয়াছে। বুদ্ধিমতী মেয়ে, ব্যাপারটা বুঝিয়া হাসিয়া বলিল, ওয়েল—

—ইউ মাদার—আই সন্—সাহেবকে বলুন মা—

—ইয়েস, আই প্রমিস টু—

—হ্যাঁ, মা, বুড়ো হয়েছি—ওল্ড ম্যান (থার্ড পণ্ডিত নিজের মাথার সাদা চুলে হাত দিয়াদেখাইলেন) না খেয়ে মরে যাব—(মুখের কাছে হাত লইয়া গিয়া খাওয়ার অভিনয় করিয়া হাত নাড়িয়া না-খাওয়ার অভিনয় করিলেন) ইট্ নট—

মেমসাহেব হাসিয়া বলিলেন, আই আন্ডারস্ট্যান্ড পান্ডিট্।

—নমস্কার মাদার।

থার্ড পণ্ডিত চলিয়া আসিলেন।

যদুবাবু ছুটি হইলে মলঙ্গা লেনের ছোট বাসাটায় ফিরিয়া গেলেন। দশ টাকা মাসিকভাড়ায় একখানি মাত্র ঘর দোতলায়—এক বাড়িতে আরও তিনটি পরিবারের সঙ্গে বাস।যদুবাবুর স্ত্রী দুইখানি রুটি ও একটু পেঁপের তরকারি আনিয়া সামনে ধরিলেন। যদুবাবু গোগ্রাসেসেগুলি গিলিয়া বলিলেন, আর একটু জল—

যদুবাবু নিঃসন্তান। ত্রিশ টাকা মাহিনায় ও দুই-একটি টুইশানির আয়ে স্বামী-স্ত্রীর কায়ক্লেশে চলিয়া যায়।

জল পান করিয়া যদুবাবু একটু সুস্থ হইয়া তামাক ধরাইলেন।

যদুবাবুর স্ত্রী একসময়ে রূপসী বলিয়া খ্যাতি ছিল, এখন নানা দুঃখকষ্টে সে রূপের কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নাই আর, প্রায় সকল বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের মতোই স্বামীর উপর তাহার টানটা বেশি।স্বামীর কাছে বসিয়া বলিল, তোমার বড় শালীর বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে, ছেলের অন্নপ্রাশন, যাবে নাকি?

এ যে একটু বক্রোক্তি, যদুবাবু সেটা বুঝিলেন। এটি যদুবাবুর স্ত্রীর বৈমাত্রেয় দিদি, সকলেবলে এই মেয়েটির রূপ দেখিয়া যদুবাবু নাকি একদিন মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাকে বিবাহ করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটে নাই। যদুবাবার স্ত্রী খোঁচা দিতে ছাড়ে না এখনও।

—তুমি যাও। এখন মুর্শিদাবাদ যাই সে সময় কই? ওরা নিতে আসবে?

—তা জানি নে। তারা এখন বড়লোক, যদিই ধরো গরিব কুটুম্বুর অত তোয়াজ না করে!চিঠি একখানা দিয়েছে, এই যথেষ্ট।

—তা হলে যাওয়া হবে না। ভাড়ার টাকা, তারপর ধর নকুতো কিছু একটা দিতে হবে—সে হয় না।

—আমার কাছে কিছু আছে—তবে তুমি যদি না যাও, আমি যাব না।

—আমি ছুটি পাব না। আলম ব্যাটা বড্ড লাগাচ্ছে আমার নামে সাহেবের কাছে। আজ তো এক কাণ্ডতে বেধে গিয়েছিলাম আর কি, অতি কষ্টে সামলেছি। আমার হবে না। তুমি বরংযাও।

এমন সময় বাহির হইতে নারাণবাবুর গলা শোনা গেল—ও যদু, আছ নাকি?

—আসুন, আসুন নারাণদা—

নারাণবাবু ঘরে ঢুকিয়া যদুবাবুর স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, বউঠাকরুন, একটু চাখাওয়াতে পারো?

যদুবাবুর স্ত্রী ঘোমটার ফাঁকে যদুবাবুর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন—অর্থাৎ চা নাই, চিনি নাই, দুধ নাই। অর্থাৎ যদুবাবু বাড়িতে চা খান না।

যদুবাবু বলিলেন, বসুন নারাণদা, আমি একটু আসছি।

নারাণবাবু হাসিয়া বলিলেন, আসতে হবে না ভায়া, আমি সব এনেছি পকেটে, এই যে—আমি খাই কিনা, সব আমার মজুত আছে। তোমার এখানে আসব বলে পকেটে করে নিয়েইএলাম। এই নাও বউঠাকরুন।

—তারপর দেখলেন তো কাণ্ডখানা ?

—ও তো দেখেই আসছি।নতুন আর কী বল!

—আমায় কী রকম অপমানটা—

—আরে, তুমি যে ভায়া, গায়ে পেতে নিলে, ওটা আসলে থার্ড পণ্ডিতকে লক্ষ্য করেবলছিল সাহেব।

—না না, আপনি জানেন না, আমাকেও বলছিল ওই সঙ্গে।

—কিছু না, তোমার হয়েছে—ঠাকুরঘরে কে? না, আমি তো কলা খাইনি। তুমি কেনবলতে গেলে ও-কথা?

—যাক্, তা নিয়ে তর্ক করে কোনো লাভ নেই। ও যেতে দিন।

চা-পান শেষ করিয়া দুইজনে উঠিলেন। টুইশানির সময় সমাগত।

যদুবাবা শাঁখারিটোলায় এক বাড়িতে টুইশানিতে গেলেন। নীচের তলায় অন্ধকার ঘর, তিনটি ছেলে একসঙ্গে পড়ে। ভীষণ গরম ঘরের মধ্যে, কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ আসে পাশের সিউয়ার্ড ডিচ হইতে। দুইটি ঘণ্টা তাহাদের পড়া বলিয়া ক্লাসের টাস্ক লিখাইয়া দিতে রাত আটটাবাজিল। আর একটা টুইশানি নিকটেই, যদু শ্রীমানীর লেনে। সেখানে একটি ছেলে—ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে, বেশ একটু নির্বোধ অথচ পড়াশুনায় মন খুব। এমন ধরনের ছেলেরাই প্রাইভেট টিউটরকে ভোগায় বেশি। এ ছেলেরা এই অঙ্ক কষাইয়া লয়, ওটার ভাবাংশ লিখাইয়া লয়—খাটাইয়াফরমাশ দিয়া যদুবাবুকে রীতিমতো বিরক্ত করিয়া তোলে প্রতি দিন। ক্লার্কওয়েল সাহেবকে ফাঁকিদেওয়া চলে, কিন্তু প্রাইভেট টুইশানির ছাত্র বা ছাত্রের অভিভাবকদের ফাঁকি দেওয়া বড়ই কঠিন।

রাত পৌনে দশটার সময় যদুবাবু উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ছেলেটি বলিল, একটু বাকি আছে স্যার। কাল ইংরেজি থেকে বাংলা রিট্রানস্লেশন (বারো আনা শিক্ষকও ছাত্র এই ভুল কথাটি ব্যবহার করে) রয়েছে, বলে দিয়ে যান।

যদুবাবুর মাথা তখন ঘুরিতেছে। তিনি বলিলেন, আজ না হয় থাক্।

—না স্যার। বকুনি খেতে হবে, বলে দিয়ে যান।

—কই, দেখি। এতটা? এ যে ঝাড়া আধ ঘণ্টা লাগবে! আচ্ছা, এস তাড়াতাড়ি। আমিবলে যাই, তুমি লিখে নাও।

নির্বোধ ছাত্রকে লিখাইয়া দিতেও প্রায় আধ ঘণ্টা লাগিয়া গেল। রাত সাড়ে দশটার সময়ক্লান্ত বিরক্ত যদুবাবু আসিয়া বাড়ি পৌঁছিলেন ও যা-হয় দুটি মুখে দিয়াই শয্যা আশ্রয় করিলেন।

পরদিন স্কুলে ক্লার্কওয়েল সাহেব জ্যোতির্বিনোদ মহাশয়কে ডাকাইয়া বলিলেন, পণ্ডিত, তুমি মেমসাহেবের কাছে কেন গিয়েছিলে ? চাকরি তোমার বন্ধ আছে আমার হুকুমে, তা রদ হবে না।

জ্যোতির্বিনোদ ইংরেজি বোঝেন না, কিন্তু আন্দাজ করিয়া লইলেন, সাহেবকে মেমসাহেবকোনো কথা বলিয়া থাকিবে, তাহার ফলেই এই ডাক। তিনি হাত জোড় করিয়া বলিলেন, সাহেব মা-বাপ, আপনি না রাখলে কে রাখবে। আমি এমন কাজ আর কখনও করব না।

হেডমাস্টারের মুখে ঈষৎ হাসির আভাস দেখিয়া জ্যোতির্বিনোদের মনে আশ্বাস জাগিল।

সাহস পাইয়া তিনি হেডমাস্টারের টেবিলের সামনে আগাইয়া গিয়া বলিলেন, এবারআমায় মাপ করুন, ব্রাহ্মণ—আমার অন্ন—

হেডমাস্টার টেবিলের উপর কিল মারিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণ আমি মানি না। আমার কাছে হিন্দু-মুসলমান সমান।

জ্যোতির্বিনোদ চুপ করিয়া রহিলেন—ইংরেজি বুঝিয়াছিলেন বলিয়া নয়, টেবিলে কিল মারার দরুন ভাবিলেন, সাহেব যে কারণেই হোক চটিয়াছেন।

হেডমাস্টার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ওয়েল ?

জ্যোতির্বিনোদ পুনরায় হাত জোড় করিয়া বলিলেন, আমায় মাপ করুন এবার।

—আচ্ছা, যাও এবার, ও-রকম আর না হয়, তা হলে মাপ হবে না।জ্যোতির্বিনোদ সাহেবকে নমস্কার করিয়া আপিস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজে মিটিল না। স্কুল বসিবার পর মি. আলম শুনিয়াহেডমাস্টারকে বুঝাইলেন, এ রকম করিলে এ স্কুলে ডিসিপ্লিন রাখা যাইবে না—মাস্টাররাস্বভাবতই ফাঁকিবাজ, আরও ফাঁকি দিবে। অতএব সারকুলার বাহির করিয়া থার্ড পণ্ডিতকে মাপকরা হোক। কী জন্য সাসপেন্ড করা হইয়াছিল, তাহার কারণ এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতাঅবলম্বন করিবার উপদেশ লিপিবদ্ধ করা থাক সারকুলার-বহিতে। ইহাতে পণ্ডিত জব্দ হইয়াযাইবে।

হেডমাস্টারের কর্ণদ্বয় মি. আলমের জিম্মায় থাকিত, সুতরাং সেই মর্মেই সারকুলারবাহির হইয়া গেল। অন্যান্য শিক্ষকেরা জ্যোতির্বিনোদকে ভয় দেখাইল, চাকুরি এবার থাকিল বটে, তবে বেশি দিনের জন্য নয়, এই সারকুলার স্কুলের সেক্রেটারি বা কমিটির কোনো মেম্বারেরচোখে পড়িলেই চাকুরি যাইবে।

ক্ষেত্রবাবু পড়াইতেছেন, হেডমাস্টার সেখানে গিয়া পিছনের বেঞ্চির একটা ছেলেকে হঠাৎ ডাক দিয়া বলিলেন, তুমি কী বুঝেছ বলো?

সে কিছুই শোনে নাই, পাশের ছেলের সঙ্গে গল্পে মত্ত ছিল, তীক্ষ্ণদৃষ্টি ক্লার্কওয়েলের নজরএড়ানো সহজ কথা নয়।

হেডমাস্টার ক্ষেত্রবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, ডোন্ট সিট অন ইওর চেয়ার লাইক এবাহাদুর—ছেলেরা কিছু শুনছে না। উঠে উঠে দেখুন, কে কী করচে না-করচে!

ক্ষেত্রবাবু ছেলেদের সামনে তিরস্কৃত হওয়ায় নিজেকে অপমানিত বিবেচনা করিলেন বটে, কিন্তু সাহেবের কাছে বিনীতকণ্ঠে অঙ্গীকার করিতে হইল যে, তিনি ভবিষ্যতে দাঁড়াইয়া ও ক্লাসেপায়চারি করিতে করিতে পড়াইবেন।

সাহেবের জের এখানেই মিটিবার কথা নয়। সেদিন স্কুল ছুটির পর টিচারদের মিটিং আহূত হইল। সাহেবের উপদেশবাণী বর্ষিত হইল। ছেলেদের স্বার্থ বজায় রাখিয়া যিনি টিকিতে পারিবেন, এ স্কুলে তাহারই শিক্ষকতা করা চলিবে; যাঁহার না পোষাইবে, তিনি চলিয়া যাইতেপারেন—স্কুলের গেট খোলা আছে।

বেলা সাড়ে পাঁচটায় হেডমাস্টারের সভা ভাঙিল। মাস্টারেরা বাহিরে আসিয়া নানাপ্রকারমন্তব্য প্রকাশ করিলেন। যদুবাবু লম্ফঝম্প শুরু করিলেন।

—রোজ রোজ এই বাজে হাঙ্গামা আর সহ্য হয় না—সাড়ে পাঁচটা বেজে গেলটিউশানিতে যাবার আগে আর বাসায় যাওয়া হবে না দেখছি, কবে যে আপদ কাটবে, নারায়ণেরকাছে তুলসী দিই। আপনারা সব চুপ করে থাকেন, বলেনও না তো কোনো কথা! সবাই মিলেবললে কি সাহেবের বাবার সাধ্যি হয় এমন করবার ?

অন্য দুই-একজন বলিলেন, তা আপনিও তো কিছু বললেন না যদুদা!

—আমি বলব কি এমনি বলব? আমি যেদিন বলব, সেদিন সাহেবকে ঠ্যালা বুঝিয়ে দেব, আর ঠ্যালা বুঝিয়ে দেব ওই অন্ত্যজটাকে—ও-ই কুপরামর্শ দেয়। আর সাহেবের মতো অমনআইডিয়াল টিচার আর হবে না! মারো খ্যাংরা!

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, সে তো বোঝাই যাচ্ছে, কিন্তু ওকে নড়ানো সোজা কথা নয়। সাহেবওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আর সবাই খারাপ, কেবল আলম ভাল—

হেডপণ্ডিত বৃদ্ধ লোক, স্মৃতিভ্রংশ ঘটায় অনেক সময় অনেকের নাম মনে করিতে পারেননা : আর ভাল ওই মেমসাহেব—কী ওর যেন নামটা ?

—মিস্ সিব্‌সন্।

—হ্যাঁ, ও খুব ভাল—

মাস্টাররা বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িলেন। ক্ষেত্রবাবু, যদুবাবু, নারাণবাবু ও ফণীবাবু প্রতিদিন ছুটির পরে নিকটবর্তী ছোট চায়ের দোকানে চা খাইতেন। বহুদিনের যাতায়াতের ফলেপিটার লেনের মোড়ের এই চায়ের দোকানটির সঙ্গে তাহাদের অনেকের স্মৃতি জড়াইয়া গিয়াছে। নিকট দিয়া যাইবার সময় কেমন যেন মায়া হয়।

ক্ষেত্রবাবুর মনে পড়ে তাহার চার বছরের ছেলেটির কথা। সেবার একুশ দিন ভুগিয়া টাইফয়েড রোগে মারা গেল। কত কষ্টভোগ, কত চোখের জল ফেলা, কত বিনিদ্র রজনী যাপন! এই চায়ের দোকানে বসিয়া সহকর্মীদের সঙ্গে কত পরামর্শ করিয়াছেন, আজ পেটফাঁপিল, কী করিতে হইবে; আজ কথা আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছে, কী করিলে ভাল হয়। এই চায়েরদোকানের সামনে আসিলেই খোকার শেষের দিনগুলি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে।

নারাণবাবুর স্মৃতি স্কুলের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। আগের হেডমাস্টার ছিলেন অনুকূলবাবু। তিনিছিলেন ঋষিকল্প পুরুষ। দুজনে মিলিয়া এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন—খুব বন্ধুত্ব ছিল দুজনের মধ্যে।অনুকূলবাবুর অনুরোধে নারাণ চাটুজ্জে রেলের চাকরি ছাড়িয়া আসিয়া এই স্কুলে শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন। এই স্কুলকে কলিকাতার মধ্যে একটি নামজাদা স্কুল করিয়া তুলিতে হইবে, এই ছিলসঙ্কল্প। একদিন দুইদিন নয়, দীর্ঘ পনেরো-ষোলো বৎসর ধরিয়া সে কত পরামর্শ, কত আশা—নিরাশার দোলা, কত অর্থনাশের উদ্বেগ! একবার এমন সুদিনের উদয় হইল যে, নারাণবাবুদের স্কুল কলিকাতার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর স্কুল হইয়া গেল বুঝি। হেয়ার-হিন্দুকে ডিঙাইয়া সেবার এই স্কুলের এক ছাত্র ইউনিভার্সিটিতে প্রথম স্থান অধিকার করিল। নারাণবাবু দেড় শত টাকা বেতনে সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত হইবেন, সব ঠিকঠাক—এমন সময় অনুকূলবাবু মারা গেলেন। সব আশাভরসা ফুরাইল। একরাশ দেনা ছিল স্কুলের, পাওনাদারেরা নালিশ করিল। গবর্নমেন্ট-নিযুক্তঅডিটার আসিয়া রিপোর্ট করিল, স্কুলের রিজার্ভ ফান্ডের টাকা ভূতপূর্ব হেডমাস্টার তছরুপকরিয়াছেন। বাড়িওয়ালা ভাড়ার দায়ে আসবাবপত্র বেচিয়া লইল। নূতন ছাত্র ভর্তি হইবার আশা থাকিলে হয়তো এতটা ঘটিত না, কিন্তু ছাত্র আসিত অনুকূলবাবুর নামে, তিনিই চলিয়া গেলেন, স্কুলে আর রহিল কে? জানুয়ারি মাসে আশানুরূপ ছাত্রের আমদানি হইল না, কাজেই পাওনাদারদের উপায়ান্তর ছিল না।...

হেডপণ্ডিত চা খান না, তবু মাস্টারদের সঙ্গে দোকানে বসিয়া গল্পগুজব করিয়া চা-পানেরতৃপ্তি উপভোগ করেন আজ বহু বৎসর হইতে। বলিলেন, চলুন নারাণবাবু, চা খাবেন না? আসুনযদুবাবু, ক্ষেত্রবাবু—

মাস্টার মহাশয়দের এ দোকানে যথেষ্ট খাতির। নিকটবর্তী স্কুলের মাস্টার বলিয়াও বটে, অনেকদিনের খরিদ্দার বলিয়াও বটে। দোকানী বেঞ্চ হইতে অন্য খরিদ্দারদের সরাইয়া দেয়, মাস্টার মহাশয়দের চায়ের প্রকৃতি কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে, দুই-একটি ব্যক্তিগত প্রশ্নও করে আত্মীয়তা করিবার জন্য। অনেক সময় কাছে পয়সা না থাকিলে ধারওদেয়।

যদুবাবু বলিলেন, আমাকে একটু কড়া করে চা দিয়ো আদা দিয়ে।

নারাণবাবু বলিলেন, আমার চায়েও একটু আদা দিয়ো তো।

সকলের সামনে চা আসিল। সঙ্গে সঙ্গে পাশে একখানি করিয়া টোস্ট দিয়া গেল চায়ের পিরিচে প্রত্যেককে। দোকানীকে বলিতে হয় না, সে জানে, ইহারা কী খাইবেন, আজিকার খরিদ্দারতো নন।

স্কুলের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে এবং যে যাহার টুইশানিতে যাইবার পূর্বে এখানটিতেবসিয়া আধঘণ্টা ধরিয়া চা খাওয়া ও গল্পগুজব প্রত্যেকের পক্ষে বড় আরামদায়ক হয়। বস্তুতমনে হয় যে, সারাদিনের মধ্যে এই সময়টুকুই অত্যন্ত আনন্দের। যাঁহারা চারিটা বাজিবার পূর্বে ঘড়ি দেখিতে পাঠান, তাঁহারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে এই সময়টুকুরই প্রতীক্ষা করেন। তবে স্কুলমাস্টার হিসাবে ইঁহাদের দৃষ্টি সংকীর্ণ, জীবনের পরিধি সুপ্রশস্ত নয়, সুতরাং কথাবার্তা প্রতিদিন একই খাত বাহিয়া চলে। সাহেব আজ অমুক ঘণ্টায় অমুকের ক্লাসে গিয়া কী মন্তব্য করিল, অমুক ছেলেটা দিন-দিন খারাপ হইয়া যাইতেছে, অমুক অঙ্কটা এ ভাবে না করিয়া অন্য ভাবে কী করিয়াব্ল্যাকবোর্ডে করা গেল, ইত্যাদি।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, মাসটাতে ছুটিছাটা একেবারেই নেই,না নারাণবাবু?

—কই আর! সেই ছাব্বিশে কী একটা মুসলমানদের পর্ব আছে, তাও যে ছুটি দেবে কি না—

—ঠিক দেবে। মি. আলম আদায় করে নেবে।

—নাঃ, এক-আধ দিন ছুটি না হলে আর চলে না।

যদুবাবু বলিলেন, ওহে, হাফ কাপ একটা দাও তো। আজ চা-টা বেশ লাগছে

চার পয়সার বেশি খরচ করিবার সামর্থ্য কোনো মাস্টারেরই নাই চায়ের দোকানে। যদুবাবুর এই কথায় দুই-একজন বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। নারাণবাবু বলিলেন, কী হে যদু, দমকা খরচ করে ফেললে যে!

—খাই একটু নারাণদা! আর ক'দিনই বা!

যদুবাবু একটু পেটুক ধরনের আছেন, এ কথা স্কুলে সবাই জানে। বাজারহাট ভাল করিয়া করিতে পারেন না পয়সার অভাবে, সামান্য বেতনে বাড়িভাড়া দিয়া থাকিতে হয়—কোথা হইতেভাল বাজার করিবেন! তবে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ পাইলে সেখানে দুইজনের খাদ্য একা উদরস্থ করেন, স্কুলে ইহা লইয়া নিজেদের মধ্যে বেশ হাসিঠাট্টা চলে।

নারাণবাবু বয়সে সর্বাপেক্ষা প্রবীণ, প্রবীণত্বের দরুন অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠদের প্রতিস্বাভাবিক স্নেহ জন্মিয়াছে তাহার মনে। তিনি ভাবিলেন, আহা, খাক, খেতে পায় না, এই তোস্কুলে সামান্য মাইনের চাকরি; ভালবাসে খেতে, অথচ কী ছাই বা খায়! মুখে বলিলেন, খাও। আর একখানা টোস্ট। আমি দাম দেব। ওহে, বাবুকে একখানা টোস্ট দাও—এখানে।

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন, নারাণদা আমাদের শিবতুল্য লোক। তা দাও আর একখানা, খেয়ে নিই।

খাওয়া শেষ করিয়া সকলে বিড়ি বাহির করিলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনদেশলাই পয়সায় দুইটা; তৎসত্ত্বেও কেহ দেশলাই রাখেন না পকেটে, দোকানীর নিকট হইতেচাহিয়া কাজ সারিলেন।

নারাণবাবু বলিলেন, চলো যাই, ছ'টা বাজে।

যদুবাবু বলিলেন, বাসায় আর যাওয়া হল না, এখন যাই গিয়ে শাঁখারিটোলা, ঢুকি ছাত্রেরবাড়ি।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমি যাব সেই ক্যানাল রোড, ইটিলি—আমার ছাত্রেরা আবারসেখানে উঠে গিয়েছে।

নারাণবাবুও ছেলে পড়ান, তবে বেশি দূরে নয়, নিকটেই প্রমথ সরকারের লেনে, সরকারদের বাড়িতেই। বাহিরের ঘরে বুড়া যোগীন সরকার বসিয়া আছেন, নারাণবাবুকেদেখিয়া বলিলেন, আসুন, মাস্টারমশায় আসুন। তামাক খান। বসুন।

—চুনি পান্না খেলে বাড়ি ফিরেছে?

—চুনি ফিরেচে, পান্নার দেখা নেই এখনও। হতচ্ছাড়া ছেলে মাঠে একবার গেলে তোকাণ্ডজ্ঞান থাকে না—বলই পিটছে, বলই পিটছে!দুটো নাতিই সমান। বসুন, তামাক খান, আসছে।

কিন্তু ছাত্রেরা না আসিলে চলে না। নারাণবাবুকে দুইটি টুইশানি সারিয়া আবার স্কুলেফিরিতে হইবে, নিজের হাতে রান্নাবান্না করিতে হইবে, কিছুক্ষণ সাহেবের সঙ্গে বসিয়া মোসাহেবীগল্পও করিতে হইবে।

এমন সময়ে চুনি আসিয়া ডাকিল, মাস্টারমশায়, আসুন।

চুনি তেরো বছরের বালক, সিক্সথ্ ক্লাসে পড়ে। নারাণবাবু নিঃসন্তান, বিপত্নীক—ছেলেটিকে বড় স্নেহ করেন। চুনি দেখিতেও খুব সুন্দর ছেলে, টকটকে ফরসা রঙ, লাবণ্যমাখা মুখখানি, তবে স্বভাব বিশেষ মধুর নয়। কথায় কথায় রাগ, স্নেহ-ভালবাসার ধার ধারে না—কেহ স্নেহ করিলে বোঝেও না, সুতরাং প্রতিদানেরও ক্ষমতা নাই। বড়লোকের ছেলে, একটুগর্বিতও বটে।

চুনি নিজের পড়ার ঘরে আসিয়া বলিল, আজ একগাদা অঙ্ক দিয়েছেন ক্ষেত্রবাবু, আমায়সব বলে দিতে হবে।

—হবে, বার কর খাতাবই।

—আপনি কখন চলে যাবেন ?

—কেন রে?

—আজ আধ ঘণ্টা বেশি থাকতে হবে স্যার।

—থাকব, থাকব। তোর যদি দরকার হয়, থাকব না কেন? তোর কথা ঠেলতে পারি না—

—মাস্টার বাড়িতে রাখা ওই জন্যেই তো। এতগুলো করে টাকা মাইনে দিতে হয়আমাদের ফি মাসে শুধু প্রাইভেট মাস্টারদের কাকা বলছিলেন আজ সকালে।

কথাটা নারাণবাবুর লাগিল। তিনি আত্মীয়তা করিতে গেলে কী হইবে, চুনি সে সব বোঝে না, উড়াইয়া দেয়—পয়সা দেখায়।

ধমক দিয়া বলিলেন, তোর সে কথায় থাকার দরকার কী, চুনি? অমন কথা বলতে নেইটিচারকে। ছিঃ!

চুনি অপ্রতিভ মুখে নিচু হইয়া খাতার পাতা উল্টাইতে লাগিল। সুন্দর মুখে বিজলির আলো পড়িয়া উহাকে দেববালকের মতো লাবণ্য-ভরা অথচ মহিমময় দেখাইতেছে। ইহারা আসে কোথা হইতে, কোন্ স্বর্গ হইতে? কে ইহাদের মুখ গড়ায় চাঁদের সব সুষমা ছানিয়া ছাঁকিয়া নিঙড়াইয়া?

নারাণবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। কোথায় যেন পড়িয়াছিলেন, কোন কবির লেখা একটি ছত্র—'যৌবনে দাও রাজটিকা'—

সত্য কথা। যৌবন পার হইয়া গিয়াছে বহুদিন, আজ আটান্ন বছর বয়স—ষাটের দুইকম। ডাক তো আসিয়াছে, গেলেই হয়! কী করিলেন সারা জীবন? স্কুল-স্কুল করিয়া সব গেল।নিজের বলিতে কিছু নাই। আজ যদি চুনির মতো একটা ছেলে—

'যৌবনে দাও রাজটিকা'—সারা দুনিয়ার সমস্ত আশা-ভরসা আমোদ-আহ্লাদ আজঅপেক্ষমাণ বশ্যতার সঙ্গে এই বালকের সম্মুখে বিনম্রভাবে দাঁড়াইয়া, কত কর্মভার-বিপুলদিবসের সঙ্গীত বাজিবে উহার জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, কত অজানা অনুভূতির বিকাশ ওকর্মপ্রেরণা! চুনির সঙ্গে জীবন বিনিময় করা যায় না—এই তেরো বছরের বালকের সঙ্গে?

—স্যার, ছুটির ইংরিজি কী হবে? আজ আমাদের ছুটি—এর কী ট্রান্স্লেশন করব স্যার?

—আজ আমাদের ছুটি, আজ আমাদের ছুটি কিসের মধ্যে আছে দেখি? বেশ। কর। আজ—টু ডে, আমাদের—আওয়ার, ছুটি-হলি-ডে—

—টুডে আওয়ার হলি-ডে?

—দূর, ক্রিয়া কই! ইংরিজিতে ভার্ব না দিলে সেন্টেন্স হয় কখনও? কতবার বলে দিয়েচি না ?

এমন সময় ঘরে ঢুকিল পান্না—চুনির ছোট ভাই। তাহার বয়স এগারো, কিন্তু চুনিরচেয়েও সে দুষ্ট ও অবাধ্য, বাড়ির কাহারও কথা শোনে না, কেবল নারাণবাবুকে একটু ভয় করিয়া চলে; কারণ স্কুলে নারাণবাবুর হাতে বড় মার খায়। ইহাকে তিনি তত ভালবাসেন না।

পান্না ঘরে ঢুকিয়া অপরাধীর দৃষ্টিতে মাস্টারের দিকে চাহিল, তারপর শেল্ফের কাছেগেল বই বাহির করিতে।

নারাণবাবু কড়া সুরে বলিলেন, কোথায় ছিলে?

—খেলছিলাম স্যার।

—কটা বেজেছে হুঁশ আছে?

পড়ার ঘরেই ঘড়ি আছে দেওয়ালে। পান্না সেদিকে চাহিয়া দেখিল, সাড়ে ছয়টা বাজিয়াছে। সুতরাং সে বলিল, সাড়ে ছ'টা স্যার।

—হুঁঃ, গাধা কোথাকার! সাড়ে ছ'টা, না সাড়ে সাতটা? বল্ কটা বেজেছে? ভাল করেদেখে বল্!।

—সাড়ে সাতটা।

—ঠিক হয়েছে। এই বল খেলে এলে! কাল পড়া না হলে তোমার কী করি দেখো।

চুনি বলিল, স্যার, আজ দুপুরে বেরিয়ে গিয়েছে, এই এল।

পান্না দাদার দিকে চাহিয়া বলিল, লাগানো হচ্ছে স্যারের কাছে? তোর ওস্তাদি আমি বার করে দেব বলছি।

—দে না দেখি? তোর বড় সাহস!

—এই মারলাম। কী করবি তুই?

নারাণবাবু বৃদ্ধ, দুই বলিষ্ঠ বালকের মধ্যে পড়িয়া যুদ্ধ তো থামাইতে পারিলেনই না, অধিকন্তু চশমাটি চূর্ণবিচূর্ণ হইবার সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে পান্না ড্রয়ারের ভিতর হইতে টর্চলাইট বাহির করিয়া চুনির মাথায় একঘা বসাইয়া দিল। ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিল।

চুনি হাউমাউ করিয়া কাঁদিবার ছেলে নয়, সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; নারাণবাবু হাঁহাঁ করিয়া আসিয়া পড়িতে না পড়িতে এই কাণ্ডটি ঘটিয়া গেল।

গোলমাল শুনিয়া চুনি-পান্নার মা, বিধবা পিসি ও দুই ভাই-বউ অন্তঃপুরের দিকের ঘরেরদরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। চুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহারা কোনো উত্তর না পাইয়া মাস্টারেরউদ্দেশে নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল—ও মা, মাস্টার তো বসে আছে, তার চোখের সামনে ছেলেটাকে একেবারে খুন করে ফেললে গো!

অন্য একটি বধূ মন্তব্য করিল, মাস্টারকে মানে না দিদি, ছেলেগুলো ভারি দুষ্ট।

চুনির মা বলিলেন, মাস্টার বসে বসে আফিম খেয়ে ঝিমোয়, তা ওকে মানবে কী করে?

নারাণবাবু মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেও মুখে বাড়ির স্ত্রীলোকদের উদ্দেশে কী বলিবেন? কেতাঁহাকে আফিম খাওয়াইয়াছে শুনিবার তাঁহার বড় কৌতূহল হইল।

চুনিকে লইয়া তাহার মা ও পিসিমা চলিয়া গেলে নারাণবাবু রাগের মাথায় পান্নাকে গোটা দুই চড় কষাইলেন, সে চুপ করিয়া রহিল। বাড়ির মধ্যে খুব একটা গোলমাল হইল কিছুক্ষণধরিয়া, তাহার পর ব্যান্ডেজ-বাঁধা মাথায় চুনি এক পেয়ালা চা-হাতে বাহিরের ঘরে আসিয়া হাজির হইল। সব মিটিয়া গেল, দুই ভাইয়ের সম্মিলিত উচ্চ কণ্ঠস্বরে নৈশ-গগন বিদীর্ণ হইতেলাগিল।

চুনির মুখের দিকে চাহিয়া নারাণবাবুর বড় মায়া হইল। অবোধ বালক! কেন মারামারি করেতাও জানে না, নিজের ভালমন্দ নিজেরা বোঝে না। মিছামিছি সন্ধ্যার সময় মার খাইয়া মরিল!

স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, লেগেছে চুনি খুব?

চুনি বলিল, আধ ইঞ্চি ডিপ্ হয়ে কেটে গিয়েছে।

—ব্যান্ডেজ বাঁধলে কে?

—পিসিমা।

—উনি জানেন?

—চমৎকার জানেন। কেন, ভাল হয়নি?

নারাণবাবুর ইচ্ছা হইল, চুনিকে কোলে টানিয়া লইয়া আদর করেন, তাহাকে সান্ত্বনা দেন। কিন্তু লজ্জায় পারিলেন না। চুনি ঘ্যানঘেনে ধরনের ছেলে নয়; মার খাইয়া নালিশ করিতে জানেনা। এই রকম 'স্টোইক' ধরনের ছেলে নারাণবাবু তার দীর্ঘ শিক্ষক-জীবনে যতগুলি দেখিয়াছেন, এক অঙ্গুলির পর্বগুলির মধ্যেই তাহাদের গণনার পরিসমাপ্তি ঘটে। চুনি সেই অতি অল্পসংখ্যকছেলেদের একজন। চুনিকে এই জন্যই এত ভাল লাগে তার!

এই সময় চুনির বাবা বাহির হইতে আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, মাস্টার যে! ও কী, ওরমাথায় কী?

নারাণবাবু সব কথা বলিলেন।

চুনির বাবার হৃদ্যতা কর্পূরের মতো উবিয়া গেল। তিনি বিরক্তির সুরে বলিলেন, আপনিবসে থাকেন, আর প্রায়ই আপনার চোখের সামনে এ রকম কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটে, আপনি দেখেননা?

—আজ্ঞে, দেখব না কেন? সামান্য কথাবার্তা থেকে মারামারি। আমি এসে পড়ে ছাড়িয়ে দিই, তবে—

—আপনি একটু ভাল করে দেখাশুনো করবেন বলেই তো রাখা। নইলে গ্র্যাজুয়েট মাস্টার দশ টাকাতেও পাওয়া যায়। দু বেলা পড়াবে।

আজ্ঞে, আমি দেখি। দেখি না, তা ভাববেন না।

—আমি সব সময় দেখতে পারি নে, নানা কাজে ঘুরি। কিন্তু আপনার দ্বারা দেখচি— আপনার বয়স হয়েছে।

এই সময় চুনি যদি তাহার বাবাকে বলিত—বাবা, স্যারের কোনো দোষ নেই, আমারইসব দোষ, তাহা হইলে নারাণবাবুর মনের মতো কাজ হইত; নারাণবাবু এই ভাবিয়া সপ্তস্বর্গ প্রাপ্ত হইতেন যে, চুনি তাহার অগাধ স্নেহের প্রতিদান দিল।

কিন্তু যাহা আশা করা যায়, তাহা হয় না।

চুনি চুপ করিয়া রহিল। বাবাকে তাহারা দুই ভাই যমের মতো ভয় করে।

চুনির বাবা বলিলেন, মাস্টার, বোসো। আমি আসছি, চা খেয়েছ?

এইবার চুনি মুখ তুলিয়া বলিল, হ্যাঁ বাবা, আমি এনে দিয়েছি।

চুনির এ কথাটা নারাণবাবুর ভাল লাগিল না। চুনি এ কথা কেন বলিতেছে, নারাণবাবুতাহা বুঝিতে পারিলেন। পাছে তাহার বাবা গিয়া আর এক কাপ চা মাস্টারের জন্য পাঠাইয়াদেন, সে জন্য। কেন এক পেয়ালা চা বেশি দেওয়া হইবে মাস্টারকে!

নারাণবাবু বাসায় ফিরিলেন, তখন রাত নয়টা। নিজের ছোট ঘরটায় চাবি খুলিয়া রান্নাচাপাইয়া দিলেন, তারপর যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণখানা লইয়া পড়িতে বসিলেন। এই সময়টাই বেশলাগে সারাদিন খাটুনির পরে। আজ স্কুলের এই ঘরে নারাণবাবু আছেন উনিশ বছর। বহুকালহইল তাহার পত্নী স্বর্গগমন করিয়াছেন, নারাণবাবু আর বিবাহ করেন নাই—পত্নীর স্মৃতির প্রতিসম্মান প্রদর্শনের জন্য যত না হোক, গরিব-স্কুল-মাস্টার-জীবনে খরচ চালাইতে পারিবেন নাবলিয়াই বেশি।

উনিশ বৎসরের কত স্মৃতি এই ঘরের সঙ্গে জড়ানো।

যখন প্রথম এই স্কুলে অনুকূলবাবু তাঁহাকে লইয়া আসেন, তখন এই ঘরে আর একজন বৃদ্ধমাস্টার ভুবনবাবু থাকিতেন। ভুবনবাবুর বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদ—ভদ্রলোক বিবাহ করেন নাই, সংসারে এক বিধবা ভগ্নী ছাড়া তাঁহার আর কেহ ছিল না। একদিন বিছানায় লোকটি মরিয়াপড়িয়া ছিল এই ঘরেই। স্কুলের খরচেভুবনবাবুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

নারাণবাবু ভাবেন, তাহার অদৃষ্টেও তাহাই নাচিতেছে। তাহারও কেহ নাই, স্ত্রী নাই, পুত্রনাই, ভাই নাই, ভগ্নী নাই—এই ঘরটি আশ্রয় করিয়া আজ বহুদিন কাটাইয়া দিলেন। এখনএমনহইয়া গিয়াছে, এই ঘর ও এই স্কুলের বাহিরে তাহার যেন আর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। জীবনের একমাত্র কর্মক্ষেত্র এই স্কুল। স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসে রুটিন অনুযায়ী কোনদিন কীপড়াইবেন, নারাণবাবু সকালে বসিয়া ঠিক করেন।

কাল থার্ড ক্লাসে ললিত ছেলেটা ইংরেজি গ্রামারের 'দি'র ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশকরিয়াছে, নারাণবাবুর প্রাণে তাহাতে এমন একটা ধাক্কা লাগিয়াছে, সে বেদনা নিতান্ত বাস্তব।নারাণবাবু জানেন যে 'দি' ব্যবহার করিতে না পারিলে থার্ড ক্লাসের ছেলে হইয়া সে ইংরেজি ব্যাকরণ শিখিল কী? কাল নারাণবাবু তখনই নোট-বইতে লিখিয়া লইয়াছেন, "থার্ড ক্লাস ললিতমোহন কর, ডেফিনিট আর্টিকল 'দি'।"—এইটুকু মাত্র দেখিলেই তাহার মনে পড়িবে।

তাহার পর আজ সেই ললিতকে ঝাড়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া জিনিসটা শিখাইয়া দিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হইল না। ললিত কর 'যে আঁধারে সে আঁধারেই রহিয়াছে।' কী করা যায় ? তাহার শিখাইবার প্রণালীর কোনো দোষ ঘটিতেছে নিশ্চয়। কী করিলে ললিত ছোঁড়াটা 'দি'র ব্যবহার শিখিতে পারে ?

নারাণবাবু হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে চিন্তা করিতেছিলেন, হঠাৎ তাহার মনে পড়িলসেভেনথ ক্লাসের পূর্ণ চক্রবর্তী, মাত্র নয় বছরের ছেলে, এত মিথ্যা কথাও বলে! কত দিনমারিয়াছেন, নিষেধ করিয়াছেন, হেডমাস্টারের আপিসে লইয়া যাইবার ভয় দেখাইয়াছেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো ফল হয় নাই। ছেলেটার সম্বন্ধে কি অভিভাবকের নিকট একখানা চিঠিদিবেন ? তাহাতেই বা কী সুফল ফলিবে? না হয় চিঠি পাইয়া ছেলের বাপ ছেলেকে ধরিয়াঠ্যাঙাইলেন, তাহাতেই ছেলে ভাল হইয়া যাইবে বলিয়া তো মনে হয় না। কী করা যায় ?

নারাণবাবুর সম্মুখে এই সব সমস্যা প্রতিদিন দুই-একটা থাকেই। মাঝে মাঝে এগুলি লইয়া তিনি ক্লার্কওয়েল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিতে যান।

সাহেব সন্ধ্যার সময় মোটরে ছেলে পড়াইতে বাহির হন, ফিরিবার অল্পক্ষণ পরেই রাতনয়টা কি সাড়ে নয়টার সময়ে নারাণবাবু সাহেবের দরজায় গিয়া কড়া নাড়িলেন।

—কে? কী, নারাণবাবু? ভেতরে এসো।

—স্যার, আপনার খাওয়া হয়েছে?

—এই এখুনি খেতে বসব। এক পেয়ালা কফি খাবে?

—তা—তা—

—বাবুকে এক পেয়ালা কফি দাও। বোসো। কী খবর?

—স্যার, আপনার কাছে এসেছিলাম একটা খুব জরুরি দরকার নিয়ে। একবার আপনারসঙ্গে পরামর্শ করব। ওই থার্ড ক্লাসের ললিত কর বলে ছেলেটা—“দি’র ব্যবহার কিছুই জানেনা, এতদিন পরে আবিষ্কার করলাম। কাল কত চেষ্টাই করেছি, কিন্তু শেখানো গেল না। কী করাযায় বলুন তো?

ক্লার্কওয়েল সাহেব অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ হেডমাস্টার। এসব বিষয়ে নারাণবাবু তাঁহার শিষ্য হইবার উপযুক্ত। ক্লার্কওয়েল খাওয়া-দাওয়া ভুলিয়া গেলেন। নিজের টেবিলে গিয়া ড্রয়ার টানিয়া একখানা খাতা বাহির করিয়া নারাণবাবুকে দেখাইয়া বলিলেন, আমারও একটা লিস্টআছে এই দেখ, ফার্স্ট ক্লাসের কত ছেলে ও-জিনিসটার ব্যবহার ঠিকমতো জানে না আজও।আরও কত নোট করেছি দেখ। তবে একটা প্রণালীতে আমি উপকার পেয়েছি, তোমাকে সেটা—এই পড়।—বলিয়া ক্লার্কওয়েল নিজের নোট-বইখানা নারাণবাবুর হাতে দিলেন।

মিস্ সিবসন্ ওদিকের দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিয়া নারাণবাবুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, ওনারাণবাবু! আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবে? হাউ সুইট অফ্ ইউ!

নারাণবাবু বিনীতভাবে জানাইলেন, তিনি ডিনার খাইতে আসেন নাই।

ক্লার্কওয়েল মেমসাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এই স্কুলে দুজন টিচার আছে, যারা টিচার নামের উপযুক্ত—নারাণবাবু আর মি. আলম। ইনি এসেছেন ললিতকে কী করে ‘দি’র ব্যবহার শেখানো যায়, তাই নিয়ে। আর ক’জন আছেন আমাদের স্কুলের মধ্যে, যাঁরা এ সব নিয়ে মাথা ঘামান ?

মেমসাহেব হাসিয়া বলিল, ইউ ডিজার্ভ এ স্লাইস্ অফ মাই হোম-মেড কেক নারাণবাবু; ইউ ডু। একটা কেকের খানিকটা কাটিয়া প্লেটে নারাণবাবুর সামনে রাখিয়া মেমসাহেব বলিল, ইটইট অ্যান্ড প্রেজ ইট্।

নারাণবাবু বিনয়ে বাঁকিয়া দুমড়াইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন, ধন্যবাদ ম্যাডাম ধন্যবাদ। চমৎকার কেক্! বাঃ, বেশ—

ক্লার্কওয়েল বলিলেন, আর কে কী রকম কাজ করে নারাণবাবু? টিচারদের মধ্যে—

নারাণবাবুর একটা গুণ, কাহারও নামে লাগানো-ভাঙানো অভ্যাস নাই তাহার। মিঃআলম যে স্থলে অন্তত তিনজন টিচারকে ফাঁকিবাজ বলিয়া দেখাইত, সেখানে নারাণবাবুবলিলেন, কাজ সবাই করে প্রাণপণে, আর সবাই বেশ খাটে।

হেডমাস্টার হাসিয়া বলিলেন, ইউ আর অ্যান্ ওল্ড ম্যান নারাণবাবু। তুমি কারও দোষদেখ না—ওই তোমার মস্ত দোষ। আমি জানি, কে কে আমার স্কুলে ফাঁকি দেয়। আমি জানিনে ভাব? নাম আমি করছি নে—নাম করা অনাবশ্যক কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাদের নামতোমার কাছেও অজ্ঞাত নয়। আচ্ছা, যাও—

মেমসাহেব বলিল, ভাল কেক্?

নারাণবাবু বলিলেন, চমৎকার কেক ম্যাডাম, অদ্ভুত কেক্।

মেমসাহেব বলিল, আমার বাপের বাড়ি শ্রপশায়ারে, শুধু সেইখানে এই কেক তৈরি হয় তোমায় বলছি। তাও দুখানা গাঁয়ে—নরউড আর বার্কলে-সেন্ট-জন—পাশাপাশি গাঁ। কলকাতার দোকানে যে কেক বিক্রি হয়, ও আমি খাইনে!

নারাণবাবু আর এক প্রস্থ বিনীত হাস্য বিস্তার করিয়া বিদায় লইলেন।...আজ অনুকূলবাবু নাই, কিন্তু সাহেব ও মেম আসাতে নারাণবাবু খুশিই আছেন। স্কুলের কী করিয়া উন্নতি করা যায় সেদিকে সাহেবের সর্বদা চেষ্টা,

তবে দোষও আছে। টাকাকড়ি সম্বন্ধে সাহেব তেমন সুবিধার লোক নয়। মাস্টারদের মাহিনা দিতে বড় দেরি করে, নানারকমে কষ্ট দেয়—তার একটা কারণ, স্কুলের ক্যাশ সাহেবের কাছে থাকে, সাহেবের বেজায় খরচের হাতখরচ করিয়া ফেলে, অবশ্যস্কুলের বাবদই খরচ করে, শেষে মাস্টারদের মাহিনা দিতে পারে না সময়মতো।

মোটের উপর কিন্তু সাহেব স্কুলের পক্ষে ভালই। বড় কড়াপ্রকৃতির বটে, শিক্ষকদের বিষয়েঅনেক সময় অন্যায় অবিচার যথেষ্ট করিয়া থাকে, যমের মতো ভয় করে সব মাস্টার; কিন্তুস্কুলের স্বার্থ ও ছেলেদের স্বার্থের দিকে নজর রাখিয়াই সে-সব করে সাহেব। নারাণবাবু তাই চান, স্কুলের উন্নতি লইয়াই কথা।

যদুবাবুর আজ মোটে বিশ্রামের অবকাশ নাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া খাটুনি চলিতেছে, দুইজন শিক্ষক আসেন নাই, তাঁহাদের ঘণ্টাতেও খাটিতে হইতেছে। একটা ঘণ্টার শেষে মিনিট পনেরো সময় চুরি করিয়া যদুবাবু তেতলায় শিক্ষকদের বিশ্রামকক্ষে ঢুকিলেন, উদ্দেশ্য ধূমপানকরা।

গিয়া দেখিলেন, হেডপণ্ডিত ও ক্ষেত্রবাবু বসিয়া আছেন। তেতলার এই ঘরটি বেশ ভাল, বড় বড় জানালা চারিদিকে, চওড়া ছাদ, ছাদে দাঁড়াইলে সেন্ট পলের চূড়া, জেনারেল পোস্ট আপিসের গম্বুজ, হাইকোর্টের চূড়া, ভিক্টোরিয়া হাউস প্রভৃতি তো দেখা যায়ই, বিশাল মহাসমুদ্রেরমতো কলিকাতা নগরী অসংখ্য ঘরবাড়ির ঢেউ তুলিয়া এই ক্ষুদ্র স্কুল-বাড়িকে যেন চারিধারহইতে ঘিরিয়াছে মনে হয়; নীচে ওয়েলেসলি স্ট্রীট দিয়া অগণিত জনস্রোত ও গাড়ি-ঘোড়ারভিড়, ট্রামের ঘণ্টাধ্বনি, ফিরিওয়ালার হাঁক—বিচিত্র ও বৃহৎ জীবনযাত্রার রহস্যে সমগ্র শহরআপনাতে আপনি-হারা—থমথমে দুপুরে যদুবাবু মাঝে মাঝে বিড়ি খাইতে খাইতে শিক্ষকদেরঘরের জানালা দিয়া চাহিয়া দেখেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কী যদুদা, বিশ্রাম নাকি?

—না ভাই, পরিশ্রম। একটা বিড়ি খেয়ে যাই।

—আমাকেও একটা দেবেন।

হেডপণ্ডিতের দিকে চাহিয়া যদুবাবু বলিলেন, কাল একটা ছুটি করিয়ে নাও না, দাদা, সাহেবের কাছ থেকে। কাল ঘণ্টাকর্ণ পুজো—

হেডপণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঃ, ঘণ্টাকর্ণ পুজোর আবার ছুটি—তাই কখনও দেয়!

—কেন দেবে না? তুমি বুঝিয়ে বোলো, তুমিই তো ছুটির মালিক।

—না না, সে দেবে না।

—বলেই দেখ না দাদা। বলো গিয়ে, হিন্দুর একটা মস্ত বড় পরব।

—ভাল, তোমাদের কথায় অনেক কিছুই বললুম। তোমরা শিখিয়ে দিলে যে, রামনবমী আর পুজো প্রায় সমান দরের পরব। রাস, দোল, ষষ্ঠীপুজো, মাকালী পুজো—তোমরা কিছুই বাদ দিলে না। আবার ঘণ্টাকর্ণ পুজোর জন্যে ছুটি চাই, কী বলে—

—যাও যাও, বলে এসো, তুমি বললেই হয়।

ক্ষেত্রবাবু ছাদের এক ধারে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওহে, খুকির বর কাল এসে গেছে!

যদুবাবু ও হেডপণ্ডিত এক সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন, সত্যি? এসে গেছে?

—ওই দেখুন না, বসে আছে!

—যাক, বাঁচা গেল। আহা, মেয়েটা বড় কষ্ট পাচ্ছিল।

এই উঁচু তেতলার ছাদের ঘরে বসিয়া চারিপাশের অনেক বাড়ির জীবনযাত্রার সঙ্গে ইঁহাদের প্রত্যক্ষ পরিচয়। বাড়ির মালিকের নাম-ধাম পর্যন্ত জানা নাই—অথচ ক্ষেত্রবাবু জানেন, ওইহলদে রঙের তেতলা বাড়িটার বড় ছেলে গত কার্তিক মাসে মারা গেল। বেশ কোট-প্যান্ট পরিয়া কোথায় যেন চাকুরি করিত, বাড়ির

গিন্নির আছাড়িবিছাড়ি মর্মভেদী কান্না। টিফিনেরঅবকাশে এখানে বসিয়া দেখিয়া ক্ষেত্রবাবুর ও জ্যোতির্বিনোদ মহাশয়ের চোখে জল আসিয়াছিল।

এই যে খুকির বর আসিল, ইঁহারা জানেন, ষোলো-সতেরো বছরের সুন্দরী কিশোরী, বাড়ির ওই জানালাটিতে আনমনে বসিয়া পথের দিকে চাহিয়া থাকিত, আপনমনে চোখের জল ফেলিত।জ্যোতির্বিনোদ মহাশয় এই ঘরেই থাকেন। তিনি বলেন, রাত্রে ছাদে মেয়েটি পায়চারি করিয়াবেড়াইত, এক-একবার কেহ কোনো দিকে নাই দেখিয়া ছাদে উপুড়হইয়া প্রণাম করিয়া কী যেনমনে মনে মানত করিত। মেয়েটি যে অসুখী, সকলেই বুঝিতেন। মেয়েটি বিবাহিতাঅথচ আজ এক বৎসরের মধ্যে তাহার স্বামীকে দেখা যায় নাই—কাজেই আন্দাজ করিয়াছিলেন, স্বামীরঅদর্শনই মেয়েটির মনোদুঃখের কারণ। কী জাত, কী নাম, তাহা কেহই জানেন না; অথচ এই অনাত্মীয়া, অজ্ঞাতকুলশীলা কিশোরীর দুঃখে প্রৌঢ় শিক্ষকদের মন সহানুভূতিতে ভরিয়া ছিল, যদিও অল্পবয়স্ক দুই-একজন শিক্ষক ইঁহাদের অসাক্ষাতে কিশোরীকে লক্ষ্য করিয়া এমন সব কথা বলিত, যাহা শোভনতার সীমা অতিক্রম করে।

মাঝে মাঝে জ্যোতির্বিনোদ মহাশয় বলিতেন, আহা, কাল রাত্রে খুকি বড় কেঁদেছে একাএকা ছাদে! হেডপণ্ডিত বলিতেন, ভাই, বড় তো মুশকিল দেখছি! কী হয়েছে ওর বরের ? কোথায় গেল?

কেহই কিছু জানে না, অথচ মেয়েটির সুখদুঃখ তাঁহারা নিজের করিয়া লইয়াছেন। আজইঁহারা সত্যই খুশি—খুকির বর আসিয়াছে। বিশেষ করিয়া হেডপণ্ডিত ও ক্ষেত্রবাবু।

হেডপণ্ডিতের মেয়ে রাধারানি, প্রায় এই কিশোরীর সমবয়সী, আজ এক বৎসর হইল মারাগিয়াছে টাইফয়েড রোগে। মেয়েটির দিকে চাহিলেই নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে। বাপেরঅমন সেবা রাধারানির মতো কেহ করিতে পারিত না। স্কুলের খাটুনির পরে বৈকালে বাড়িফিরিলে দেখিতেন, রাধা তাহার জন্য হাত-পা ধোয়ার জল ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, হাত পা ধোয়া হইলেই একটু জলখাবার আনিয়া দিবে, পাখা লইয়া বাতাস করিবে, কাছে বসিয়া কত গল্প করিবে—ঠিক যেন পাকা গিন্নি। তাহার একমাত্র দোষ ছিল, বায়োস্কোপ দেখিবার অত্যধিকনেশা। প্রায়ই বলিত, বাবা, আজ কিন্তু—

—না মা, এই সেদিন দেখলি, আজ আবার কী!

—তুমি বাবা জানো না, কী সুন্দর ছবি হচ্ছে আমাদের এই চিত্রবাণীতে, সবাই দেখে এসেভাল বলেছে বাবা।

—রোজ রোজ ছবি দেখতে গেলে চলে মা? ক'টাকা মাইনে পাই?

—তা হোক বাবা, মোটে তো ন আনা পয়সা!

—ন আনা ন আনা—দেড় টাকা। তোর গর্ভধারিণী যাবে না?

—মা কোথাও যেতে চায় না। তুমিআর আমি—

হেডপণ্ডিত ভাবিতেন, মেয়েটি তাঁহাকে ফতুর করিবে, বায়োস্কোপের খরচ কতযোগাইবেন তিনি এই সামান্য ত্রিশ টাকা বেতনের মাস্টারি করিয়া ? উঃ, কী ভালই বাসিত সে ছবি দেখিতে! ছবি দেখিলে পাগল হইয়া যাইত, বাড়ি ফিরিয়া তিন দিন ধরিয়া তাহার মুখে অন্যকথাথাকিত না, ছবির কথা ছাড়া।

কোথায় আজ চলিয়া গেল! আজকাল দুই-একখানা ভাল বাংলা ছবি হইতেছে, ছবিতেকথাও কহিতেছে—এসব দেখিতে পাইল না মেয়ে। বায়োস্কোপের খরচ হইতে তাঁহাকে একেবারেমুক্তি দিয়া গিয়াছে।

যদুবাবু বলিলেন, তা যাও এ বেলা দাদা,—ছুটিটার জন্যে। তুমি গিয়ে বললেই হয়েযাবে।

ইঁহাদের অনুরোধে হেডপণ্ডিত ভয়ে ভয়ে গিয়া হেডমাস্টারের আপিসে ঢুকিয়া টেবিলেরসামনে দাঁড়াইলেন।

ক্লার্কওয়েল সাহেব কী লিখিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, হোয়াট? পান্ডিট! সিওরলিইট ইজ নট এ হলিডে ইউ হ্যাভ কাম টু আস্ক ফর ?

হেডপণ্ডিত বলিলেন, কাল ঘণ্টাকর্ণ পুজো স্যার।

সাহেব বলিলেন, হোয়াট ইজ দ্যাট ? ঘণ্টা—

—ঘণ্টাকর্ণ! হিন্দুর এত বড় পর্ব আর নেই।

—ও ইউ নটি ফেলো, তুমি প্রত্যেক বারই বলো এক কথা!

—না সার, পাঁজিতে লেখে—

—ওয়েল, আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইট—হবে না। কী পুজো বললে, ওতে ছুটি হবে না।

হেডপণ্ডিত বুঝিলেন তাহার কাজ হইয়া গিয়াছে। সাহেব প্রত্যেক বারই ও-রকম বলেন, শেষ ঘণ্টায় দেখা যাইবে, স্কুলের চাকর সার্কুলার-বই লইয়া ক্লাসে ক্লাসে ঘুরিতেছে।

হেডপণ্ডিত ফিরিয়া আসিলে মাস্টারেরা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

ক্ষেত্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কী হল দাদা?

যদুবাবু বলিলেন, কার্যসিদ্ধি ?

—দাঁড়াও দাঁড়াও, হাঁপ জিরিয়ে নিই। সাহেব বললে, হবে না।

—হবে না বলেছে তো? তা হলে ও হয়ে গিয়েছে। বাঁচা গেল দাদা, মলমাস যাচ্ছিল, তবুও ঘণ্টাকর্ণের দোহাই দিয়ে—

—এখনও অত হাসিখুশির কারণ নেই। যদি পাশের স্কুলে জিজ্ঞেস করতে পাঠায়, তবেইসব ফাঁক। আমি বলেছি, হিন্দুর অত বড় পর্ব আর নেই। এখন যদি অন্য স্কুলে জানতে পাঠায় ?

ছোকরা উমাপদবাবু বলিলেন, যদি তারাও ঘণ্টাকর্ণ পুজোয় ছুটি দেয় ?

হেডপণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, ঘণ্টাকর্ণ পুজোর ছুটি কে দেবে, রামোঃ !

কিন্তু সাহেবের ধাত সবাই জানে। শেষ ঘণ্টা পর্যন্ত মাস্টারের দল দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষাকরিবার পরে সকলেই দেখিল, স্কুলের চাকর ছুটির সারকুলার লইয়া ক্লাসে ক্লাসে দৌড়াদৌড়িকরিতেছে।

যদুবাবুর ক্লাস সিঁড়ির পাশেই। তিনি বলিলেন, কী রে, কী ওখানে?

চাকর একগাল হাসিয়া বলিল, কাল ছুটি আছে, সারকুলার বেরিয়েছে।

—সত্যি নাকি? দেখি, নিয়ে আয় এদিকে।

চোখকে বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু সত্যই বাহির হইয়াছে :

"The School will remain closed tomorrow the 9th inst. for the great Hindu festival, Ghanta Karna Puja."

কিছুক্ষণ পরে ছুটির ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দল মহাকলরব করিয়া বাহিরহইয়া গেল।

যদুবাবুকে ডাকিয়া হেডমাস্টার বলিলেন, আপনি আর ক্ষেত্রবাবু ফোর্থ ক্লাসের ছেলেদেরমিউজিয়ম আর জু'তে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারবেন?

—খুব স্যার।

—দেখবেন, যেন ট্রাম থেকে পড়ে না যায়—একটু সাবধানে নিয়ে যাবেন। আর এইটাকা, আনুষঙ্গিক খরচ আর ছেলেদের টিফিন। ছেলেদের বেশ করে বুঝিয়ে দেবেন। সবদেখাবেন।

যদুবাবু স্কুলের সামনের বারান্দাতে গিয়া দাঁড়াইলেন। ছেলেরা দুই সারিতে দাঁড়াইল।হেডমাস্টারের বেতের ভয়ে। ড্রিল মাস্টারের আদেশ অনুযায়ী তাহারা মার্চ করিয়া চলিল। কিন্তুখুব বেশিক্ষণের জন্য নয়, রাস্তার মোড়ে আসিয়া তাহারা আবার দাঁড়াইয়া গেল।

যদুবাবু অনেক পিছনে ছিলেন, ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে আসিবার বয়স তাহার নাই।

ক্ষেত্রবাবু আর একটু আগাইয়া ছিলেন, তিনি দৌড়িয়া গিয়া বলিলেন, দাঁড়ালি কেন রে?

—আমরা ট্রামে যাব স্যার।

—ট্রামের পয়সা কাছে আছে সব?

দুই একজন বড় ছেলে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, স্কুল থেকে পয়সা দেয়নি স্যার?

—কই না! আমার কাছে তো দেয়নি। যদুবাবুর কাছে আছে কিনা জানি না, দাঁড়াওদেখি।

ইতিমধ্যে যদুবাবু আসিয়া ইহাদের কাছে পৌঁছিলেন : কী ব্যাপার? দাঁড়িয়েচ কেন?

—আপনার কাছে ট্রামের ভাড়া দিয়েছেন হেডমাস্টার?

—হ্যাঁ। কিন্তু সে চৌরঙ্গীর মোড় থেকে—এখান চড়লে পয়সায় কুলুবে না। আপনিওদের নিয়ে যান, আমি আর হাঁটতে পারছিনে। ট্রামে যাই।

—তবে আমিও ট্রামে যাই। ওরা হেঁটে যাক।

সেই ব্যবস্থাই হইল। যদুবাবু ও ক্ষেত্রবাবু ট্রামে চৌরঙ্গীর মোড়ে আসিয়া ছেলেদের জন্যঅপেক্ষা করিলেন। ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমি কিন্তু কালীঘাট যাচ্ছি আমার বন্ধুর বাড়ি, আমিজু'তে যাব না।

ক্ষেত্রবাবু কালীঘাটের ট্রামে উঠিয়া পড়িলেন। যদুবাবু দলবল সমেত এদিকের গাড়িতেউঠিলেন। খিদিরপুরের ট্রাম হইতে নামিয়া ছেলেরা হৈ-হৈ করিয়া জু'র দিকে ছুটিল। যদুবাবু জুঅনেকবার দেখিয়াছেন, তিনি কি ছেলেদের দলে মিশিয়া হৈ-হৈ করিবেন এখন ? একটা গাছেরতলায় বসিলেন, পড়িয়া দেখিলেন, গাছের নাম 'পুত্রন্জীর রক্সবাজি'—জীবপুত্রিকা বৃক্ষ। এইবৃক্ষের ফলের বীজ মৃতবৎসা নারীর গলায় পরাইয়া দিলে ছেলে হইয়া মরে না। তাঁহার স্ত্রীওমৃতবৎসা। এখন ফল লইয়া গেলে কেমন হয় ? বয়স অনেক হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় সুবিধা হইবে না।... কী চমৎকার ওই ছেলেটা! প্রজ্ঞাব্রত! যেমন নাম, তেমনই দেখিতে। ছেলে যদিহইতে হয়, প্রজ্ঞাব্রতের মতো।

একটি ছেলের দল সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে দেখিয়া বলিল, স্যার, আমাদের একটু দেখাবেন ?

—কী দেখাব?

—স্যার, অনেক পাখি-জানোয়ারের নাম লেখা আছে, বুঝতে পারছিনে। একটু আসুন নাস্যার!

—হ্যাঁ, আমার এখন ওঠবার শক্তি নেই। তোরা নিজেরা গিয়ে দেখ্‌গে যা। প্রজ্ঞাব্রতকোথায় রে?

—অন্য দিকে গিয়েছে স্যার, দেখছিনে। যাই তবে স্যার।

যদুবাবু আপন মনে বসিয়া বসিয়া হিসাব করিলেন। সাহেব ছেলেদের টিফিনের জন্য পাঁচটাকা দিয়াছে—ছেলে মোট ত্রিশ জন, ছেলে-পিছু দুই টুকরো রুটি আর একটু মাখন দিলে টাকা দেড়-দুই খরচ। বাকি টাকা পকেটস্থ করা যাইবে। নগদে আড়াই টাকা লাভ।

ফিরিবার পথে ছেলের দল অনেক সরিয়া পড়িল এদিক ওদিক। কেহ গেল ময়দানে হকিখেলা দেখিতে, কেহ কাছাকাছি অঞ্চলে কোনো মাসি-পিসির বাড়ি গিয়া উঠিল। যদুবাবু মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলেন, দেড় টাকার মধ্যে বাকি ছেলেদের রুটি-মাখন ভাল করিয়াইচলিবে। নিউ মার্কেট হইতে নিজেই তিনখানা বড় রুটি ও কিছু মাখন কিনিলেন, মিউজিয়মহইতে বাহির হইয়া মাঠে বসাইয়া ছেলেদের খাওয়াইয়া দিলেন।

ছেলেরা পাছে আবার ট্রামের পয়সা চাহিয়া বসে, এই ছিল যদুবাবুর ভয়। কিন্তু ছেলেরাবৈকালবেলা মুক্তির আনন্দে কে কোথায় চলিয়া গেল। ছেলেরা এত হিসাব বোঝে না, হেডমাস্টার ট্রামের পয়সা দিয়াছিলেন কিনা সে কৈফিয়ত কেহ লইল না। যদুবাবু একা বাসারদিকে চলিতে চলিতে সতৃষ্ণ নয়নে ধর্মতলার মোড়ে গ্লোব রেস্টুরেন্টের দিকে চাহিলেন। চপকাটলেট ভাজার সুরুচি-ঘ্রাণ ফুটপাথের দক্ষিণ হাওয়াকে মাতাইয়াছে। পকেটে নগদ আড়াই টাকাউপরি পাওনা—বাড়ির একঘেয়ে সেই ডাঁটাচচ্চড়ি আর কুমড়োভাজা খাইতে খাইতে যৌবনচলিয়া গেল। যদি পেটে ভাল করিয়া না খাইলাম তবে চাকুরি করা কী জন্য? চক্ষু বুজিলে সব অন্ধকার! ছেলে নাই, পিলে নাই, কাহার জন্য খাটিয়া মরা!

রেস্টুরেন্টে ঢুকিয়া দুইখানা ফাউল কাটলেট, দুইখানা চপ, এক প্লেট কোর্মা, দুইখানা ঢাকাইপরোটা অর্ডার দিয়া যদুবাবু মহাখুশির সহিত আপনমনে উদরসাৎ করিতেছেন, এমন সময়ফুটপাথ দিয়া প্রজ্ঞাব্রতকে যাইতে দেখিয়া ডাকিলেন, ও প্রজ্ঞা, ওরেশোন্ শোন্—

প্রজ্ঞাব্রত হকিখেলা দেখিয়া বাড়ি যাইতেছিল, উঁকি মারিয়া বলিল, স্যার, আপনি এখানে?

—শোন্ শোন, বোস্। খাবি?

—না স্যার, আপনি খান।

—কেন, বোস্ না। আয়। এই বয়, দু'খানা চপ আর দু'খানা কাটলেট দাও তো!

প্রজ্ঞাব্রত দুই-একবার মৃদু প্রতিবাদ করিয়া খাইতে বসিল। যদুবাবু তাহাকে জোর করিয়া এটা-ওটা আরও খাওয়াইলেন। যাইবার সময়ে তাহাকে বলিলেন, একটা সিগারেট কিনে আনতো, এই নে পয়সা।

সিগারেট ধরানো হইলে দুইজনে কিছুক্ষণ ধর্মতলা ধরিয়া চলিলেন।

একটা গ্যাস-পোস্টের নীচে আসিয়া যদুবাবু বলিলেন, হ্যাঁরে, তুই চাঁদা দিয়েছিলি?

—কিসের স্যার?

—এই আজ জু'তে আসবার জন্যে?

—হ্যাঁ স্যার, চার আনা।

যদুবাবু একটা সিকি বাহির করিয়া প্রজ্ঞাব্রতের হাতে দিয়া বলিলেন, এই নে, নিয়ে যা—কাউকে বলিসনে—

প্রজ্ঞাব্রত বিস্মিত হইয়া বলিল, ও কী স্যার! জু দেখলাম, ট্রামে গেলাম, রুটি-মাখনখাওয়ালেন তখন—

—তুই নিয়ে যা না! তোর অত কথার দরকার কী? কাউকে বলবি নে!

—না স্যার, আমি নেব না—

—নে বলচি, ফাজলামো করিস নে,—নিয়ে নে—

প্রজ্ঞাব্রত আর দ্বিরুক্তি না করিয়া হাত পাতিয়া সিকিটি লইল।

—আমার এই গলি স্যার, যাই আমি।

—চল না, আমায় একটু এগিয়ে দিবি। বেশ লাগে তোর সঙ্গে যেতে।

প্রজ্ঞাব্রত অনিচ্ছার সহিত আরও কিছু দূরে গিয়া ওয়েলিংটন স্ট্রীটের মোড়ে আসিয়াবলিল, যান স্যার, আমি আর যাব না—

পরদিন যদুবাবু হেডমাস্টারের কাছে আট টাকা দশ আনার এক বিল দাখিল করিয়াবিনীতভাবে জানাইলেন, দশ আনা বেশি খরচ হইয়া গিয়াছে ট্রামভাড়া, ছেলেদের খাওয়ানো, আনুষঙ্গিক খরচ।

হেডমাস্টার বলিলেন, ওয়েল, এই নাও দশ আনা।

ছেলেরা কিন্তু ক্লাসে বলাবলি করিতে লাগিল, যদুবাবু তাহাদের কিছুই খাওয়ান নাই।হেডমাস্টার কত টাকা যদুবাবুর হাতে দিয়াছেন, কেহ কেহ তাহাও অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িল না।

প্রজ্ঞাব্রত সকলকে বলিল, যদুবাবু গ্লোব রেস্টুরেন্টে বসিয়া মনের সাধে চপ-কাটলেট খাইতেছিলেন, সে পথ দিয়া যাইবার সময় দেখিয়াছে। তাহাকে যে খাওয়াইয়াছেন, সেকথা প্রকাশকরিল না।

যদুবাবু ফোর্থ ক্লাসে তৃতীয় ঘণ্টায় পড়াইতে গিয়া দেখিলেন, ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা আছে—গ্লোব রেস্টুরেন্ট, চপ এক আনা, মুর্গির কাটলেট দশ পয়সা! জু হইতে ফিরিবার পথে সকলে খাইয়া যান!

যদুবাবু দেখিয়াও দেখিলেন না। টিফিনের ঘণ্টায় প্রজ্ঞাব্রতকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, ওসব কে লিখেছে বোর্ডে? তুই কিছু বলেছিস?

সে বলিল, না স্যার, আমি কাউকে বলিনি।।

—আর কেউ দেখেছিল আমাকে, বললে কেউ?

—তাও স্যার আমি জানি না—

মি. আলমের চোখে লেখাটি পড়িল টিফিনের পরের ঘণ্টায়। মি. আলম কূটবুদ্ধিসম্পন্নলোক, জিজ্ঞাসা করিল, এসব কী ?

ছেলেরা পরস্পর গা-টেপাটেপি করিল। দুইজন বইয়ের আড়ালে মুখ লুকাইয়া হাসিল।

—কী, বল না! মনিটার?

একজন লম্বা ছেলে উঠিয়া বলিল, কী স্যার?

—এ কে লিখেছে?

—দেখিনি স্যার।

কাল তোরা জু'তে গিয়েছিলি কার সঙ্গে?

—যদুবাবু ও ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে গিয়েছিলাম। তবে ক্ষেত্রবাবু কালীঘাট চলে গেলেন, যদুবাবু ছিলেন।

মি. আলম জেরা করিয়া সংগ্রহ করিলেন, তাহারা কী খাইয়াছিল, কত দূর ট্রামে গিয়াছিলইত্যাদি। হেডমাস্টারকে আসিয়া বলিলেন, কাল ক'টাকা দিয়েছিলেন স্যার যদুবাবুকে? ছেলেরাতো দু টুকরো রুটি আর মাখন খেয়েচে, যাবার সময় একবারই ট্রামে গিয়েছিল, আর এসেছিল মিউজিয়াম পর্যন্ত। আর কোনো খরচ হয়নি।

—তিন টাকা ট্রামভাড়া আর পাঁচ টাকা টিফিন—যদুবাবু আট টাকা দশ আনার বিলদিয়েছে।

—স্যার, আপনি অনুসন্ধানের ভার যদি আমার ওপর দেন, আমি প্রমাণ করব—যদুবাবুস্কুলের টাকা চুরি করেছেন। উনি নিজে ফেরবার পথে চপ-কাটলেট খেয়েছেন দোকানে বসে, ফোর্থ ক্লাসের প্রজ্ঞাব্রত দেখেচে। সে আপনার কাছে সব বলতে রাজী হয়েছে। ডেকে নিয়েআসি তাকে যদি বলেন! যদুবাবু শিক্ষকের উপযুক্ত কাজ করেননি, ছেলেদের খাওয়াননি, অথচ স্কুলে বাড়তি বিল দিয়েছেন—এ একটা গুরুতর অপরাধ। আমার ধারণা উনি এ রকমআরও কয়েক বার করেছেন—জু'তে ছেলেদের নিয়ে যাবার সময় তাই উনি সকলের আগে পাবাড়ান। ব্ল্যাকবোর্ডে ছেলেরা যা-তা লিখেচে ওঁর নামে।

হেডমাস্টার হাসিয়া বলিলেন, লেট্ গো মি. আলম। এ বিষয়ে আর কিছু উত্থাপন করবেননা।হাজার হলেও আমাদেরই একজন টিচার, সহকর্মী—ছেড়ে দিন ওকথা। আই ডোন্ট গ্রাজ দি পুওর ফেলো এ কাটলেট অর টু—

গ্রীষ্মের ছুটির আর দেরি নাই। অন্য সব স্কুলে মর্নিং-স্কুল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এস্কুলে হেডমাস্টারের কাছে বহু দরবার করা সত্ত্বেও আজও মর্নিং-স্কুল হয় নাই। হেডমাস্টারেরধারণা, মর্নিং-স্কুল হইলে লেখাপড়া ভাল হয় না ছেলেদের। ক্লাসে ক্লাসে পাখা আছে, মর্নিং-স্কুলেরকী দরকার!

ডেপুটেশনের পর ডেপুটেশন হেডমাস্টারের আপিসে গিয়া ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিল। অবশেষে সকলে মি. আলমকে গিয়া ধরিল। হেডপণ্ডিত বলিলেন, যান মি. আলম, বুঝিয়ে বলুন একবারটি।

আলমের দ্বারা স্কুলের ক্ষতিজনক কোনো কার্য হওয়া সম্ভব নয়, তিনি জানাইলেন।

অবশেষে অন্য সব মাস্টার জোট পাকাইয়া হেডমাস্টারের আপিসে গেলেন। ক্লার্কওয়েলএকগুঁয়ে প্রকৃতির মানুষ যাহা ধরিয়াছেন তাহার নড়চড় হইবার জো নাই। কাহারও কথায়কর্ণপাতও করিলেন না। বরং ফল হইল, যেসব মাস্টার দরবার করিতে গিয়াছিলেন তাঁহাদেরউপর নানারকম বেশি খাটুনির চাপ পড়িল।

ছুটির পর প্রায়ই স্কুল হইতে মাস্টারদের চলিয়া যাইবার উপায় ছিল না। প্রশ্নপত্র লিথোকরিতে হইবে, ক্লাসের ট্রানস্লেশন দেখিয়া ভুল-ভ্রান্তি শুদ্ধ করিয়া তাহা হেডমাস্টারের টেবিলেপেশ করিতে হইবে। হেডমাস্টার দেখিতেন, ঠিকমতো খাতা দেখা হইয়াছে কিনা।

আজ হুকুম হইল, প্রত্যেক শিক্ষক প্রতি দিন প্রত্যেক ক্লাসে কী পড়াইবেন তাহা নোট করিবেন, সে নোট আবার সাহেবের কাছে দাখিল করিতে হইবে।

হেডমাস্টার বলিলেন, স্কুলে পাখা আছে, মর্নিং-স্কুল কী জন্যে? যে সব মাস্টারের না পোষাবে, তিনি চলে যেতে পারেন। মাই গেট ইজ ওপন্—

গলদঘর্ম হইয়া মাস্টারেরা আর দিন-চারেক স্কুল করিলেন। তারপর একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ সারকুলার বাহির হইল, কাল হইতেই মর্নিং-স্কুল। ক্লার্কওয়েলের সব কাজই ওই রকম—পরের কথায় বা বুদ্ধিতে তিনি কিছুই কাজ করিবেন না, নিজের খেয়ালমত চলিবেন।

মর্নিং-স্কুল বসিবে ছ'টায়। দূরে যেসব মাস্টার থাকেন, তাহারা শেষরাত্রে উঠিয়া রওনা না হইলে আর ছয়টায় আসিয়া হাজিরা দিতে পারেন না। তাহার উপর সাড়ে দশটায় ছুটির পররোজ বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত শিক্ষকদের লইয়া পরামর্শ-সভা বসিবে।

সভার কার্যপ্রণালী নিম্নোক্ত রূপ :

১। সেভেন্‌থ্ ক্লাসে কী করিয়া হাতের লেখার উন্নতি করা যায় ?

২। থার্ড ক্লাসের ছেলেরা শ্রুতিলিখনে কাঁচা—কী ভাবে তাহারা শ্রুতিলিখনে উন্নতি করিতে পারে?

৩। একজন টিচার কাল ক্লাসে বাজে গল্প করিয়াছিলেন—তাহার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করাযায়?

হেডমাস্টার প্রথমে বলিলেন, আচ্ছা, সেভেনথ্ ক্লাসের হাতের লেখা সম্বন্ধে কার কীমত?

ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত টিচারের দল মনের বিরক্তি চাপিয়া চাকুরির খাতিরে মুখে কৃত্রিম উৎসাহ ও গভীর চিন্তার ভাব আনিয়া একে একে আলোচনায় যোগ দিলেন।

কাহারও ফাঁকি দিবার উপায় নাই, কেহ চুপ করিয়া উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিবেন, তাহারজো কী? হেডমাস্টার অমনি বলিবেন, যদুবাবু, হোয়াই ইউ আর সাইলেন্ট ?

সর্বশেষে মি. আলমের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে সাহেব বলিলেন, নাউ অ্যাট লাস্ট লেটআস হিয়ার মি. আলম!

মি. আলম গম্ভীর মুখে উঠিলেন। যেন 'প্রাইম মিনিস্টার' কোনো গুরুতর বিল আলোচনা করিবার জন্য ট্রেজারি বেঞ্চ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মি. আলমের হাতে তিনপাতা লেখাকাগজ, সেভেনথ্ ক্লাসের হাতের

লেখা ভাল করা সম্বন্ধে এক গুরুগম্ভীর নিবন্ধ। তাহার মধ্যেকত উদাহরণ, কত প্রস্তাব, কত মহাজন-বাণী উদ্ধৃত!

মি. আলম মাথা দুলাইয়া সতেজ উচ্চারণের সহিত গোটা নিবন্ধটা পড়িয়া গেলেন, "অন্ দি বেটারমেন্ট অফ হ্যান্ডরাইটিং অফ সেভেনথ্ ক্লাস বয়েজ"—ঝাড়া দশ মিনিট লাগিল।

টিচারদের সভা চুপ। হেডমাস্টার বলিলেন, মি. আলম একজন আদর্শ শিক্ষক। এ কথা আমি কতদিন বলেছি। মানুষের মতো মানুষ একজন। কারও কিছু বলবার আছে মি. আলমের প্রবন্ধ সম্বন্ধে ? নারাণবাবু?

বৃদ্ধ নারাণবাবু একটা কী সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

—ওয়েল, যদুবাবু?

যদুবাবু বিনীতভাবে জানাইলেন, তাঁহার কিছু বলিবার নাই। মি. আলমের প্রবন্ধের পরআর বলিবার কী থাকিতে পারে!

—ওয়েল, ক্ষেত্রবাবু? —না স্যার, আমার কিছু বলবার নেই।

এক পর্ব শেষ হইল। বেলা সাড়ে এগারোটা বাজে, জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে রাস্তার পিচ গলিয়া গিয়াছে। অনেকে চিন্তা করিতেছেন, বাড়ি ফিরিয়া আর স্নানের জল পাওয়া যাইবে না। চৌবাচ্চায় দুই ইঞ্চি জলও থাকে না এত বেলায়। অথচ কিছু বলিবার জো নাই, সাহেব বলিবেন, মাই গেট ইজ ওপন্—

ঠিক বারোটার সময় 'টিচার্স মিটিং' সাঙ্গ হইল।

বাহিরে পা দিয়াই যদুবাবু বলিলেন, ব্যাটা কী খোশামুদে! দেখলে তো একবার! আবার এক প্রবন্ধ লিখে এনেচে! কাজের আঁট কত !

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, একেবারে লর্ড বেকন্—"অন্ দি বেটারমেন্ট অফ হ্যান্ডরাইটিং অফসেভেনথ্ ক্লাস বয়েজ"। হামবাগ্ কোথাকার!

যদুবাবু বলিলেন, আর এক খোশামুদে ওই নারাণবাবু। তোর কোনো কুলে কেউ নেই, সন্নিসি হয়ে যা! দরকার কী তোর খোশামুদির ?

নীচের ক্লাসের একজন টিচার মেসে থাকিতেন। তিনি সামান্য মাহিনা পান, মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে সাহস পান না। তিনি কতকটা আপন মনেই বলিলেন, কোনোদিন নাইতে পারিনে—আজ মর্নিং-স্কুল হয়ে পাঁচ দিন নাইনি।

যদুবাবু বলিলেন, এই বলে কে! কই, তুমি তো মুখ ফুটে কথাটা বলতে পারলে না ভায়াসাহেবকে!

—আপনারা সিনিয়র টিচার রয়েছেন, কিছু বলতে পারেন না। আমি চুনোপুঁটি—আমার সাহস কী?

—ওই তো দোষ ভায়া। ওতেই তো পেয়ে বসে। প্রোটেস্ট করতে হয়—মেনে নিলেইবিপদ।

—আপনারা প্রোটেস্ট করুন গিয়ে দাদা, আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

গ্রীষ্মের ছুটি পর্যন্ত প্রায় এই রকম চলিল। গ্রীষ্মের ছুটি আসিয়া পড়িবার দেরি নাই।ছেলেরা সেদিন গান গাহিবে, আবৃত্তি করিবে। দুই-একজন শিক্ষক তাহাদের তালিম দিবার ভার লইয়া স্কুলের কাজ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন।

দুই মাসের বেতন এই সময়ে একসঙ্গে পাওয়ার কথা। মোটেই পয়সা দেওয়া হইবে না! শুনিয়া মাস্টারদের মুখ শুকাইয়া গেল। হেডমাস্টারের কাছে দরবার শুরু হইল। হেডমাস্টারবলিলেন, আমি বা মিস সিবসন এক পয়সা নেব না—কেউ কিছু নিচ্ছি না। মাইনে আদায় যাহয়েছিল, কর্পোরেশনের ট্যাক্স আর বাড়ি-ভাড়াতে গেল।

দুই-একজন শিক্ষক একটু ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, আমরা তবে খাব কি?

—আমি জানি না। আপনাদের না পোষায়, মাই গেট ইজ ওপন্—

গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রত্যেক মাস্টারের উপর দুই-তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়া আনিবার ভার পড়িল— ছাত্রদের প্রতি কর্তব্য, বিভিন্ন বিষয় পড়াইবার প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে। মাস্টারদের দল মুখে কিছুবলিতে পারিলেন না। মনে মনে কেহ চটিলেন, কেহ ক্ষুব্ধ হইলেন।

যদুবাবু বলিলেন, ওঃ, ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার গোঁসাই। মাইনের সঙ্গেখোঁজ নেই, প্রবন্ধ লিখে নিয়ে এসো—দায় পড়েছে—

ক্ষেত্রবাবু অনেক দিন পরে গ্রামের বাড়িতে আসিলেন, স্ত্রী নিভাননী ও দুই-তিনটি ছেলেমেয়ে।

আজ প্রায় ছয় বছর পৈতৃক ভিটাতে আসেন নাই। চারিধারে জঙ্গল, বাড়িঘরে গাছ গজাইয়াছে। জমিজমা, আম-কাঁঠালের বাগান যাহা আছে, বারোভূতে লুটিয়া খাইতেছে। গ্রামের নাম আস্‌সিংড়ি—কয়েক ঘর গোয়ালার ব্রাহ্মণ এ গ্রামে বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন গৃহস্থ, ধান পুকুরজমিজমা যথেষ্ট তাহাদের। অন্য কোন ভাল ব্রাহ্মণ গ্রামে নাই, কায়স্থ আছে কিন্তু, গোয়ালা জেলে ছুতার কর্মকার এবং ষাট-সত্তর ঘর মুসলমান— এই লইয়া গ্রাম।

গ্রামে জঙ্গল খুব, বড় বড় আম-কাঁঠালের বাগান। ক্ষেত্রবাবুর পৈতৃক বাড়ি কোঠা, বড়বড় চার-পাঁচখানা ঘর; কিন্তু মেরামতের অভাবে ছাদ দিয়া জল পড়ে। বাড়ির উঠানে বড় বড়কাঁঠালগাছে অনেক কাঁঠাল ফলিয়াছে, নারিকেলগাছে ডাবের কাঁদি ঝুলিতেছে। বাড়ির সামনেপুকুর, সেখানে কর্তাদের আমলে বড় বড় মাছ জাল দিয়া ধরা হইত, আজ কিছু নাই। শরিকএক জ্যাঠতুতো ভাই এতদিন সব খাইতেছিল, আজ বছর দুই হইল সে উঠিয়া গিয়া শ্বশুরবাড়িবাস করিতেছে।

সকালে উঠিয়া ক্ষেত্রবাবু গ্রামের প্রজাদের ডাকাইলেন। সকলে আসিয়া প্রণাম করিল এবংএতদিন পরে তিনি গ্রামে আসিয়াছেন ইহাতে যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিল।—বাপ-পিতামহের ভিটা ছাড়িয়া বাহিরে না গেলে কি অন্ন হয় না? বাবু এখানে থাকুন, তাহারা ধানের জমি করিয়া দিবে, চলিবার সব ব্যবস্থা করিয়া দিবে। ক্ষেত্রবাবুও ভাবিলেন, সাহেবের তাঁবে থাকিয়া দিনরাত্রি দাসত্ব করার চেয়ে এ কত ভাল। 'টিচার্স মিটিং' নাই, দুই ঘণ্টা করিয়া প্রতি দিন খাতা কারেক্ট করিবার হাঙ্গামা নাই, মি. আলমের ধূর্ত চক্ষুর চাহনিতে আর ভয় খাইতে হইবে না—এই তোকত চমৎকার! নাকে-মুখে গুঁজিয়া স্কুলে দৌড়িবার তাড়া থাকিবে না।

নিভাননী হাসিয়া বলিল, দুধ এখানকার কী চমৎকার গো! ইটিলিতে এমন দুধ কিন্তু দেয় নাগোয়ালা!

ক্ষেত্রবাবু বলেন, কোত্থেকে সেখানকার গোয়ালারা ভাল দুধ দেবে? তা দিতে পারেকখনও?

দিনকতক ভাল দুধের পায়েস পিঠে খাওয়া হইল। বাড়িতে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেওয়াহইল একদিন। ইতিমধ্যে আম-কাঁঠাল পাকিয়া উঠিল। ছেলেমেয়েরা প্রাণ পুরিয়া আম খাইল। গ্রামের দক্ষিণে জোলের মাঠ, অনেক খেজুর পাকিয়াছে গাছে গাছে, ক্ষেত্রবাবু ছেলেমেয়েদেরহাত ধরিয়া মাঠে গিয়া খেজুর কুড়াইয়া বাল্যের আনন্দ আবার উপভোগ করেন—যখন এ গ্রাম ছাড়া আর কোথাও বৃহত্তর দুনিয়ায় স্থান ছিল না, এই গ্রামের আম আমড়া কুল বেল খাইয়া একদিন মানুষ হইয়া উঠিয়াছিলেন, যখন এ গ্রামের মাটি ছিল পৃথিবীর জীবনের একমাত্র নোঙর, ক্ষুদ্রের মধ্যেও সে পরিধি ছিল অসীম—সেসব দিনের কথা মনে হয়।

তারপর তিনি বিএ পাস করিলেন, এখানে আর থাকা চলিল না, বিদেশে চাকুরি লইতেহইল। কর্তারাও সব পরলোকে চলিয়া গেলেন—গ্রামের সঙ্গে সংযোগসূত্র ছিন্ন হইল। সন্ধ্যায়শিয়ালের ডাকে পিতৃপুরুষের ভিটা মুখরিত হইতে লাগিল। মধ্যে বার-দুই এখানে আসিয়াছেন—

সেও বছর পাঁচ-ছয় আগেকার কথা, আর আসা ঘটে নাই। পনেরো টাকা ভাড়ায় কলিকাতারগলিতে একখানা ঘরভাড়া করিয়া থাকা, বারান্দায় ছোট্ট এতটুকু রান্নাঘর, ধোঁয়া দিলে বাড়িতেটেকা দায়। এমন দুধ, টাটকা তরকারি চোখে দেখা যায় না। ক্ষেত্রবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবেন, কী হইলে আবার আসিয়া গ্রামে

বাস করিতে পারেন! পুরানো দিনের সুখ আবার ফিরিয়া আসে যদি, ক্ষেত্রবাবু তাঁহার জীবনের অনেকখানিই যে-কোন দেবতাকে দানপত্র করিয়া দিতে রাজী আছেন। ক্ষেত্রবাবু গ্রামের প্রজাদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন, গ্রামে থাকিলে তাঁহার সংসার চলিবার বন্দোবস্ত হয় কিনা! সকলেই উৎসাহ দিল, ধানের জমি আছে—তাহাতে বছরের ভাতের টানাটানি হইবে না—ক্ষেত্রবাবু গ্রামেই থাকুন।

একদিন নিভাননী বলিল, আর ক'দিন ছুটি আছে তোমার গো?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কেন?

—না, তাই বলছি।

দিন উনিশ কাটিয়াছে সবে, এখনও প্রায় এক মাস। সত্য কথা যদি স্বীকার করিতে হয়, ছুটিটা একটু বেশিই হইয়া গিয়াছে, এতদিন ছুটি না দিলেও চলিত।

নিভাননীর দিন আর কাটে না। এখানে সে কথা বলিবার মানুষ খুঁজিয়া পায় না, ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ভড়-গিন্নি আর তাহার মেয়ে সরলা। আর আছে কয়েকটি গোয়ালার মেয়ে। কোনোআমোদ নাই, আহ্লাদ নাই—বন-জঙ্গলের মধ্যে আর দিন কাটিতে চায় না। তাহার উপর উনি নাকি এখানে থাকিবার ব্যবস্থা করিতেছেন! এখানে মানুষ বারোমাস থাকিলে পাগল, নয় তো ভূত হইয়া যায়। বাড়ির পিছনে বাঁশবনের নীচেই মিনিট কয়েকের পথ দূরে শীর্ণকায় চূর্ণী নদী, টলটলে কাচের মতো জল—রোজ এই বাগানের ভিতর দিয়া স্নানে যাইবার সময় নিভাননীর ভয় হয়। উঁচু উঁচু আমগাছে পরগাছা ঝুলিতেছে, কালপ্যাঁচার গম্ভীর স্বরে দিনদুপুরেও বুকের মধ্যেকেমন করে! স্নান করিতে নামিয়া কিন্তু মনে বেশ আনন্দ হয়, এত জল এবং এমন কাকের চোখের মতো জল কলিকাতায় কল্পনাও করা যায় না।

বাঁশের চ্যালা পুড়াইয়া উনানে রান্না—কয়লা নাই, বাড়িতে জল নাই, নিভাননীর এসব অভ্যাস নাই। কলিকাতার রান্নাঘরের মধ্যেই কলের জলের পাইপ। এখানে মানুষ থাকে না। সময় যেখানে কাটিতে চাহে না, সে জায়গা আর যাহাই হউক, ভদ্রলোকের বাসের উপযুক্ত নয়।

ছেলেমেয়েদেরও এ জায়গা ভাল লাগে না। বড় ছেলে পাঁচু কেবল বলে, মা, কলকাতায় কবে যাওয়া হবে?

তাহাদের বাড়ির সামনে ছোট্ট পার্কটাতে প্রতি বৈকালে টুনু হাবু রণজিৎ হীরু, মঙ্গল সিংবলিয়া একটা শিখের ছেলে, সুরেশ ভানু কত ছেলে আসিয়া জোটে। পাঁচুর সঙ্গে উহাদেরসকলের খুব ভাব। পার্কে দোলনা টাঙানো আছে, গড়াইয়া পড়িবার লোহার ডোঙা খাটানো আছে, রোজ রোজ সেখানে কত কী খেলা, কত আমোদ-আহ্লাদ!

রণজিতের বাড়ি কাছেই—প্রসাদ বড়াল লেনে। পাঁচুর সঙ্গে রণজিতের খুব বন্ধুত্ব—প্রায়ই তাহার বন্ধুর বাড়ি পাঁচু যাইত, রণজিতের মা খাইতে দিতেন, তারপরে রণজিতের বোনসুসি আর হিমির সঙ্গে তাহারা দুইজনে বসিয়া ক্যারম খেলিত। সুসির অদ্ভুত টিপ, সরু সরু ফরসা আঙুল দিয়া স্ট্রাইকার ছটকাইয়া সামনের কাঠে রিবাউন্ড করাইয়া কেমন অদ্ভুত কৌশলে সে গুটি ফেলিত। পাঁচু সুসির গুণে মুগ্ধ। অমন অদ্ভুত মেয়ে সে যদি আর কোথাও দেখিয়াথাকে!

হারিয়া গেলে সুসি হাসিয়া বলে, পারলে না পাঁচু, এইবার লালখানা ফেলেও হেরে গেলে!

লাল ফেলিলে কী হইবে, পয়েন্ট হইল কই? বোর্ডে যখন সাতখানা গুটি মজুত, তখন ওদিকে সুসির হাতের গুণে স্ট্রাইকার অসম্ভব সম্ভব করিয়া তুলিতেছে পাঁচুর বিস্মিত ও মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে। দেখিতে দেখিতে বোর্ড ফাঁকা, প্রতিপক্ষ সব গুটি পকেটে ফেলিয়াছে।

কী মজার খেলা! কী মজার দিন!

এখানে ভাল লাগে না। কী আছে এখানে? কুমোরপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া গেঁয়োখেলা যত সব। কথা সব বাঙালে ধরনের, এখানে আর কিছুদিন থাকিলে পাঁচু বাঙাল হইয়াউঠিবে।

নিভাননী বলে, আজ পঁচিশ দিন হল, না?

ক্ষেত্রবাবু হাসিয়া বলেন, দিন গুনছ নাকি?

—ভাল লাগছে না আর, সত্যি!

—তা বটে। আমারও তেমন ভাল লাগছে না—বসে বসে আর দিনে ঘুমিয়ে শরীর নষ্টহল। একটা কথা বলবার লোক নেই, আছে ওই নন্দীমশায় আর জগহরি ঘোষ—ওরা ধানচালের দর নিয়ে কথাবার্তা বলে কেবল, কাঁহাতক ওদের সঙ্গে বসে গল্প করি?

—আর ক'দিন আছে তোমার?

তা এখনও আঠারো-উনিশ দিন—কি তারও বেশি।

নিভাননী বলিল, ছেলেমেয়েদেরও আর ভাল লাগছে না। কানু আমায় বলচে, মা আমরাকলকাতা যাব কবে?

ক্ষেত্রবাবুও নিজের মনের ভাব দেখিয়া নিজেই অবাক হইলেন। যে ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলের নাম শুনিলে গায়ের মধ্যে জ্বালা ধরে, চাকুরির সময় যাহাকে কারাগার বলিয়া বোধহইত, সেই স্কুলের কথা এখন যখন মনে হয় তখন যেন সে প্রশান্ত মহাসাগরের নারিকেল দ্বীপপুঞ্জ ঘেরা পাগো-পাগো দ্বীপ, চিরবসন্ত যেখানে বিরাজমান, পক্ষী-কাকলীতে যাহার শ্যাম তীরভূমি মুখর—ইংরেজি টকি-ছবিতে যা দেখিয়াছেন কতবার। সেই সিঁড়ির ঘর, তেতলার ছাদে মাস্টারদের সেই বিশ্রামকক্ষ, হেডমাস্টারের আপিসের ঘণ্টাধ্বনি, মথুরা চাকরেরসারকুলার-বই লইয়া ছুটাছুটি করিবার সেই সুপরিচিত দৃশ্য—এসব কল্পনার বিষয় হইয়াদাঁড়াইয়াছে। না, আর ভাল লাগে না, স্কুল খুলিলেই বাঁচা যায়!

নারাণবাবুর অবস্থা ইহা অপেক্ষাও খারাপ।

নারাণবাবু স্কুলের ঘরটিতে বারো মাস আছেন, কোথাও যাইবার স্থান নাই। সেই ঘর আশ্রয় করিয়া বহুদিন থাকিবার ফলে যখন টুইশানি সারিয়া নিজের ঘরটিতে ফেরেন, তখনসমস্ত মনপ্রাণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠে, বাড়ি এসে বাঁচা গেল। কত কালেরপিতৃপিতামহের বাসভূমি যেন সাহেবের বাথরুমের পূর্বদিকের সেই এক জানলা একদরজাওয়ালা কুঠুরিটা।

এ ছুটিতে নারাণবাবু গিয়াছিলেন তাঁহার এক দূরসম্পর্কের ভগ্নীর বাড়ি বরিশালে। চিরকাল কলিকাতায় কাটাইয়াছেন, বরিশালের পল্লীগ্রামে কিছুদিন থাকিয়াই তিনি হাঁপাইয়া উঠিলেন। গরিব স্কুল-মাস্টার হইলেও নাগরিক মনোবৃত্তি তাহার মজ্জাগত—সত্যিকার শহুরেমানুষ। এখানে সকলে উঠিয়া কেহ চা খায় না, লেখাপড়া-জানা মানুষ নাই। এক বাঙাল মোক্তারআছে, পঞ্চানন লাহিড়ী—বয়সে নারাণবাবুর সমান, গ্রামে সে-ই একমাত্র লেখাপড়া জানালোক। হইলে হইবে কী, লোকটির কথাবার্তায় বরিশালের টান তিনি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু সে গোঁড়া বৈষ্ণব, ধর্মবাতিকগ্রস্ত বৈষ্ণব।

তাহার কাছে গিয়া বসিতে হয়, উপায় নাই। সন্ধ্যাবেলাটা কোথায় কাটানো যায় আর!

অমনি সে আরম্ভ করিবে—গোপিনীদের ভাব সম্বন্ধে উদ্ধব দাস কী বলিতেছেন—এটাবলিয়া লই—

নারাণবাবুকে বাধ্য হইয়া শুনিতে বসিতে হয়। তিনি ধার্মিক লোক নন, যোগবাশিষ্ঠরামায়ণের দার্শনিক অংশ ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না তার। লেসলি স্টিফেন এবং মিলের ছাত্র তিনি। পঞ্চানন মোক্তার কথা বলিতে বলিতে যখন দুই হাত তুলিয়া 'আহা আহা' বলে, তখন নারাণবাবু ভাবেন, এই একটা নিতান্ত অজ-মুখের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা গেল দেখচি!

মনে হয় শরৎ সান্যালের কথা। শরৎ সান্যাল অবসরপ্রাপ্ত এঞ্জিনীয়ার, নারাণবাবুর বহুদিনের বন্ধু—পাশের গলিতে এক সময় বড় বাড়ি ছিল, ছেলেরা রেস খেলিয়া বাড়ি উড়াইয়া দিয়াছে, এখন দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডে ছোট ভাড়াটে বাড়িতে বাস করেন, ছুটিছাটার দিনে সন্ধ্যার দিকে ধোপ-দোরস্ত পাঞ্জাবি গায়ে, ছড়ি হাতে প্রায়ই নারাণবাবুর ঘরে আসিয়া বসেনও নানাবিধ উঁচু ধরনের কথাবার্তা বলেন।

উঁচু ধরনের কথা নারাণবাবু পছন্দ করেন, গোপীভাবের কথা নয়।

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, ওয়াশিংটন-চুক্তির ভিতরের রহস্য, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের বক্তৃতা, শিক্ষাসমস্যা সংক্রান্ত কথা প্রভৃতি আলোচনাকেই নারাণবাবু উচ্চ বিষয় বলিয়া থাকেন। বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত লোকে রাসলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লইয়া মাথা ঘামায়না।

পঞ্চাননবাবু নিজে ইংরেজি-শিক্ষিত নহেন, সেকালের ছাত্রবৃত্তি-পাস মোক্তার, সুতরাংইংরেজি শিক্ষার উপর হাড়ে চটা। পশ্চিম হইতে যাহা কিছু আসিয়াছে সব খারাপ, এদেশে যাহাছিল সব ভাল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের (পঞ্চানন মোক্তার বলেন, কবিরাজ গোস্বামী) চৈতন্য চরিতামৃত তাহার মতে বাংলা সাহিত্যের শেষ ভাল গ্রন্থ।

পঞ্চানন মোক্তার গদগদ কণ্ঠে বলেন,, কী সব ইংরিজি বলেন আপনারা বুঝি না! কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর পর আর বই হয় না, বাংলায় আর বই নাই, লেখা হয় নাই তার পরে—

এ রকম লোকের সঙ্গে লেসলি স্টিফেন ও মিলের ছাত্র নারাণবাবু কী তর্ক করিবেন!

জীবনে তিনি একজন খাঁটি দার্শনিক দেখিয়াছিলেন—অনুকূলবাবু। নিজের জন্য কখনওকিছু করেন নাই, স্কুল গড়িয়া তুলিবেন মনের মতো করিয়া, ভাল শিক্ষা দিবেন তাহার স্কুলে, কলিকাতার মধ্যে একটি আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত করবেন স্কুলকে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার যত কল্পনা, যত আলোচনা—কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছেন স্কুলের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া! অমন সাধুপুরুষ জন্মায় না।

এই সব তিলক-কণ্ঠীধারী গোপীভাবে বিভোর লোকের মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিত্বের তুলনায় অনুকূলবাবু একটা পুরা মানুষ। আর এই সাহেবটাও মন্দ নয়, অনুকূলবাবুর মতো এও স্কুলবলিতে পাগল। স্কুলের স্বার্থ, ছাত্রদের স্বার্থ সবচেয়ে বড় ওঁর কাছে। তবে অনুকুলবাবু ছিলেনখাঁটি স্টোইক আর সাহেব এপিকিউরিয়ান—এই যা তফাত।

যা হোক, নারাণবাবুর ভাল লাগে না—পঞ্চানন মোক্তারকে না, বরিশালের এ পাড়াগাঁ না। পঞ্চানন ছাড়া গ্রামে আরও অনেক মানুষ আছে বটে, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে নারাণবাবুর খাপখায় না। নারাণবাবু ভাবেন, তাহারা ছেলেছোকরা, তাহাদের সঙ্গে কী মিশিবেন! তা ছাড়াযাচিয়া তিনি কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন না। কলিকাতার লোক, একটু লাজুক ধরনেরওআছেন।

একদিন গ্রামের বাঁশবনে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে খুব বর্ষা নামিয়া বাঁশঝাড়ের রঙ কালোদেখাইতেছে। চারিদিক মেঘে ঘিরিয়াছে গ্রামখানিকে, টারাসাদের ঘন জঙ্গলে বৃষ্টির ধারার শব্দ।গ্রামে এক জায়গায় গান-বাজনার মজলিস হইবে, খুব আগ্রহ লইয়া নারাণবাবু সেখানে গিয়া দেখিলেন—পঞ্চানন মোক্তার, দীনবন্ধু স্যাকরা গলায় ত্রিকণ্ঠী তুলসীর মালা ঝুলাইয়া মজলিস জুড়িয়া বসিয়া। আরও অনেক উহাদের শিষ্য-প্রশিষ্য বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে কীর্তন শুরুহইল, নারাণবাবু চলিয়া আসিলেন—তাহার ভাল লাগে না।

কীর্তন কেন তাঁহার ভাল লাগে না, ইহা লইয়া পঞ্চানন মোক্তারের সঙ্গে তর্ক করিয়াএকদিন তিনি হার মানিয়াছেন। পঞ্চানন মোক্তার বলে, কীর্তন বাংলার নিজস্ব জিনিস, সঙ্গীতেবাংলার প্রধান দান—এমন মধুর রসের জিনিস যে উপভোগ করিতে না শিখিল, তারশ্রবণেন্দ্রিয়ই মিথ্যা।

নারাণবাবু বলেন, তিনি বোঝেন না, তাঁহার ভাল লাগে না—মিটিয়া গেল। যে ভাল অততর্ক করিয়া বুঝাইতে হয়, তাহার মধ্যে তিনি নাই। 'বাংলাদেশের দান, বাংলাদেশের দান' বলিয়া চেঁচাইলে কী হইবে! বাংলাদেশ, বাংলাদেশ—তিনি নিজে নিজে। ইহার চেয়ে কথা আছে? মিটিয়া গেল।

সেদিন সেখান হইতে বাহির হইয়া পল্লীগ্রামের উপর বিতৃষ্ণা ধরিয়া গেল নারাণবাবুর। কী বিশ্রী জায়গা এ সব, বৃষ্টির পরে বাঁশবনের চেহারা দেখিলে মনে হয়, কোথায় যেন পড়িয়াআছেন। এমন জায়গায় কি মানুষ থাকে! কলিকাতার ফুটপাথে কোথাও এতটুকু ধুলাকাদা নাই—কী বিশাল জনস্রোত ছুটিয়াছে নিজের নিজের কাজে, সুইচ টিপিলেই আলো, কল টিপিলেই জল। সন্ধ্যার সময় যখন চারিদিকে বাড়িতে আলো জ্বলিয়া ওঠে, 'বঙ্গবাণী' প্রেসে ফ্ল্যাট মেশিনের শব্দ হয়, ওয়েলেসলি স্ট্রীট দিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া ট্রাম চলে, তখন এক অদ্ভুত রহস্যের ভাবে মন পূর্ণহইয়া যায়; মনে হয়, চিরজীবন এ কর্মব্যস্ত জনস্রোতের মধ্যে কাটাইলেও ক্লান্তি আসে না, প্রাণনবীন হয়, এতটুকু সময়ের জন্য অবসাদ আসে না মনে।

এখান হইতে চলিয়া যাইতেন, কিন্তু ভাগ্নী যাইতে দেয় না, জোর করিয়াও যাইতে মনসরে না।

জ্যোতির্বিনোদ মহাশয়ও বাড়ি গিয়া খুব শান্তিতে নাই। তাহার বাড়ি নোয়াখালি জেলায়।তিন বৎসরে এই একবার বাড়ি আসেন, বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র সবাই আছে। দুই-তিন ভাই, খুব বড়পরিবার—এমন কিছু বেশি মাহিনা পান না, যাহাতে স্ত্রী-পুত্র লইয়া কলিকাতায় থাকিতে পারেন। বাড়িতে আসিয়াই জ্যোতির্বিনোদ এবার এক মোকদ্দমায় পড়িয়া গেলেন, জমিজমা সংক্রান্তশরিকি মোকদ্দমা। তাহার পর হইল বড় ছেলেটির টাইফয়েড, সতেরো দিন ভুগিয়া এবং পয়সা খরচ করাইয়া ঠেলিয়া উঠিল তো স্ত্রী পা পিছলাইয়া হাঁটু ভাঙিয়া শয্যাগত হইয়া পড়িল।

এই রকম নানা মুশকিলে জ্যোতির্বিনোদ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। এদিকে কলিকাতায় থাকিলে লোকের হাত দেখিয়া, ঠিকুজি কুষ্ঠি তৈরি করিয়া কিছু কিছু উপার্জনও হয়। এখানে সেউপার্জন নাই, শুধু খরচ আর খরচ।

কলিকাতায় একরকম থাকেন ভাল, একা ঘরে একা থাকেন, কোনো গোলমাল নাই। সাহেবের দাপট সহ্য করিয়া থাকিতে পারিলে আর কোনো হাঙ্গামা নাই। নিজে যা-খুশি দুইটি রান্না করিলেন, অভাব অভিযোগ হইলে নারাণবাবুর কাছে টাকাটা সিকিটা ধার করিয়া দিন চলিয়া যায়। বাড়ির এত ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয় না। যে চিরকাল একা কাটাইয়া আসিয়াছে, তাহার পক্ষে এসব বড় বোঝা বলিয়া মনে হয়।

ছুটি ফুরাইলে যেন বাঁচা যায়।

যদুবাবু ছিলেন কলিকাতায়, একটা মাত্র টুইশানি সন্ধ্যার সময়—অন্য অন্য টুইশানির ছাত্রকলিকাতার বাহিরে গিয়াছে। দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া বেলা পাঁচটার সময় চা খাইয়া তিনি টুইশানিতে যান। সময় কাটাইবার ওই একমাত্র উপায়। পথে এক কবিরাজ-বন্ধুর ওখানে বসিয়াকিছুক্ষণ গল্প-গুজব করেন। স্কুল-মাস্টারদের জগৎ সংকীর্ণ, বৃহত্তর কলিকাতা শহরে চেনেনকেবল টুইশানির ছাত্র ও তাহাদের অভিভাবকদের, কিংবা স্কুল কমিটির দু-একজন উকিল কিংবা ডাক্তারকে। তাঁহাদের বাড়িতেও মাঝে মাঝে যদুবাবু গিয়া থাকেন, কমিটির মেম্বারদের তোয়াজকরা ভাল—কী জানি, কখন কী ঘটে!

একঘেয়ে ভাবে সময় আর কাটিতে চায় না, দিবানিদ্রার অভ্যাস ক্রমশ পাকা হইয়া আসিতেছে। স্কুল-বাড়ির সামনে দিয়া আসিবার সময় চাহিয়া দেখেন সাহেবের ঘরে আলো জ্বলিতেছে কি না। সাহেব দার্জিলিং বেড়াইতে গিয়াছে মেম সিবসনকে লইয়া—ছুটি ফুরাইবারআগের দিন বোধ হয় ফিরিবে।

অবশেষে দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ ফুরাইল। সব মাস্টার একত্র হইলেন।

যদুবাবু বলিলেন, এই যে জ্যোতির্বিনোদ মশায়, নমস্কার! বেশ ভাল ছিলেন ? কবেএলেন?

হেডপণ্ডিত যদুবাবুর সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া বলিলেন, ভাল যদু? এখানেই ছিলে?

সকলে মিলিয়া বৃদ্ধ নারাণবাবুর পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিলেন। নারাণবাবুর স্বাস্থ্য ভাল হইয়া গিয়াছে। যেখানে গিয়াছিলেন, সেখানে দুধ ঘি মাছ মাংস সস্তা, খাওয়া-দাওয়া এখানকার চেয়ে ভাল অনেক, এখানে হাত পুড়াইয়া ভাতে-ভাত রাঁধিয়া খাইয়া থাকিতে হয়। এ বয়সে সেবাযত্ন পাওয়া আবশ্যক—সকলে এসব কথা বলিয়া নারাণবাবুকে আপ্যায়িত করিল।

মাস্টারদের মধ্যে পরস্পর প্রীতি ও আত্মীয়তার বন্ধন স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে দীর্ঘদিন পরস্পর অদর্শনের পর হিংসা বা মনোমালিন্যের চিহ্নও নাই। এমন কি মি. আলমকে দেখিয়াও যেন সকলে খুশি হইল।

হেডমাস্টার বলিলেন, ওয়েলকাম জেন্টলমেন। আশা করি, আপনারা সব ভাল ছিলেন।এবার হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষা সামনে, সকলে তৈরি হোন, প্রশ্নপত্র তৈরি করুন। আজই সারকুলারবার হবে।

আলম নিজের দেশ হইতে হেডমাস্টারের জন্য প্রায় দুই ডজন মুর্গির ডিম একটা টিনেরকৌটা ভরিয়া আনিয়াছে। সিবসন ডিম পাইয়া খুব খুশি।

—ওঃ, মি. আলম, ইট ইজ সো গুড অফ ইউ! সাচ নাইস্ এগস্ অ্যান্ড সো ফ্রেশ!

কিন্তু পরক্ষণেই সাহেব ও মেম দুইজনকেই আশ্চর্য করিয়া মি. আলম কাগজ-জড়ানো কীএকটা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

মেম বলিল, কী ওটা?

সাহেব বলিয়া উঠিলেন, গুড হেভেনস! সিওরলি দ্যাট ইজ নট এ শোলডার অফ মাটন?

মি. আলম মৃদু হাসিয়া বলিল, ইয়েস স্যার, ইট ইজ স্যার। এ লিটল শোলডার অফমাটন—ফ্রম মাই হোম স্যার।

বিস্মিত ও আনন্দিত মিস্ সিবসন্ বলিল, থ্যাঙ্কস্ অ-ফুলি মি. আলম!

যদুবাবু টিচারদের ঘরে আড়ালে বলিলেন, ঢের ঢের খোশামুদে দেখেছি বাবা, কিন্তু এদেখছি সকলের উপর টেক্কা দিলে—আবার বাড়ি থেকে বয়ে ভেড়ার দাপনা এনেচে!

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, বাড়ি থেকে না ছাই! আপনিও যেমন! ওর বাড়িতে একেবারে দলেদলে ভেড়া চরচে! ক্ষেপেছেন আপনি? ওসব চাল-দেখানো আমরা বুঝিনে? মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে কিনে এনেছে মশাই!

ছেলেরা ক্লাসে ক্লাসে প্রণাম করিল মাস্টারদের। আজ বেশি পড়াশুনা নাই, সকাল সকালছুটি হইয়া গেলে সকলে মিলিয়া পুরানো চায়ের দোকানে চা পান করিতে গেলেন। দোকানী তাঁহাদের দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল : আসুন বাবুরা, আসুন—ভাল ছিলেন সব? আজ স্কুল খুলল বুঝি? ওরে, বাবুদের চা দে! আবার সেই পুরানো ঘরে বসিয়া বহুদিন পরে পুরানো সঙ্গীদেরসঙ্গে চা-পান। সকলেরই খুব ভাল লাগে।

যদুবাবু বলেন, নারাণদা, গল্প করুন সে দেশের!

—আরে রামো, সে আবার দেশ! মোটে মন টেকে না। দুধ ঘি খেতে পেলেই কি হল!মানুষের মন নিয়ে হল ব্যাপার—মন যেখানে টেকে না, সে দেশ আবার দেশ!

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, যা বলেচেন দাদা! গেলাম পৈতৃক বাড়িতে, ভাবলাম, অনেক দিনপরে এলাম, বেশ থাকব। কিন্তু মশাই, দু দিন যেতে-না-যেতে দেখি আর সেখানে মন টিকচেনা।

—কলকাতার মতন জায়গা আর কোথাও নেই রে ভাই।

—খুব সত্যি কথা।

—মানুষের মুখ যেখানে দেখা যায়, দুটো বন্ধুর সঙ্গে গল্প করে সুখ যেখানে, খাই না-খাই।সেখানে পড়েথাকি।

নারাণবাবু অনেকদিন পরে চুনিদের বাড়ি পড়াইতে গেলেন।

চুনিরা দেওঘর না কোথায় গিয়াছিল, বেশ মোটাসোটা হইয়া ফিরিয়াছে। অনেকদিন পরেচুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে নারাণবাবু বড় আনন্দ পাইলেন।

চুনি আসিয়া প্রণাম করিল। নারাণবাবু প্রথম দিনটা তাহাকে পড়াইলেন না, বরিশালে যে গ্রামে গিয়াছিলেন, সে গ্রামের গল্প করিলেন, পঞ্চানন মোক্তারের কথা বলিলেন। চুনি তাঁহার কাছে দেওঘরের গল্প করিল।

নারাণবাবু বলিলেন, পান্না কোথায় রে?

—সে স্যার, মাসিমার বাড়ি গিয়েছে কালীঘাটে, কাল আসবে। মাসিমার বড় ছেলের পৈতে কিনা!

—তুই যাসনি যে?

—স্যার, আজ প্রথম দিনটা—আপনি আসবেন, রাত্রে যাব।

উত্তর শুনিয়া নারাণবাবু আহ্লাদে আটখানা হইয়া গেলেন। নিজের ছেলেপিলে নাই, পরের ছেলেকে মানুষ করা, তাহাদের নিজের সন্তানের মতো দেখিয়া অপত্যস্নেহের ক্ষুধা নিবারণ করা যাহাদের অদৃষ্টলিপি—তাহাদের এ-রকম উত্তরে খুশি হইবার কথা। চুনি বসিল, চা খাবেন স্যার? আনি—

নারাণবাবু ভাবেন—নিজের নাই, তাতে কী? আমার ছেলেমেয়ে এই ওয়েলেসলি অঞ্চলেসর্বত্র ছড়ানো—আমার ভাবনা কী? একটা করে টাকা যদি দেয় প্রত্যেকে, বুড়ো বয়সে আমারভাবনা কী?

—স্যার, আজ পড়ব না।

—বেশ, গল্প শোনো—এই বরিশালের গাঁয়ে—

—না স্যার, একটা ভূতের গল্প করুন।

ভূত-টুত সব মিথ্যে। ওসব নিয়ে মাথা ঘামাসনে ছেলেবেলা থেকে।

—কিন্তু স্যার, কুণ্ডাতে একটা বাড়ি আছে—

—কোথায় ?

কুণ্ডা—দেওঘরের কাছে স্যার। সেখানে একটা বাড়িতে ভূতের উপদ্রব বলে কেউভাড়া নেয় না। সত্যি, আমরা জানি স্যার!

নারাণবাবু আর এক সমস্যায় পড়িলেন। মিথ্যা ভয় এক বালকের মন হইতে কী করিয়া তাড়ানো যায় ? নানা কুসংস্কার বালকদের মনে শিকড় গাড়িবার সুযোগ পায় শুধু অভিভাবকদের দোষে। তিনি শিক্ষক, তাহার কর্তব্য, বালকদের মন হইতে সে সমস্ত কুসংস্কার উচ্ছেদ করা।

নারাণবাবু নিজের নোট-বইয়ে লিখিয়া লইলেন। সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করা আবশ্যক, এ বিষয়ে কী করা যায়!

চুনির মা আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন, বলি ও দিদি, মাস্টারকে বোলো না—ছেলে যে মোটে বই হাতে করতে চায় না!

(দেওঘরে গিয়ে বেড়িয়ে আর খেলে বেড়াবে—তার কী করবেন উনি?)

নারাণবাবু বলিলেন, বউমা, চুনি ছেলেমানুষ একদিনে দু’দিনে ও স্বভাব ওর যাবে না। আমি ওকে বিশেষ স্নেহ করি, সেদিকে আমার যথেষ্ট নজর আছে, আপনি ভাববেন না।

চুনির মা বলিলেন, ও দিদি, বলো যে, পরীক্ষা সামনে আসছে, চুনিকে দু বেলা পড়াতে হবে। এক মাস দেড় মাস তো বসিয়ে মাইনে দিয়েছি। এখন মাস্টার যেন দু-বেলা আসে।

নারাণবাবু মেয়েমানুষের কাছে কী প্রতিবাদ করিবেন ? ন্যায্য পড়াইয়া এখানে মাহিনা আদায় করিতে গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়, ছুটির মাস বসাইয়া কে তাহাকে মাহিনা দিল? ছুটির আগের মাসের মাহিনা এখনও বাকি!

মুখে বলিলেন, বউমা, সকালে আজকাল সময় বেশি পাওয়া যায় না। আমারও নিজের একটু কাজ আছে। আচ্ছা, তা বরং দেখব—

—দেখাদেখি চলবে না বলে দাও দিদি। আসতেই হবে—না পারেন, আমরা অন্য মাস্টাররাখব। ওই তো সেদিন পাশের মেসের ছেলে তিনটে পাসের পড়া পড়ছে—বলছিল, আমায় দশ টাকা দেবেন, দু বেলা পড়াব।

এই সময় চুনি মাকে ধমক দিয়া বলিল, যাও না এখান থেকে, তোমায় আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিকনেস কাটতে হবে না!

নারাণবাবু বলিলেন, ছিঃ, মাকে অমন কথা বলতে আছে?

মনে মনে কিন্তু খুশি হইলেন।

চুনি বলিল, স্যার, আপনি মার কথা শুনবেন না। দু বেলা আপনি পড়ালেও আমি পড়বনা। আমার দু বেলা পড়তে ইচ্ছে করে না।

নারাণবাবুর আনন্দ অনেকখানি উবিয়া গেল। তাহার অসুবিধা দেখিয়া তাহা হইলে চুনিকথা বলে নাই, সে দেখিয়াছে নিজের সুবিধা! পাছে নারাণবাবু স্বীকার করিলে দুই বেলা পড়িতে হয়, তাই মাকে ধমক দিয়াছে হয়তো।

বাড়িতে ফিরিয়া দেখিলেন, তাহার এঞ্জিনীয়ার-বন্ধুটি তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

—কী নারাণবাবু, কবে ফিরলেন? —আজ দিন-তিনেক। ভাল সব? বসুন, বসুন শরৎবাবু।

মনের মতন সঙ্গী পাইয়াছেন তিনি। উঃ, কোথায় বরিশালের অজ-পাড়াগাঁয়ের পঞ্চানন মোক্তার, আর কোথায় তাহার এই বন্ধু শরৎ সান্যাল!

দুইজনে যেমন একত্র হইয়াছেন, অমনি উঁচু বিষয়ের আলোচনা শুরু। এই জন্যইকলিকাতা এত ভাল লাগে। এ সব লইয়া কথা বলিবার লোক কি বাংলাদেশের অজ-পাড়াগাঁয়েমিলিবে?

নারাণবাবুর বন্ধু বলিলেন, ভাল কথা দাদা, আপনাকে দেখাব বলে রেখে দিয়েছি!

—কী ?

—'রিডার্স ডাইজেস্ট'-এ একটা আর্টিকল্ বেরিয়েছে বর্তমান চায়নার ব্যাপার নিয়ে। কালএনে দেখাব।

—আচ্ছা, কাল আনবেন। কিন্তু আমার ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণে আছে তো ওয়াশিংটন-চুক্তিসম্বন্ধে?

—আপনার ও-কথা টেকে না। রামানন্দবাবুর মন্তব্য পড়ে দেখবেন এ মাসের 'মডার্নরিভিউ'-এ।

—আলবাত টেকে। আমি কারও কথা মানিনে।

এ কথা নারাণবাবু বলিলেন একটা খাঁটি ইনটেলেকচুয়াল আলোচনা জমাইয়া তুলিবারজন্য। তর্ক না হইলে আলোচনা জমে না।

কলিকাতা না হইলে এমন মনের খোরাক কোথায় জোটে?

দুই বন্ধুতে মিলিয়া মনের খেদ মিটাইয়া রাত এগারোটা পর্যন্ত ইনটেলেকচুয়াল আলোচনা চলিল। দুইজনেই সমান তার্কিক। কোনো কথারই মীমাংসা হইল না। তা না হউক, মীমাংসারজন্য কেহ তর্ক করে না, তর্কের খাতিরেই তর্ক করিতে হয়। আফিমের নেশার মতো তর্কের নেশাও একবার পাইয়া বসিলে আর ছাড়তে চায় না।

নারাণবাবু বলিলেন, আজ একটু যোগবাশিষ্ঠ পড়া হল না!

—তা বেশ তো, পড়ুন না। আরও রাত হোক।

অনেক রাত্রে নারাণবাবুর বন্ধু রায় বাহাদুর শরৎ সান্যাল বিদায় গ্রহণ করিলে নারাণরাবুরান্না চড়াইলেন। মনে এত আনন্দ, ও-বেলার বাসি পুঁটিমাছ-ভাজা ছিল, তাই দিয়া ঝোলচড়াইলেন আর ভাত—আর কিছু না। মনের আনন্দই মানুষকে তাজা রাখে, খাইয়া মানুষ বাঁচে না শুধু।

খাওয়া শেষ হইলে সাহেবের ঘরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, সাহেবের টেবিলেআলো জ্বলিতেছে, অত রাত্রে সাহেব লেখাপড়া করিতেছেন নাকি? নারাণবাবুর ইচ্ছা হইল, ঘরেঢুকিয়া দেখেন সাহেব কী পড়িতেছেন!

সাহেব বলিলেন, কাম ইন!

নারাণবাবু বিনীত হাস্যের সহিত ঘরে ঢুকিলেন।

—ইয়েস?

—না, এমনি দেখতে এলাম, আপনি কী পড়ছেন?

—আমি আপিসের কাজ করছিলাম। বোসো।

—স্যার, কলকাতার মতো জায়গা নেই।

—আমাদের মতো লোক অন্য জায়গায় গিয়ে থাকতে পারে না। আমার এক ভাইচায়নাতে আছে—মিশনারি। ক্যান্টন থেকে নদীপথে যেতে হয়—অনেক দূর। আগে সে ব্রিটিশ গানবোটে মেডিক্যাল অফিসার ছিল, এখন মিশনারি হয়েছে। সে কিন্তু চীনদেশের একটা অজ পাড়াগাঁয়ে মিশনে থাকে। আমি একবার গিয়েছিলাম সেখানে, গিয়ে আমার মন হাঁপিয়ে উঠল।

—আমিও স্যার বরিশালে গিয়েছিলাম ছুটিতে, আমারও মন টেকেনি।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, স্কুলটাকে আরও ভাল করতে হবে স্যার।

—আমিও তাই ভাবছি। একটা বিজ্ঞাপন দেব কাগজে, আরও ছেলে হোক।

দুজনে বসিয়া স্কুলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হইল।নারাণবাবু বিদায় লইয়া শয়নের জন্য গেলেন।

শ্রাবণ মাসের দিকে স্কুলের কাজ ভয়ানক বাড়িল।

এই সময় একজন নতুন মাস্টার স্কুলে নেওয়া হইল—বেশী বয়স নয়, ত্রিশের মধ্যে।লোকটি কবিতা লেখে, বড় বড় কথা বলে, অবস্থাও বোধ হয় ভাল। কারণ সাধারণ স্কুলমাস্টারদের অপেক্ষা ভাল সাজগোজ করিয়া স্কুলে আসে, বেশির ভাগ সময় আপনমনে বসিয়া থাকে, কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। ফট-ফট করিয়া ইংরেজি বলে যখন-তখন।নাম—রামেন্দুভূষণ দত্তগুপ্ত, বাড়ি—নৈহাটির কাছে কী একটা জায়গায়।

যদুবাবু চায়ের দোকানে বলিলেন, ওহে, এ নবাবটি কে এল হে? নরলোকের সঙ্গেবাক্যালাপ করে না যে!

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, করার উপযুক্ত মনে করলেই করবে।

নারাণবাবু চুপ করিয়া ছিলেন। যদুবাবু বলিলেন, কী দাদা? চুপ করে আছেন যে?

—কী বলি বলো? কী রকম লোক, কিছু জানিনে তো।

—কী রকম বলে মনে হয়? বেজায় গুমুরে?

—তা হতে পারে। তবে ছেলেমানুষ, শাইও হতে পারে।

—শাই, না, ছাই! কারও সঙ্গে কথা বলে না, টিচারস রুমে একলাটি বসে কী যেন ভাবে!

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, লোকাট কবি, তাই বোধহয় আপনমনে ভাবে—

যদুবাবু কাহারও প্রশংসা সহ্য করিতে পারেন না, তিনি বলিলেন, হ্যাঁঃ কবি—একেবারেরবি ঠাকুর! ডেঁপো কোথাকার!

সেদিন টিফিনের পর কিছুক্ষণ ক্লাসে নূতন শিক্ষক নাই। দশ মিনিট কাটিয়া গেল, তখনওতাহার দেখা নাই।

হেডমাস্টার কটমট দৃষ্টিতে ক্লাসের শূন্য চেয়ারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কার ক্লাস?

মনিটার দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, নিউ টিচার স্যার!হেডমাস্টার চলিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে নতুন মাস্টার আসিয়া বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মথুরা চাকর আসিয়া একটাস্লিপ দিল তাহার হাতে, হেডমাস্টার আপিসে ডাকিয়াছেন।

নতুন মাস্টার উঠিয়া আপিসে গেলেন।

—আমাকে ডেকেছেন স্যার?

—হ্যাঁ। আপনি ক্লাসে ছিলেন না?

—আমি ক্লাস থেকেই আসছি।

দশ মিনিট পর্যন্ত আপনি ক্লাসে ছিলেন না।

—আমি দুঃখিত। চা খেতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে গেল।

—কোথায় চা খেতে গিয়েছিলেন? আমায় না বলে বাইরে যাবেন না।

—কেন স্যার?

হেডমাস্টার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নতুন মাস্টারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমার স্কুলেরনিয়ম।

নতুন মাস্টার কিছু না বলিয়া ক্লাসে গিয়া পড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার হেডমাস্টারের আপিসে আসিয়া বলিলেন, স্যার, একটা কথা—

—কী?

—আমি স্কুলের একজন টিচার, ছাত্র নই—হেডমাস্টারের কাছে অনুমতি নিয়ে স্কুলেরফটকের বাইরে যেতে হয় ছাত্রদের, টিচারদের নয়। আমার দেরি হয়েছিল ফিরতে, সেজন্য আমিদুঃখিত। কিন্তু আপনাকে না বলে যাওয়ার জন্যে আপনি অনুযোগ করলেন, এটা ঠিক করেছেন বলে মনে করি না।

হেডমাস্টারের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে নতুন টিচার গটগট করিয়া ক্লাসে চলিয়া গেলেন।দোর্দণ্ডপ্রতাপ ক্লার্কওয়েল তো অবাক, তাঁহার অধীনস্থ কোনো মাস্টার যে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াএ কথা বলিতে পারে, তাহা তাহার কল্পনার অতীত। তিনি তখনই মি. আলমকে ডাকিলেন।

—ইয়েস স্যার!

—নতুন টিচার বেশ ভাল পড়ায়?

—জানি না স্যার। বলেন তো দৃষ্টি রাখি।

—রাখো।

—কী রকম একটু অসামাজিক ধরনের—

—শুনলাম নাকি, কবি। বাংলা কবিতা পড়ো তোমরা—পড়েছ কী রকম কবিতা লেখে?

মি. আলম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত কড়িকাঠের দিকে উঠাইয়া থিয়েটারি ভঙ্গি করিলেন।তারপর সুর নীচু করিয়া বলিলেন, কিসের কবি! বাংলাদেশে সবাই কবিতা লেখে আজকাল।কবি!

—তুমি বাংলা কবিতা পড়ো মি. আলম ?

—পড়ি বইকি স্যার!

আলমের একথা সত্য নয়, বাংলা সাহিত্যের কোনো খবর কোনোদিনও তিনি রাখেন না।

মি. আলমের সঙ্গে একদিন নতুন মাস্টারের ঠোকাঠুকি বাধিল।

ব্যাপারটা খুব সামান্য বিষয় অবলম্বন করিয়া। ক্লাসে কী একটা পরীক্ষার কাগজে নতুনমাস্টার নম্বর দিয়া ছেলেদের নিকট ফেরত দিয়াছেন। মি. আলম সে ক্লাসে পড়াইতে গিয়াসামনের বেঞ্চির উপর একটি ছেলের পরীক্ষার খাতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের খাতারে?

ছেলেটি বলিল, এবারকার উইক্‌লি এক্সারসাইজের খাতা স্যার, নতুন স্যার দেখে ফেরতদিয়েছেন।

কী সাবজেক্ট?

—হিস্ট্রি।

—দেখি খাতাখানা!

মি. আলম খাতাখানা লইয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া বলিলেন, নম্বর দেওয়া সুবিধে হয়নি।

—কেন স্যার?

—এর নাম কি মার্ক দেওয়া! এ আনাড়ির মার্ক দেওয়া। এই খাতায় তুমি ষাট নম্বর কখনও পাও না—আমার হাতে চল্লিশের বেশি নম্বর উঠত না।

নতুন টিচারের কাছে ছেলেরা অন্যভাবে ঘুরাইয়া বলিল, স্যার, আপনার হাতে বড় নম্বর ওঠে।

—কেন রে?

—স্যার, ওই সতীশকে ষাট দিয়েছেন, ও চল্লিশের বেশি পায় না!

—কে বলেছে তোকে?

—মি. আলম বলে গেলেন স্যার।

—কী বললেন?

—বললেন, এ আনাড়ির মার্ক দেওয়া হয়েছে।

নতুন টিচার তখনই গিয়া হেডমাস্টারের আপিসে মি. আলমকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। হেডমাস্টার নাই, ক্লাসে পড়াইতে গিয়াছেন। বলিলেন, আপনার সঙ্গে একটা কথা—একমিনিট—

—কী, বলুন?

—আপনি কি ফোর্থ ক্লাসে আমার খাতা দেখা সম্বন্ধে কিছু বলেছিলেন ?

—কেন বলুন তো?

—না, তাই বলছি। ছেলেরা বলছিল, আপনি খাতা দেখে বলেছেন যে খাতা ভাল দেখাহয়নি!

—হ্যাঁ—তা—না—সে কথা ঠিক না—তবে হ্যাঁ, একটু বেশি নম্বর বলেই আমার মনেহল কিনা—

—খুব ভাল কথা। আপনি অভিজ্ঞ টিচার, আমার ভুল ধরবার সম্পূর্ণ অধিকারী। আমায়দয়া করে যদি খাতা দেখাটা সম্বন্ধে একটু বলে-টলে দেন—আমার অনেক ভুল সংশোধন হতেপারে। আমরা আনাড়ি কিনা আবার এ বিষয়ে !

আলমের মুখ লাল হইয়া উঠিল। বলিলেন, তা আমার যা মনে হয়েছে, তাই বলেছি। আপনার নম্বর দেওয়াটা একটু বেশি বলেই মনে হয়েছিল।

—আমি মোটেই তার প্রতিবাদ করছি না। আমি কেবল বলতে চাই, ক্লাসে ছেলেদেরসামনে মন্তব্য না করে আমাকে আড়ালে ডেকে বললেই ভাল হত।

ন্যায্য কথা। এ কথার উপর কোনো কথা চলে না। মি. আলমের চুপ করিয়া থাকা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে হেডমাস্টারকে একা পাইয়া মি. আলম সাতখানা করিয়া তাহার কাছে লাগাইলেন, নতুন টিচারকে খাতা দেখতে দেবেন না স্যার!

—নতুন টিচারকে? কেন মি. আলম?

—উনি খাতা মনোযোগ দিয়ে দেখেন না।

—দেখেছিলে নাকি কোনো খাতা?

—হ্যাঁ স্যার। ফোর্থ ক্লাসের সতীশকে উনি ষাট নম্বর দিয়েছেন যে খাতায়, তাতে চল্লিশের বেশি নম্বর ওঠে না। ভুল কাটেনওনি সব জায়গায়।

এই কথাটার মধ্যে মুশকিল আছে। সব ভুল নিখুঁতভাবে কাটিয়া কোনো মাস্টারই খাতা দেখেন না—স্বয়ং মি. আলমও না। এখানে মি. আলম নতুন টিচারের উপর বেশ এক চালচালিলেন। হেডমাস্টার খাতা চাহিয়া পাঠাইয়া সত্যই দেখিলেন, প্রত্যেক পাতায় এক-আধটা ভুলরহিয়া গিয়াছে, যাহা কাটা হয় নাই। নতুন মাস্টারের ডাক পড়িল ছুটির পর।

হেডমাস্টার বলিলেন, ফোর্থ ক্লাসের হিস্ট্রির খাতা দেখেছিলেন আপনি?

—হ্যাঁ স্যার।

—খাতা ভাল করে দেখেননি তো! সব ভুলে লাল দাগ দেননি !

—বেশির ভাগ দিয়েছি স্যার। দুএকটা ছুটে গিয়েছে হয়তো।

—না, আমার স্কুলে ওভাবে কাজ করলে চলবে না। খাতা সব আপনি ফিরিয়ে নিয়েযান। আবার দেখতে হবে।

—যে আজ্ঞে স্যার।

পরদিন নতুন মাস্টার সারকুলার-বই দেখিয়া বাহির করিলেন—মি. আলম ফার্স্ট ক্লাসেরইংরাজি গ্রামার ও রচনার খাতা দেখিয়াছেন। তিনখানি খাতা চাহিয়া লইয়া দেখিতে দেখিতে বাহিরকরিলেন, মি. আলম গড়ে প্রত্যেক পাতায় অন্তত তিনটি করিয়া ভুলের নীচে লাল দাগ দেন নাই।

নতুন টিচার খাতা কয়খানি হাতে করিয়া হেডমাস্টারের কাছে না গিয়া মি. আলমের কাছে গেলেন। খাতা দেখাইয়া বলিলেন, আপনার খাতা দেখা যদি আদর্শ হিসেবে নিতে হয়, তা হলে প্রত্যেক পাতায় আমার তিনটি ভুলে লাল দাগ না দিয়ে রাখা উচিত ছিল। দেখুন খাতা ক'খানা!

মি. আলম উল্টাইয়া খাতাগুলি দেখিলেন। যুক্তি অকাট্য। গড়ে তিনটি করিয়া ভুলে লাল দাগ দেওয়া হয় নাই—খাঁটি কথা।

মি. আলমের মুখ লাল হইয়া উঠিল অপমানে, কিন্তু কোনো কথা বলিলেন না।

নতুন টিচার বলিলেন, আপনি বললেন কিনা হেডমাস্টারের কাছে আমার বড় ভুল থাকে খাতায়, তাই দেখালুম—ভুল সকলেরই থাকে। ওগুলো ওভারলুক করতে হয়। সব কথায় হেডমাস্টারের কাছে—

মি. আলম রাগিয়া বলিলেন, আপনি কী করে জানলেন, আমি হেডমাস্টারের কাছেবলেছি?

—মনের অগোচর পাপ নেই। আপনি জানেন, আপনি বলেছেন কিনা—বলিয়াই নতুনটিচার বেশ কায়দার সহিত ঘর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এ ব্যাপার কী করিয়া যেন অন্য টিচারেরা জানিতে পারিলেন, টিচারদের বসিবার ঘরে টিফিনের সময় এ কথা লইয়া বেশ গুলজার হইল। মি. আলমের অপমানে সকলেই খুশি।

যদুবাবু বলিলেন, বেশ হয়েছে অন্ত্যজটার। থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে নতুন টিচার।কী ওর নাম, রামেন্দুবাবু বুঝি?নারাণবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাহার একটা গুণ, পরের কথায় বড় একটা থাকেন না।বলিলেন, বাদ দাও ভায়া ও-কথা।

যদুবাবু বলিলেন, বাদ দেব কেন? আপনি তো দাদা, দেবতুল্য লোক। তা বলে দুষ্টুলোকও তো আছে পৃথিবীতে। তাদের শাস্তি হওয়াই ভাল।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, জানেন দাদা, একটা কথা বলি। ওই মি. আলমটা সবার নামে হেডমাস্টারের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়—এ কথা আপনি অস্বীকার করতে পারেন? অমন হিংসুক লোক আর দুটি দেখিনি, এই আপনাকে বলে দিচ্ছি।

জ্যোতির্বিনোদ নীচু ক্লাসের পণ্ডিত—বড় বড় ক্লাসে যাঁহারা পড়ান, তাঁহাদের সমীহকরিয়া চলেন, তিনি কাহারও বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনা হইলে বিশেষ যোগ দেন না। তিনি বলেন, আমি চুনোপুঁটি, আপনারা সকলেই রুই-কাতলা—আমার কোনো কথায় থাকা সাজে না। তিনিও আজ বলিলেন, একটা ভাল বলতে হয় রামেন্দুবাবুকে—তিনি ওই খাতা নিয়েহেডমাস্টারের কাছে না গিয়ে মি. আলমের কাছে গিয়েছেন!

যদুবাবু কাহারও ভাল দেখিতে পারেন না। তিনি বলিলেন, আরে সেটা কিছু নয় হেভায়া, হেডমাস্টারের কাছে যেতে সাহস কি হয় সবারই!

নারাণবাবু বলিলেন, তা নয়। অতখানি যে করতে পারে, সাহেবের কাছে যাওয়ার সাহস তার খুবই আছে। লোকটি ভদ্রলোক।

যদুবাবু বলিলেন, তবে একটু গুমুরে। যাক, সব গুণ মানুষের থাকে না। এ কাজটা করে যা শিক্ষা দিয়েছে আলমকে, ভারি খুশি হয়েছি—হ্যাঁ-হ্যাঁ, কী বলো ক্ষেত্র-ভায়া?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, স্পিরিট আছে ভদ্রলোকের।

—ডেকে নিয়ে এসো না। ওই তো ওদিকের ছাদে বসে থাকে একলাটি। টিফিনে টিচারদেরঘরে কোনোদিন তো আসে না।

নারাণবাবু বলিলেন, বসে বসে বই পড়ে লাইব্রেরি থেকে নিয়ে। সেদিন বঙ্কিমের বইপড়ছিল। পকেটে একদিন শেলির কবিতা ছিল। তোমরা ওকে গুমুরে ভাব, ও তা নয়। কবিকিনা, একটু আনমনে ভাবতে ভালবাসে।

—যাও না ক্ষেত্র-ভায়া, ডেকে নিয়ে এসো না!

—আমি পারব না দাদা, কিছু যদি বলে বসে! তার চেয়ে চলুন, আজ চায়ের দোকানের আড্ডায় নিয়ে যাওয়া যাক ওকে। আলাপ-সালাপ করা যাক।

ছুটির পরে গেটের বাহিরে মাস্টারের দল নতুন মাস্টারের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, কারণ এ ঘনিষ্ঠতা হেডমাস্টার বা মি. আলমের চোখের আড়ালে হওয়াই ভাল। মি. আলম বাহেডমাস্টারের নেকনজরে যে ব্যক্তি নাই, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে যাওয়ার বিপদআছে।

নতুন টিচার চোখে চশমা লাগাইয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে নব্য কবির স্টাইলে আকাশপানে মুখ করিয়া যেই গেটের বাহিরে পা দিয়াছেন, অমনি যদুবাবু এদিক-ওদিক চাহিয়াবলিলেন, এই যে শুনছেন, রামেন্দুবাবু—এই যে—

রামেন্দুবাবু হঠাৎ যেন চমকিয়া উঠিয়া পিছনে ফিরিয়া বিস্ময়ের সঙ্গে বলিলেন, আমাকেবলছেন?

যেন তিনি ইহা প্রত্যাশা করেন নাই, তাহাকে কেহ ডাকিবে!

যদুবাবু বলিলেন, আমরাই ডাকছি, আসুন, একটু চা খেয়ে আসি!

—ও! আচ্ছা—তা চলুন!

সকলেই খুব আগ্রহান্বিত। নতুন টিচারের সঙ্গে এতদিন আলাপ ভাল করিয়া হয়ই নাই, অনেকের সঙ্গে একটা কথাও হয় নাই। আজ ভাল করিয়া আলাপ করা যাইবে। লোকটারঅদ্যকার কার্যে তাহার সম্বন্ধে মাস্টারদের কৌতূহলের অন্ত নাই। আলমকে যে অপমান করিয়া ছাড়িয়াছে, সে সকলের বন্ধু।

চায়ের দোকানে গিয়া প্রতিদিনের মতো মজলিস জমিল। স্কুল-মাস্টারদের অবশ্য যতটা হওয়া সম্ভব, তাহার বেশি ইহাদের ক্ষমতা নাই। নতুন টিচারকে খাতির করিয়া দুইখানা টোস্টদেওয়া হইল, বাকি সবাই একখানা করিয়া টোস্ট লইলেন। পরস্পর একটা মানসিক বোঝাপড়া হইল যে, নতুন টিচারের খাবারের বিলটা সকলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া দিবেন।

নারাণবাবু আলাপের ভূমিকাস্বরূপ প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, মশায়ের বাড়ি কোথায়?

—আমার বাড়ি ছিল গিয়ে নদে জেলায় সুবর্ণপুর। এখন কলকাতায় আছি অনেক দিন।

—কলকাতায় কোথায় থাকেন?

—মেসে।

—ও।

যদুবাবু একটু ঘনিষ্ঠতা করার জন্য বলিলেন, অনেক দিন কলকাতায় আর কী আছ ভায়া, তোমার বয়েসটা কী আর এমন, আমাদের চেয়ে কত ছোট—

নতুন টিচার এ ঘনিষ্ঠতায় বিশেষ ধরা দিলেন না। খুব ভদ্রতার সঙ্গে বিনীতভাবে জানাইলেন, তাহার বয়স খুব কম নয়, প্রায় চৌত্রিশ পার হইতে চলিল। 'দাদা'কথাটার ব্যবহারএকবারও করিলেন না। বেশ একটু ভদ্র ও বিনীত ব্যবধান বজায় রাখিয়া চলিলেন কথাবার্তায়ও চালচলনে।

একথা-ওকথার পর যদুবাবু হঠাৎ বলিলেন, আজ আমরা খুব খুশি হয়েছি, বেশ শিক্ষাদিয়েছেন (মাখামাখি করিবার সাহস তাহার উবিয়া গিয়াছিল) ওই ব্যাটাকে—

নতুন টিচার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, কার কথা বলছেন?

—আরে, ওই যে ওই আলমটাকে—ও ব্যাটা হেডমাস্টারের কাছে প্রত্যেক বিষয়েলাগাবে। আমাদের উস্তন-কুস্তন করে মেরেচে মশাই! উঃ, ও একেবারে অন্ত্যজ—ওর যাঅপমান করেচেন আজ! দেখুন তো, আপনার নামে কিনা লাগাতে—

নতুন টিচারের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি বিরস কণ্ঠে বলিলেন, ও আলোচনা নাই বাকরলেন এখন। মি. আলমের ভুল হতে পারে। ভুল সবারই হয়। আমি তার ভুল পয়েন্ট-আউটকরেছি মাত্র। আদারওয়াইজ হি ইজ এ ভেরি গুড টিচার—ভেরি অনেস্ট অ্যান্ড সিনসিয়ারটিচার। যাক ওসব কথা।

কঠিন ভদ্র সুরের গাম্ভীর্যে চায়ের দোকানের হাল্কা আবহাওয়া যেন থমথম করিয়া উঠিল।

যদুবাবু আর মাখামাখি করিবার সাহস পাইলেন না। অন্য কথা উঠিল। নতুন টিচার বিশেষ কোনো কথা বলিলেন না। মজলিস জমিল না, যতটা আশা করা গিয়াছিল।

চায়ের মজলিস শেষ হইলে নতুন টিচার বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। সকলের পয়সা তিনি নিজেই দিয়া গেলেন।

যদুবাবু বলিলেন, গভীর জলের মাছ, দেখলে তো? ক্ষেত্রবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হুঁ।

—বেশ চালবাজ!

—তা একটু আছে বইকি।।

নারাণবাবু বলিলেন, তোমরা কারুর ভাল দেখ না—ওই তোমাদের দোষ। এ চালবাজ, ও গভীর জলের মাছ—এই সব তোমাদের কথা!

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, না না, ভদ্রলোক ভালই। আমি তো দেখছি বেশ উদার লোক।

যদুবাবু বলিলেন, ওই তো ভায়া, ওই জন্যেই তো বলচি গভীর জলের মাছ। আমাদেরপয়সাটি পর্যন্ত নিজে দিয়ে গেল, যেন কত ভদ্রতা! অথচ—

নারাণবাবু বলিলেন, অথচ কী? তুমি সব জিনিসের মধ্যে একটা 'অথচ' না বের করেছাড়বে না ভায়া!

—অথচ মনের কথাটা প্রকাশ করলে না।

—অথচ নয়, অর্থাৎ তোমার মতো পেটপাতলা নয়।

—আপনি তো দাদা আমার সবই দোষ দেখেন!

—রাগ কোরো না ভায়া। আমি তো ও-ছোকরার কোনো দোষই দেখলাম না। বসে বসেমি. আলমের নামে কুৎসা গাইলেই কি ভাল লোক হত?

নারাণবাবুকে সকলেই তাহার বয়সের জন্য একটু সমীহ করিয়া চলে। যদুবাবু ইহা লইয়ানারাণবাবুর সঙ্গে আর তর্ক করিলেন না।

মোটের উপর সেদিন চায়ের মজলিস হইতে বাহির হইয়া সকলেই অসন্তোষ লইয়া বাড়িফিরিলেন।

মাসের শেষে ছেলেদের প্রোগ্রেস রিপোর্ট ইত্যাদি লেখার ভিড় পড়িয়া গেল।হেডমাস্টারের কড়া হুকুম আছে, মাসের শেষদিন কোনো টিচার ছুটির পর বাড়ি যাইতে পারিবেনা—বসিয়া বসিয়া সব প্রোগ্রেস রিপোর্ট লিখিয়া হেডমাস্টারের সই করাইয়া বিভিন্ন ক্লাসেরমার্কের খাতায় ছেলেদের মার্ক জমা করিয়া, ক্লাসের হাজিরা-বহিতে ছেলেদের গরহাজিরা বাহিরকরিয়া তবে যাইতে পারিবে।

এই সব কেরানীর কাজ সাঙ্গ করিয়া বাড়ি ফিরিতে রাত সাড়ে সাতটা বাজিয়া যায়।

স্কুলের প্রথানুযায়ী মাস্টারদের সেদিন জলখাবার দেওয়া হয় স্কুলের খরচে। যদুবাবু ছুটিরপর সাহেবের কাছে জলখাবারের টাকা আনিতে গেলেন—বরাবর তিনিই যান ও কোনো দোকানহইতে খাবার কিনিয়া আনেন।

বরাদ্দ আছে সাড়ে পাঁচ টাকা। সাহেব যদুবাবুর হাতে সাতটি টাকা দিয়া বলিলেন, আজ ভাল করে খাও সকলে—লাড়ু রসগোল্লা বেশি করে নিয়ে এসো।

যদুবাবু প্রথমে একটি রেস্টুরেন্টে গিয়া দুই পেয়ালা চা খাইলেন, তারপর ছয় টাকার খাবারকিনিলেন এক দোকান হইতে। বাকি একটি টাকা তাহার উপরি-পাওনা। অন্য অন্যবার আট আনা পয়সা উপরি-পাওনা হয় অর্থাৎ পাঁচ টাকার খাবার কিনিয়া আট আনা পকেটস্থ করেন।

স্কুলে আসিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল।

মাস্টারেরা অধীর আগ্রহে জলখাবারের প্রত্যাশায় বসিয়া আছেন। একজন বলিলেন, এত দেরি কেন যদুবাবু?

—আরে, গরম গরম ভাজিয়ে আনছি। আমার কাছে বাবা ফাঁকি দিতে পারবে না কোনো দোকানদার। বসে থেকে তৈরি করিয়ে ষোলো আনা দাঁড়ি ধরে ওজন করিয়ে তবে—

অন্যান্য মাস্টারদের অগাধ বিশ্বাস যদুবাবুর উপরে। সকলেই বলেন, যদুবাবুর মতো কিনতে-কাটতে কেউ পারে না—পাকা লোক একেবারে যাকে বলে।

টিচারদের ঘরে বেঞ্চির উপর ছোট ছোট পাতা পাতিয়া খাবার পরিবেশন করা হইল।যদুবাবু এখানে খাইবেন না, তিনি বাড়ি লইয়া যাইবেন। জ্যোতির্বিনোদ মশায় ঘিয়ে-ভাজা জিনিসখাইবেন না, তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তাহার জন্য শুধু সন্দেশ-রসগোল্লা আনা হইয়াছে। নতুন টিচার বেঞ্চির এক পাশে খাইতে বসিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে বড় সাধারণত কাহারও মেশামেশি—নাই। তিনি নিঃশব্দে ঘাড় গুঁজিয়া খাইতেছিলেন। যদুবাবুসামনে গিয়া বলিলেন, আর দু-একখানা লুচি দেব?

—না না, আর দেবেন না। —একটা রসগোল্লা ?

অন্যান্য টিচার সকলেই বিভিন্ন বেঞ্চি হইতে নতুন টিচারকে খাওয়ার জন্য, দুই-একটাঅতিরিক্ত মিষ্টি লওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

মি. আলম ভোজসভায় প্রতিবার উপস্থিত থাকেন; কিন্তু স্বীয় পদের আভিজাত্য বজায়রাখিবার জন্য সাধারণ মাস্টারদের সঙ্গে খাইতে বসেন না। মাস্টারেরা বরং খোশামোদ করিয়াপ্রতিবার ভোজসভাতেই তাহাকে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিত। মি. আলম হাসিমুখেপ্রত্যাখ্যান করিতেন।

আজ তাঁহার প্রাপ্য সেই আপ্যায়ন নতুন টিচারের উপর গিয়া পড়িতে দেখিয়া মি. আলমমনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন, বিস্মিত হইলেন, নতুন টিচারের উপর হিংসায় মন পরিপূর্ণ হইল।

নতুন টিচার বলিলেন, মি. আলম, আপনি খেলেন না? আসুন!

মি. আলম গম্ভীরমুখে উত্তর দিলেন, না, আপনারা খান। আমি এখন খাইনে।

নতুন টিচার আর কোনো কথা বলিলেন না।

মাসে এই একদিন করিয়া স্কুলের খরচে খাওয়া—এমন বেশি কিছু খাওয়া নয়, হয়তো খান-পাঁচ-ছয় লুচি, দুইটি রসগোল্লা, একটু তরকারি, এক মুঠা বোঁদে। এই খাওয়াটুকুর জন্যমাস্টারেরা মাসের শেষ দিনটির প্রতীক্ষায় থাকেন, সেদিন সারা দিনটা খাটিবার পর সন্ধ্যায়সকলে বসিয়া একটু খাওয়াদাওয়া—

পরদিন মি. আলম হেডমাস্টারকে গিয়া বলিলেন, স্যার, একটা কথা—মাসের শেষেমাস্টারদের পিছনে পাঁচ টাকা ছ'টাকা মিথ্যে খরচ, ও বন্ধ করে দেওয়াই ভাল। ধরুন, কমিটিথেকে আপত্তি তুলতে পারে। মাস্টারদের ডিউটি তারা করবে, তার জন্যে খাওয়ানো কেন স্কুলেরখরচে ? আমি তো ভাল বুঝছি নে স্যার!

কমিটির নামে হেডমাস্টার একটু ভয় পাইয়া গেলেন। তবুও বলিলেন, তা খায় খাকগে, খাটতেও হয় তো।

মি. আলম জানিত, কমিটির নামে সাহেব একটু ভয় পায়। সে গিয়া কমিটির একজনমেম্বারকে কথাটা লাগাইল। কমিটির মিটিংয়ে অমূল্যবাবু সাহেবকে প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, শুনলাম আপনি টিচারদের জলখাবার খেতে দেন মাসের শেষে, সে কার পয়সায় ?

—স্কুলের খরচে।

—কেন?

—মাস্টারদের খাটুনি বেশি হয়—প্রোগ্রেস রিপোর্ট লেখা, রেজিস্টার ঠিক করা—

—এ তো তাদের ডিউটি। এর জন্যে জলখাবার দেওয়া কেন?

ক্লার্কওয়েল তর্ক করিয়া তখনকার মতো নিজের কাজের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু পরের মাস হইতে মাস্টারদের জলযোগ বন্ধ হইয়া গেল।

ক্ষেত্রবাবু সেদিন স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিয়া দেখিলেন, স্ত্রী বিছানায় শুইয়া আছে, ভয়ানক জ্বর। এঁটো বাসন রান্নাঘরের একপাশে জড়ো হইয়া আছে—ওবেলাকার এঁটো পরিষ্কার করা হয়নাই, ছেলেমেয়েগুলো ঘরময় দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে, চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। ক্ষেত্রবাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল। সারাদিন পরে আসিয়া এ

সব কি সহ্য হয় ? স্ত্রীর ব্যবস্থামতো ঠিকা-ঝিকে আজ মাস তিনেক হইল ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রীই বলিয়াছিল, কেন মিছিমিছি ঝির পেছনে আড়াই টাকা তিন টাকা খরচ—আজ একটু নুন দাও মা, আজ খিদে পেয়েছে জলখাবার দাও মা, আজ মাখবার একটু তেল দাও মা—এই সব ঝক্কি রোজ লেগেই আছে। দাও ছাড়িয়ে, কাজকর্মসব করব আমি। হাসিয়া বলিয়াছিল, কিন্তু মাসে মাসে আড়াইটে করে টাকা আমায় দিয়ো গো, ফাঁকি দিয়ো না যেন!

কিন্তু শরীর খারাপ, মন খাটিতে চাহিলে কী হইবে, তিন মাসের মধ্যে এই তিনবার অসুখেপড়িল। ডাক্তার ও ওষুধ খরচে ঠিকা-ঝিয়ের ডবল খরচ হইয়া গেল।

ক্ষেত্রবাবু নিজে বড় মেয়েটির সাহায্যে রান্নাঘর পরিষ্কার করিলেন। মেয়েকে বলিলেন, বাসন মাজতে পারবি হাবি?

হাবি মাত্র সাত বছরের মেয়ে। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হু, খু-উ-ব।

—যা দিকি, আমি কলতলায় দিয়ে আসছি।

ঘরের ভিতর হইতে নিভাননী চিঁ-চিঁ করিয়া বলিল, ও পারবে না—একটা ঠিকে-ঝি দেখে নিয়ে এসো। ওই সদগোপ-বাবুদের পাশের গলিতে মুংলির মা বুড়ি থাকে, খোঁজ করে দেখগে।

ক্ষেত্রবাবু ধমক দিয়া বলিলেন, তুমি চুপ করে শুয়ে থাক। আমি বুঝছি। কেন ও পারবেনা? শিখতে হবে না কাজ? কানু কোথায় রে?

হাবি বলিল, না বাবা, আমি পারব। দাদা খেলা করতে গিয়েছে।

—সুজি কোথায় আছে? ঘি?

নিভাননীর ধমক খাইয়া রাগ হইয়াছিল। সে কথা বলিল না।

—আঃ, বলি—সুজিটা কোথায়? সারাদিন খেটে খিদেতে মরছি, যা হয় কিছু খাব তো?

নিভাননী পূর্ব্ববৎ চিঁ-চিঁ করিতে করিতে বলিল, আমার কী দরকার কথায় ? যা বোঝো করোতুমি।

হাবি বলিল, আমি জানি বাবা, আমি দিচ্চি।

তখন নিভাননী মেয়েকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, সুজি করিবার দরকার নাই, ও-বেলার রুটিকরা আছে শিকেয় হাঁড়িতে। নিয়ে খেতে বল। চা করে দিতে পারবি?

হাবি 'না' বলিতে জানে না। ঘাড় লম্বা করিয়া বলিল, হু—উ—উ—

সে চায়ের কাপ ইত্যাদি লইয়া রান্নাঘরের দিকে যাইতে যাইতে বলিল, মা, উনুনে আঁচ দিয়ে দেবে কে?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তোমাকে ওসব করতে হবে না। হয়েছে, থাক, আর আমার চায়েদরকার নেই, তারপর চা করতে গিয়ে জামায় আগুন লেগে মরুক—

নিভাননী বলিল, আহা মুখের কী মিষ্টি বাক্যি!

ক্ষেত্রবাবু এক গ্লাস জল ঢকঢক করিয়া খাইয়া ফেলিলেন। তারপর হাবির সাহায্যে রুটিবাহির করিয়া গুড় দিয়া এক-আধখানা নিজে খাইলেন, বাকি ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া টুইশানিতে বাহির হইলেন।

হাবি বলিল, বাবা, মা বলছে, রাত্রে কী খাবে? একখানা পাউরুটি কিনে এনো—

ক্ষেত্রবাবু কথা কানে তুলিলেন না। ছাত্রের বাড়ি গিয়া মনে পড়িল, স্ত্রীর অসুখের জন্যএকবার বেলেঘাটায় রামসদয় ডাক্তারের ওখানে যাইতে হইবে। খানিকটা আলাপ-পরিচয় আছে; স্কুল-মাস্টার বলিয়া ভিজিটটা কম লইয়া থাকে তাহার কাছে।

ছেলের বাপ আসিয়া কাছে বসিয়া ছেলের পড়ার তদারক করিতে লাগিল। ফলে ক্ষেত্রবাবু যে একটু সকাল সকাল বিদায় লইবেন, তাহার উপায় রহিল না। অভিভাবকেরমনস্তুষ্টির দরুন বরং একটু বেশি সময় বসিয়া থাকিতে হইল। রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় ছাত্রের বাড়ি হইতে পদব্রজে বেলেঘাটা চলিলেন। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিয়া কাজ শেষ করিতে সাড়ে দশটা বাজিয়া গেল, কাজেই আসিবার পথে ছয়টি পয়সা বাসভাড়া দিয়া ফিরিতে হইল।

বাসায় ফিরিয়া দেখেন, ছেলেমেয়েরা অঘোরে ঘুমাইতেছে। স্ত্রীর আবার জ্বর আসিয়াছিল সন্ধ্যার পরেই, সে বিছানায় পড়িয়া এপাশ-ওপাশ করিতেছে।

ভীষণ ক্ষুধা পাইয়াছে। কিন্তু এত রাত্রে কী খাইবেন? ভাত চড়াইবার ধৈর্য থাকে না আরএখন।

নিভাননী জ্বরে বেহুঁশ, তবুও সে জিজ্ঞাসা করিল, পাঁউরুটি এনেচ?

ঐ যাঃ, পাউরুটি কিনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, অত কি ছাই মনে থাকে? বলিলেন, না, আনতে মনে নেই।

নিভাননী উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিল, তবে কী খাবে এখন? দুটো চিঁড়ে কিনে আনো না হয়—

ক্ষেত্রবাবু বিরক্তির সহিত বলিলেন, হ্যাঁ, এখন এগারোটা বাজে, আমার জন্য চিঁড়ের দোকান খুলে রেখেছে তারা!

—দেখই না গো, মোড়ের দোকানটা অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে।

ক্ষেত্রবাবু সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া কলসি হইতে এক গ্লাস জল গড়াইয়া ঢকঢককরিয়া খাইয়া আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িলেন, অর্থাৎ সমস্ত অসুবিধা ও অনাহারের দায়িত্বটা রুগ্ণ স্ত্রীর ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেন বিনা বাক্যব্যয়ে।

নিভাননী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

পরদিন সকালে ডাক্তার আসিয়া বলিল, রোগ বাঁকা পথ ধরিয়াছে। বাড়িতে ভালচিকিৎসা হইবে না, হাসপাতালে পাঠাইতে পারিলে ভাল হয়। ক্ষেত্রবাবুর প্রাণ উড়িয়া গেল। হাসপাতালে স্ত্রীকে পাঠাইলে ছেলেমেয়েদের বাড়িতে দেখাশোনা করে কে? হাসপাতালে যাওয়ারব্যবস্থাই বা তিনি কখন করেন?

ডাক্তারের হাতে-পায়ে ধরিয়া একটা চিঠি লিখাইয়া লইলেন ক্যাম্বেল হাসপাতালের এক ডাক্তারের নামে। যাইতে গেলে ক্যাম্বেল হাসপাতালে গিয়া কাজ মিটাইয়া আবার ঠিক সময়ে স্কুল যাইতে পারেন না। সুতরাং হাবিকে তাহার ভাইবোনের জন্য রান্না করিতে বলিয়া, না খাইয়াই বাহির হইলেন। ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলে পাঁচ মিনিট লেট হইবার জো নাই।

হাসপাতালে গিয়া শুনিলেন, ডাক্তারবাবু দশটার আগে আসেন না। বসিয়া বসিয়া সাড়েদশটার সময় ডাক্তারের মোটর আসিয়া গেটে ঢুকিল। ক্ষেত্রবাবুর হাত হইতে চিঠি পড়িয়াবলিলেন, আচ্ছা, আপনি ও-বেলা আমার সঙ্গে একবার দেখা করবেন, এই ছ'টার সময়। এ বেলা বলতে পারচিনে।

ক্ষেত্রবাবু প্রমাদ গনিলেন। ছয়টা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করিবেন তো বাসায় যাইবেনকখন, ছেলে পড়াইতেই বা যাইবেন কখন?

স্কুলের কাজ শেষ হইয়া আসিয়াছে, বেলা চারিটা বাজে, এমন সময় সাহেবের ঘরে ডাকপড়িল।

ক্ষেত্রবাবু সাহেবের টেবিলের সামনে দাঁড়াইতেই সাহেব বলিলেন, ক্ষেত্রবাবু, দুটো ক্লাসের প্রশ্নপত্র লিথো করতে হবে—আপনি ছুটি হলে কাজটা করে বাড়ি যাবেন।

হেডমাস্টারের কথার উপরকথা চলে না, অগত্যা তাহাই করিতে হইল। ছুটির পর মাস্টারদের মধ্যে দুই-একজন বলিলেন, চলুন ক্ষেত্রবাবু, চা খেয়ে আসি।

—মনে সুখ নেই, চা খাব কী, চলুন—

সেখানে গিয়া মাস্টারের দল প্রস্তাব করিলেন, স্কুলে একদিন ফিস্ট করা হোক। হেডপণ্ডিতচা না খাইলেও এখানে উপস্থিত থাকেন রোজ। তিনি ফর্দ করিলেন, প্রত্যেক মাস্টারকে এক টাকা করিয়া চাঁদা দিতে হইবে। তাহা হইলে একদিন পোলাও রাঁধিয়া সবাই আমোদ করিয়া খাওয়াযায়। যদুবাবু বলিলেন, এক টাকা বড় বেশি হইয়া পড়ে—বারো আনার মধ্যে যাহা হয় হউক।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, মনে সুখ নেই দাদা, এখন ওসব থাক।

যদুবাবু বলিলেন, কেন, কী হয়েছে?

—বাড়িতে বড় অসুখ। স্ত্রীকে হাসপাতালে পাঠাতে হচ্ছে কাল।

সকলেই নানারূপ ব্যগ্র প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। দুই-একজন ক্ষেত্রবাবুর বাড়ি পর্যন্ত গিয়া দেখিতে চাহিলেন। ফিস্ট খাইবার প্রস্তাব আপাতত মুলতুবী রহিল। সকলেই কম মাহিনায় সংসার চালান, এক পরিবারের মতো মনে করেন পরস্পরকে, একজনের দুঃখ সবাই বোঝেন বলিয়াইচায়ের এ মজলিসের বন্ধুদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন ঘনিষ্ঠ ও নির্ভেজাল।

ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে নারাণবাবু হাসপাতাল পর্যন্ত গেলেন। ক্ষেত্রবাবু বলিয়াছিলেন, আপনিবুড়োমানুষ এতটা আর যাবেন না হেঁটে।

—বুড়োমানুষ বলে কি মানুষ নই? ও কী ভায়া, চল, গিয়ে দেখে আসি।

দু'জনে গিয়া ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিয়া হাসপাতালের সব ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন এবং পরদিনই নিভাননীকে হাসপাতালে আনা হইল।

নারাণবাবু রোজ বিকালে টুইশানিতে যাইবার আগে দুইটি কমলালেবু, কোনোদিন বা একগুচ্ছ আঙুর লইয়া নিভাননীকে দেখিয়া যান। স্কুলে পরদিন বলেন, ও ক্ষেত্র-ভায়া, বউমা কাল বলছিলেন, তুমি হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাচ্ছ, তোমার কে এক শালী আছেন, তাঁকে এনে দু'দিনরাখ না—

—আপনাকে বললে বুঝি ?

—হ্যাঁ, কাল উনি বলছিলেন। তোমার কষ্ট হচ্ছে। কবে যে সেরে উঠব, কবে যে বাড়িযাব—বলছিলেন বউমা।

—ওইরকম বলে। শালীকে আনা কি সহজ দাদা ? নিয়ে এসো খরচ করে, দিয়ে এসো খরচ করে—খাওয়াও লুচি-পরোটা। সে কি আমাদের সাধ্যি?

নারাণবাবুকে নিভাননী 'দাদা' বলিয়া ডাকে। আড়ালে 'বটুঠাকুর' বলিয়া ডাকে স্বামীরকাছে। নারাণবাবু কত রকম মজার গল্প করেন তাহার কাছে, রোগীর মনে আনন্দ দিতে চান।একদিন নিভাননী বলিল, দাদা, আমি ভাল হলে আপনাকে ছোট বোনের বাড়ি একদিন খেতেহবে।

নারাণবাবু শশব্যস্ত হইয়া বলেন, নিশ্চয় বউমা, নিশ্চয়, এর আর কথা কী?

—আপনি কী খেতে ভালবাসেন দাদা?

—আমি? আমার—বউমা-বুড়ো হয়েছি—যা হয় সব ভাল লাগে। একলা থাকি, রেঁধেখাই—

—কতদিন আছেন একা?

—তা আজ সাতাশ বছর বউমা।

—একা আছেন?

—তা থাকতে হয় বইকি বউমা। নিজেই রাঁধি—এই বয়সে কি রান্না করতে ইচ্ছে করে? বেশি কিছু রাঁধি না, যা হয় একটা তরকারি করি।

—আপনি মাছ খান ?

—তা খাই বউমা। ও বোষ্টমদের ঢঙ নেই আমার। পুরুষ মানুষ, মাছ-মাংস কেন খাবনা? ও বোষ্টমদের মেয়েলিপনার ঢঙ দেখলে আমি হাড়ে চটি।

—আমি আপনাকে ইলিশমাছের দই-মাছ রেঁধে খাওয়াব। আমি দিদিমার কাছে রাঁধতেশিখেছি, জানেন?

পিতৃসম স্নেহময় বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলিবার সময় নিভাননীর কণ্ঠে আপনিই যেনআবদারের সুর আসিয়া পড়ে। তাহার বালিকা-বয়সে যে বাবা স্বর্গে গিয়াছেন, যাঁহার কথা ভালমনে পড়ে না—এই প্রাণখোলা সরল বৃদ্ধের মধ্যে নিভাননী তাহাকেই যেন আবার দেখিতে পায়, নিজের কণ্ঠে কখন যে কন্যার মতো আবদার-অভিমানের সুর আসিয়া পড়ে সে বুঝিতেও পারেনা।

নারাণবাবু বসিয়া বসিয়া সুখ-দুঃখের কথা বলেন। নারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আজ ত্রিশবছর আসেন নাই—স্নেহ-ভালবাসার পাট উঠিয়া গিয়াছে জীবনে। এমন দরদী শ্রোতা পাইয়াতাহারও মনের উৎসমুখ খুলিয়া যায়। প্রথম জীবনের চাকুরির কথা বলেন। বহুকালপরলোকগতা পত্নীর সম্বন্ধে বলেন, অনুকূলবাবুর কথাও পাড়েন। নিভাননী সহানুভূতি জানায়, একমনে শুনিতে শুনিতে কখন তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠে।

ক্ষেত্রবাবু সবদিন আসিতে পারেন না। টুইশানি, বাড়িতে ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনাএসব সারিয়া রোজ হাসপাতালে আসা চলে না। নারাণবাবু আসেন বলিয়া হয়তো তেমন দরকারও হয় না।

সেদিন নারাণবাবু টুইশানি সারিয়া বউবাজারের মোড় হইতে একটা বেদানা ও দুইটিকমলালেবু কিনিলেন। অনেকদিন কিছু হাতে করিয়া যাইতে পারেন নাই, আজ টুইশানির মাহিনাপাইয়াছেন। হাসপাতালের হলে দেখিলেন, হলের কোণে নিভাননীর সে বিছানাটা খালি,লোহার খাটটা হাড়পাঁজরা বাহির করা পড়িয়া আছে।

নারাণবাবু ভাবিলেন, তাঁহার ভুল হইয়াছ। কোন্ ঘরে আসিতে কোন্ ঘরে আসিয়াছেন, বৃদ্ধ বয়সে মনে থাকে না। বাহির হইতে গিয়া বারান্দায় জলের না কিসের ড্রামটি চোখে পড়িল।না, এই ড্রাম রহিয়াছে—এই তো ঘর। আবার তিনি ঘরে ঢুকিলেন।

পাশের বিছানার এক রোগী বলিল, আপনি কাকে খুঁজছেন বলুন তো? ও, সেই বউটিরআপনি কেউ—আহা, আপনি জানেন না! ও তো আজ দুপুরে হয়ে গিয়েছে। বউটির স্বামী এল, আরও কে কে এল নিয়ে গেল, প্রায় তখন তিনটে। আহা, আমরা সবাই কথা কইতে কইতেপাশ ফিরল আর অমনি হয়ে গেল। হার্টে কিছু ছিল না। আহা, আপনি কে হতেন ওঁর ইত্যাদি।

নারাণবাবু কিছু না বলিয়া ফলগুলি হাতে করিয়া বাহিরে আসিলেন।

আজ ক্ষেত্রবাবুকে কি স্কুলে দেখেন নাই? না বোধহয়। এখন মনে পড়িল, সারাদিন স্কুলেক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নাই বটে। আজ হাসপাতালে আসিবেন বলিয়া টুইশানিতে গিয়াছিলেনছুটির পরেই, সুতরাং চায়ের দোকানেও যান নাই। নতুবা ক্ষেত্রবাবুর অনুপস্থিতি চোখে পড়িত।

নিজের ছোট ঘরের নিঃসঙ্গ শয্যায় শুইয়া বৃদ্ধ কত রাত পর্যন্ত ঘুমাইতে পারিলেন না।

স্কুলের দুর্দশা উপস্থিত হইল এপ্রিল মাস হইতে। এপ্রিল মাসে মাস্টারদের বেতন ঠিক সময়দেওয়ার উপায় রহিল না; কারণ এবার জানুয়ারি মাসে আশানুরূপ ছেলে ভর্তি হয় নাই, বরংঅনেক ছেলে ট্রান্সফার লইয়া চলিয়া গিয়াছে। এ স্কুলে ছেলেদের মাহিনা অন্য স্কুল হইতে বেশি, এই সব দুঃসময়ে লোক বেশি মাহিনা দিতে আর চায় না। পূর্বে ভাবা গিয়াছিল, সাহেব-মেম স্কুলে পড়াইবে বলিয়া পাড়ার বড়লোকেরা ছেলে এখানেই ভর্তি করিবে; কিন্তু গত ম্যাট্রিকপরীক্ষার ফল তেমন ভাল না হওয়ায় এ স্কুলে পড়াইতে অনেকেই দ্বিধা বোধ করিল। ফলেছেলে অনেক কমিয়া গিয়াছে এবার।

মাস্টাররা সাতাশে এপ্রিল মার্চ মাসের মাহিনার কিছু অংশ মাত্র পাইল। গরমের ছুটির পূর্বে মে মাসে মার্চ মাসের প্রাপ্ত বেতনের বাকি অংশ শোধ করিয়া দেওয়া হইল। দেড় মাসগরমের ছুটি, গরিব শিক্ষকেরা বাড়ি গিয়া খায় কী? হেডমাস্টারের কাছে দরবার করিয়া ফল হইল না। সকলে বলিল, সাহেব-মেম ঠিক ওদের পুরো ছুটির মাইনে নিয়ে যাচ্ছে, আমাদেরই বিপদ।

শোনা গেল, সাহেব দিল্লি না কোথায় যেন বেড়াইতে যাইতেছে।

স্কুলের কেরানী হরিচরণ নাগ কিন্তু বলিল, কথা ঠিক নয়—সাহেব এখনও মার্চ মাসেরমাহিনা শোধ করিয়া লয় নাই। মেম এপ্রিল মাস পর্যন্ত মাহিনা লইয়াছে বটে।

সাহেবের নিকট যাইয়া মাহিনা পাইবার জন্য বেশি পীড়াপীড়ি করিলে সাহেব বলিলেন, মাই ডোর ইজ ওপন্—যাঁদের না পোষায় চলে যেতে পারেন। আমার স্কুলে কষ্ট করে যারাথাকতে না পারবে, তাদের দিয়ে এখানে কাজ হবে না। আমাদের অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়েএখনও যেতে হবে—স্বার্থত্যাগ চাই তার জন্যে। সামনের বছর থেকে স্কুল ভাল হয়ে যাবে, এইবছরটা তোমরা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করো।

ক্লার্কওয়েল সাহেবের ব্যক্তিত্ব বলিয়া জিনিস ছিল, অন্তত গরিব টিচারদের কাছে। কারণ, ব্যক্তিত্ব জিনিসটা ভীষণ রিলেটিভ, আমার গুরুদেবের ব্যক্তিত্ব তোমার কাছে হয়তো কিছুই নয়, কিন্তু আমার কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ; তোমার জমিদার-মনিবের ব্যক্তিত্ব যতই গুরু হউক, আমার নিকটে তাহা নিতান্তই লঘু। সুতরাং মাস্টারের দল শুধুহাতে গরমের ছুটিতে দেশে চলিয়া গেল।

যদুবাবু পড়িয়া গেলেন মুশকিলে। কলিকাতা ছাড়িয়া কোথাও একটা যাইবার স্থান নাই, অথচ ইচ্ছা করে কোথাও যাইতে। কতদিন কলিকাতার বাহিরে যাওয়া ঘটে নাই, হাতও এদিকেখালি। তাঁহার ছাত্রেরা দেশে যাইতেছে, নবদ্বীপের কাছে পূর্বস্থলি নামে গ্রাম, বেশ নাকি ভালজায়গা। কিন্তু যদুবাবু তো একা নহেন, স্ত্রীকে বাসায় রাখিয়া যাওয়া সম্ভব নয়।

পৈতৃক গ্রামে যাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সেখানে ঘরবাড়ি নাই। জমিজমা শরিক কিনিয়া লইয়াছে আজ বহুদিন। তবুও যদুবাবু বলিলেন, বেড়াবাড়ি যাবে?

যদুবাবুর স্ত্রী বিবাহ হইয়া কিছুদিন যশোর জেলার এই ক্ষুদ্র গ্রামে শ্বশুরঘর করিয়াছিল, ম্যালেরিয়া ধরিয়া মাস দুই ভোগে। তাহার পর হইতেই স্বামীর সঙ্গে বর্ধমান ও পরে কলিকাতায়। সে বেড়াবাড়ি যাইবার প্রস্তাবে বিস্মিত হইয়া কহিল, বেড়াবাড়ি। সেখানে কেমন করে যাবেগো? বাড়িঘর কোথায় সেখানে ?

—চলো না, অবনীদের বাড়িতে গিয়ে উঠি। সেও তো কলকাতায় এসে আমার বাসাতেথেকে গিয়েছে দু-একবার।

না বাপু, পরের ঘরকন্নার মধ্যে যাওয়া, সে বড় ঝঞ্ঝাট। হাতে তোমার টাকাই বা কই?

যদুবাবুর মতলব একটু অন্য রকম। হাতে প্রায় কিছুই নাই, স্ত্রীকে পাড়াগাঁয়ে জ্ঞাতিদেরবাড়ি গছাইয়া রাখিয়া আসিয়া দিনকতক তিনি একটু হালকা হইবেন। এগারো টাকা করিয়া বাসাভাড়া আর টানিতে পারেন না। এই থার্ড মাস্টার শ্রীশ রায় মেসে থাকে, আড়াই টাকা সীটরেন্ট, খোরাকী খরচ দশ টাকা, সাড়ে বারো টাকার মধ্যে সব শেষ।

যদুবাবু স্ত্রীকে বলিয়া কহিয়া রাজী করাইলেন। কিন্তু যাইবার দিন বাড়িওয়ালা গোলমাল বাধাইল।

—আজ পাঁচ মাসের বাড়িভাড়া পাওনা মশাই, পাঁচ এগারোং পঞ্চান্ন টাকা—দশ টাকামাত্র ঠেকিয়েছেন এ মাসে আর মাত্র পাঁচ টাকা ঠেকিয়ে চলে যাচ্ছেন।? বাক্স-পেঁটরা-বিছানা সবই নিয়ে চললেন, রইল এখানে কী তবে? ওই একটা জারুল কাঠের সিন্দুক আর একখানা ভাঙাতক্তপোশ, আর তো দেখছি কয়লাভাঙা হাতুড়িটা আর মরচে-ধরা গোটা দুই কাচ-ভাঙাহ্যারিকেন। আপনি যদি আর না আসেন মশাই তো এতে আমার চল্লিশ টাকা আদায় হবে কিসে বুঝিয়ে দিয়ে তবে যান। আমি পাড়ার লোক ডাকি, তারা বলুক, আমার যদি অন্যায়

হয়ে থাকে মশাই, আমায় দশ ঘা জুতো মারুক। আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, বাড়িতে জায়গা দিয়েছিলাম, ইস্কুলে মাস্টারি করেন, ছেলেদের লেখাপড়া শেখান, তা এই যদি আপনার ধরন হয়—না মশাই, আমি তা পারব না। মাপ করবেন। আপনি যেতে হয়, জিনিসপত্র রেখে যান, নইলে আমারভাড়া চুকিয়ে দিয়ে যান।

কী হয়েচে, কী হয়েচে?—বলিয়া কলিকাতার হুজুগপ্রিয় কৌতূহলী লোক ভিড় পাকাইয়াতুলিল। কেহ হইল বাড়িওয়ালার দিকে, কেহ হইল যদুবাবুর দিকে—উভয় দলে মারামারি হইবারউপক্রম হইল। যদুবাবুর স্ত্রী চট করিয়া উপরে গিয়া বাড়িওয়ালার মায়ের কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন—মা, আপনি বলে দিন। টাকা আমরা ফেলে রাখব না—পালাবও না। স্কুল খুললেই টাকা শোধ দেব।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া বাড়িওয়ালার মা ডাকিল, ও বলে, বলি শোন, ওপরে আয়।

ব্যাপারটা মিটিল। স্ত্রী ও বাক্স-বিছানাসমেত যদুবাবু মুক্তি পাইলেন; কিন্তু আর তিনি কোনোদিন এ বাসা তো দূরের কথা, এ পাড়ার ত্রিসীমানাও মাড়ান নাই।

বেড়াবাড়ি বগুলা স্টেশনে নামিয়া সাত ক্রোশ গরুর গাড়িতে যাইতে হয়। দুপুর ঘুরিয়াগেল সেখানে পৌঁছিতে। শরিক অবনীমুখুজ্জে আহারাদি সারিয়া দিবানিদ্রা দিতেছিলেন, বাহিরে শোরগোল শুনিয়া আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি খুব সন্তুষ্ট হইলেন না। মুখে বলিলেন, কে, যদুদা? সঙ্গে কে? বউদি? বেশ, বেশ—তা এতকাল পরে মনে পড়েছে যে! না, ভাল না, বাড়ির সবার অসুখ ব্যায়রাম। আপনার বউমা তো কাল জ্বর থেকে উঠেছে—ছেলে দুটোর এমনপাঁচড়া যে পঙ্গু হয়ে বসে থাকে—ও পুঁটি—ওগো—এই বউদিদি এসেছেন, নামিয়ে নাও—

রাত্রে যদুবাবু দেখিলেন, থাকিবার ভীষণ কষ্ট। ইহাদের দুইটি মাত্র ঘর আর এক ভাঙা পূজার দালান, তার একখানায় কাঠকুটা রহিয়াছে। একটি ঘরে ভদ্রতা করিয়া আজিকার জন্য থাকিবার জায়গা দিয়াছে বটে, কিন্তু বেশিদিনের জন্য এ ব্যবস্থা সম্ভব নয়, কারণ অবনীরতিনটি বড় মেয়ে, দুইটি ছেলে, স্ত্রী ও এক বিধবা দিদিকে লইয়া পাশের ওই একখানি মাত্র ঘরে কতদিন থাকিতে পারিবে ?

দুই দিন গেল, এক সপ্তাহ গেল। গরমে বড় কষ্ট হয়—সেকেলে কোঠার ছোট ছোট জানালা, হাওয়া চলে না।

অবনীদের সংসারে প্রথম দুই দিন এক হাঁড়িতেই খাওয়া চলিয়াছিল, তারপর যদুবাবুর আলাদা রান্না হয়। জিনিসপত্র সস্তা, এক সের করিয়া দুধ যোগান করা হইয়াছে—বেশ খাঁটি দুধ।

যদুবাবুর স্ত্রী বলে, এমন দুধ, যাই বল, শহরে বেশি পয়সা দিলেও মিলবে না।

কিন্তু দিন-পনেরো পরে থাকিবার বড় অসুবিধা হইতে লাগিল। অবনী একদিন ঘুরাইয়া কথাটা বলিয়াই ফেলিল। অর্থাৎ দেশ তো দেখা হইয়াছে, এবার যাইবার কী ব্যবস্থা? ভাবখানাএই রকম।

রাত্রে যদুবাবু স্ত্রীকে নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, অবনী তো বলছিল, আর ক'দিন আছেন দাদা? : তা কী করি বল তো? এই গরমে কলকাতায়—

স্ত্রী বলিল, চলো এখান থেকে বাপু। নানান অসুবিধে। মন টেকে না। বাবাঃ, যে জঙ্গল!ঘরদোরগুলো ভাল না, ছাদ যেমন—একটু বিষ্টি হলেই জল পড়বে। আর ওরাও আর তেমন ভাল ব্যবহার করছে না। আজ ঘাটে বড়দিদি কাকে বলছিল—আমাদের বাড়ি তো আর শরিকের ভাগ নেই, যে যেখানে আছে হুট করে এলেই তো হল না! এই রকম কী কথা ! আমাদের যাওয়াই ভাল। যে মশা, রাত্তিরে ঘুম হয় না মশার ডাকে।

যদুবাবুর তাহা ইচ্ছা নয়। স্ত্রীকে এবার শরিকের ঘাড়ে কিছুদিন চাপাইয়া যাইবেন, এইমতলব লইয়াই এখানে আসিয়াছেন। তিনি কিছু বলিলেন না।

আর দুই-তিন দিন পরে যদুবাবু ফিরিবেন মনস্থ করিলেন।

অবনীকে বলিলেন, তোমার বউদিদি রইল এ মাসটা, দিদির সঙ্গে শোবে। আমার কলকাতায় না গেলে নয়, আমি পরশু নাগাদ যাই।

গ্রামের কাপালীপাড়া হইতে সিধু কাপালী আসিয়া বলিল, দাদাঠাকুর, ও গাঁয়ে একটা পাঠশালা খুলে বসুন। পঁচিশ-ত্রিশটা ছেলে দেব—চার আনা আট আনা করে রেট। আপনার বাড়ি বসে যা হয়! কলকাতা ছেড়ে দিয়ে এখানেই থেকে যান না কেন?

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন, কলকাতার স্কুলে পঁচাত্তর টাকা মাইনে পাই—সত্তর ছিল, ছেড়েদেব বলে ভয় দেখিয়েছিলাম, অমনি সেক্রেটারি পাঁচ টাকা বাড়িয়ে বললে—যদুবাবু, আপনারমতো টিচার আর কোথায় পাব, আপনি থাকুন। প্রাইভেট টুইশানিতে তাও ধরো পাই—পনেরোআর পঁচিশ সকালে-বিকেলে পনেরো আর কুড়ি। এই ছেড়ে আসব পাঠশালা খুলে চার আনা আট আনা নিয়ে ছেলে পড়াতে? তুমি হাসালে সিদ্ধেশ্বর!

অবনী সেখানে উপস্থিত ছিল। যদুদাদা যে স্কুলে এত মাহিনা পান, এই সে প্রথম শুনিল।কিন্তু কই, তেমন তো আসবাব বাসনপত্র কিছুই নাই! বউদিদি মোটে চারখানা শাড়িআনিয়াছেন। দাদার দুইটি মলিন পিরান, গায়ে ভাল গেঞ্জি একটাও দেখা যায় না। বিছানা তোযা আনিয়াছেন, তাহা দেখিয়া একদিন অবনীর স্ত্রী বলিয়াছিল—বট্‌ঠাকুরের যা বিছানাপত্র, ওই বিছানায় কী করে ওরা শোয় কলকাতা শহরে, তা ভেবে পাইনে। আমরা যে অজ-পাড়াগেঁয়ে—আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত ও-বিছানায় শোবে না।

গ্রামের সকলে ধরিয়াছিল, এতকাল পরে দেশে এসেছ, গাঁয়ের ব্রাহ্মণ ক'টিকে ভাল করেএকদিন মা-বাপের তিথিতে খাইয়ে দাও। কিছুই তো করলে না গাঁয়ে—

যদুবাবু তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

অথচ তিনি এত রোজগার করেন নিজের মুখেই তো বললেন। কী জানি কী ব্যাপারশহরের লোকের! বেশ মোটা পয়সা হাতে নিয়ে এসেছে দাদা, অথচ খরচপত্র বিষয়ে কঞ্জুস—

কথাটা অবনী স্ত্রীকে বলিল।

স্ত্রী বলিল, কী জানি বাপু, দিদির গায়ে তো একরত্তি সোনা নেই শাঁখা আর কাচের চুড়িএই তো দেখছি, তা কেমন করে বলব বলো? হতে পারে।

—তুমি জানো না, ওসব কলকাতার লোক, পাড়াগাঁয়ে আসবার সময়ে সব খুলে রেখেএসেছে। চুরি যাবার ভয় বড্ড ওদের।

ভাবিয়া-চিন্তিয়া পরদিন অবনী যদুবাবুর কাছে দুপুরের পর কথাটা পাড়িল : দাদা, একটাকথা ছিল—

—কী হে?

—নানা রকমে বড় জড়িয়ে পড়েছি, মেয়েটা বড় হয়ে উঠেছে, বিয়ে না দিলে আর নয়।বড়দা সেই সোনাঙ্গতির মোকদ্দমা করে আড়ালে বিল বিক্রি করে ফেললেন, জানেন তো সব।সেই নিজে মারাও গেলেন, আমাকে একেবারে পথে বসিয়ে গেলেন। পয়সা অভাবে ছেলেটাকেপড়াতে পারছি না। তা আমি বলচি কী, ছেলেটাকে আপনার বাসায় রেখে যদি দুটো খেতে দেনআর আপনার স্কুলে ফ্রী করে নেন দয়া করে, তবে গরিবের ছেলের লেখাপড়াটা হয়। আপনিও তো ওর জ্যাঠামশায়—

যদুবাবু বুঝিলেন, মাহিনা সম্বন্ধে ও-রকম বলা উচিত হয় নাই তখন। পাড়াগাঁয়েরগতিক ভুলিয়া গিয়াছেন বহুদিন না আসার দরুন। এসব জায়গার লোকে সর্বদা সুবিধাখুঁজিয়া বেড়াইতেছে, চাহিতে-চিন্তিতে ইহাদের দ্বিধা নাই, লজ্জা নাই। কী বিপদেই ফেলিলএখন!

মুখে বলিলেন, তা আর বেশি কথা কী! সুঁটো থাকবে, এ ভাল কথাই তো! তবে এখনস্কুলে ভর্তি করার সময় নয়, সামনের জানুয়ারি মাসে নিয়ে যাব ওকে।

অবনী পল্লীগ্রামের লোক, পাইয়া বসিল। বলিল, তা কেন দাদা, বউদিদির সঙ্গেই যাক না।বাসায় থাকুক, সকালে বিকেলে আপনার কাছে একটু-আধটু পড়লেও ওর যথেষ্ট বিদ্যে হবেপেটে। বংশের মধ্যে আপনি এল-এ পাস করেছেন—আমাদের বংশের চূড়ো আপনি। আমরা সব মুখ্যু-সুখ্যু। দেখুন, যদি আপনার দয়ায় একটু-আধটু ইংরিজি পেটে যায় ওর, পরে করে খেতে পারবে।

যদুবাবু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, তা—তা হবে। বেশ—বেশ।

স্ত্রীকে রাত্রে কথাটা বলিলেন। স্ত্রী বলিল, কে, ওই সুঁটো? ওই দেখতে পিলেরোগা পেটমোটা, ও আধসের চালের ভাত খায়! সেদিন একটা কাঁটাল একলা খেলে। ওর পেছনে, যা মাইনে পাও, সব যাবে। তা তুমি কিছু বলেচ নাকি?

—বলেচি বলেচি! কী আর করি! তোমাকে নিয়ে যাবার সময় এখন ছিনেজোঁকের মতোধরে না বসে! ওসব লোককে বিশ্বাস নেই রে বাবা!

—কেন, বাহাদুরি করতে গিয়েছিলে যে বড়! এখন সামলাও ঠ্যালা!

যদুবাবুকে আরও বেশি মুশকিলে পড়িতে হইল। যেদিন তিনি যাইবেন, সেদিন অবনীআসিয়া কুড়ি টাকা ধার চাহিয়া বসিল। না দিলে চলিবে না, সামনের মাসে সে বউদিদির হাতেকড়ায়-গণ্ডায় শোধ করিয়া দিবে। এখন না দিলে জমিদারের নালিশের দায়ে আমন ধানের জমাবিক্রয় হইয়া যাইবে। সে (অবনী) তাহাকে বড় দাদার মতো দেখে, তিনি না দিলে এ বিপদেরসময় সে কোথায় দাঁড়ায়, কাহার কাছে বা হাত পাতে?

অবনী একেবারে যদুবাবুর পা জড়াইয়া ধরিল। দিতেই হইবে, যদুবাবুর বউমা পর্যন্ত নাকি বট্‌ঠাকুরের কাছে আসিবার জন্য তৈয়ারি হইয়া আছে টাকার জন্য।

যদুবাবু প্রমাদ গণিলেন। এমন বিপদে পড়িবেন জানিলে তিনি সিধু কাপালীকে কি ওকথা বলেন ? বলিলেন, তা একটা কথা। টাকাকড়ি ভায়া এখানে কিছু রাখিনি তো! সব ব্যাঙ্কে। তোমার বউদিদি বললে, পাড়াগাঁয়ে যাচ্ছ—সোনাদানা টাকাকড়ি সব এখানে রেখে যাও। হাতে কেবল যাবার ভাড়াটা রেখেছি ভায়া।

—আজই যাবেন ?

—হ্যাঁ, এখুনি, খাওয়া হলেই বেরুব। আজই দশটার গাড়িতে—

যদুবাবু মনে মনে বলিলেন, যাও বা থাকতাম আজকের এ বেলাটা হয়তো, আর এক দণ্ডও এখানে থাকি! এখন বেরুতে পারলে হয় এখান থেকে!

কিন্তু অবনী মুখুজ্জে অভাবগ্রস্ত পাড়াগাঁয়ের লোক, তাহাকে তিনি চেনেন নাই কিংবাচিনিয়াও ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

অবনী বলিল, বেশ দাদা, চলুন আমিও আপনার সঙ্গে কলকাতা যাই তবে। না হয়যাতায়াতে সাত সিকে পয়সা খরচ হয়ে গেল, টাকাটা এনে জমিদারের দায় থেকে তো বেঁচে যাব এখন! সাত সিকে খরচ বলে এখন কী করব, না হয় গুনগার গেল!

যদুবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, তুমি কেন গাড়িভাড়া করে যেতে যাবে? আমি গিয়েই মনিঅর্ডার করে পাঠাব। তা ছাড়া আজ—আজ আমি, কি বলে—একটু হালিশহরে নামব কিনা।আমার বড় শালীর বাড়ি। তারা কি গেলেই আজ ছাড়বে? এক-আধ-দিন রাখবেই। তুমিমিছিমিছি পয়সা খরচ করবে, অথচ সেই দেরি হয়েই যাবে।

অবনী বলিল, ভালই তো, চলুন না হয় বউদিদির বোনের বাড়ি দেখেই আসি। গাঁয়েথাকি পড়ে, কুটুমবাড়ির ভালটা মন্দটা না হয় খেয়েই আসি দু’দিন।

কোথায় যাইবে অবনী তাহার সঙ্গে। তিনি এখন শ্রীশের মেসে গিয়া উঠিবেন। যদুবাবু কী যে বলেন, উপস্থিত বুদ্ধিতে আর কুলায় না। আকাশ-পাতাল ভাবাও যায় না সামনে দাঁড়াইয়া।বলিলেন, বেশ, বেশ, এ তো খুব ভাল কথা, তোমার মতো কুটুম্ব যাবে আমার শালীর বাড়ি।তবে একটা কথাও ভাবছি আবার, যদি কলকাতায় গিয়ে আমাদের স্কুলের হেডমাস্টারের দেখা নাপাই!

—হেডমাস্টার! কেন দাদা?

যদুবাবু এতক্ষণে ভাবিয়া বলিবার একটা রাস্তা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। বলিলেন, হেডমাস্টারের কাছে ব্যাঙ্কের বইখানা রয়েছে কিনা! হেডমাস্টার না থাকলে টাকা তুলব কীকরে!

—কারও কাছে চাইলে আপনি দু'দিনের জন্যে ধার পেয়ে যাবেন দাদা। আপনার কত বন্ধুবান্ধব সেখানে! এ দায় উদ্ধার করতেই হবে আপনাকে! দিন একটা উপায় করে!

—অবিশ্যি তা পেতাম। কিন্তু আমার যে বন্ধুবান্ধব এখন গরমের সময় কেউ নেই কলকাতায়, দার্জিলিং কি সিমলে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছে গরমের সময়। কলকাতার বড়লোক উকিল ব্যারিস্টার সব—গরমের সময় সব পাহাড়ে চলে যাবে, এ কি তুমি-আমি!

—তাই তো দাদা, তবে আমার কী উপায় হবে?—অবনী মুখুজ্জে প্রায় কাঁদো কাঁদো হইয়াপড়িল।

যদু বলিলেন, কিছু ভেবো না ভায়া। আমি যাচ্ছি কলকাতায় গিয়ে একটা যা হয় হিল্লেলাগিয়ে দেব। কেন তুমি পয়সা খরচ করে অনর্থক যাবে আমার সঙ্গে ? আমি চেষ্টা করে দেখেমনিঅর্ডার করে দেব হাতে পেলেই। আচ্ছা চলি, দুটো খেয়ে নিই—আর দেরি করা চলে না।

যদুবাবু ঝড়ের বেগে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। মনে মনে বলিলেন, উঃ, কী ছিনেজোঁক রেবাবা! কিছুতেই বাগ মানে না, এত করে ভেবে-ভেবে বলি! ভাগ্যিস মনে এল হেডমাস্টারের কাছে ব্যাঙ্কের খাতার ওই ফন্দিটা!

টিনের সুটকেস হাতে ঝুলাইয়া যদুবাবু তাড়াতাড়ি দুইটি খাইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, পাছে অবনী তাহার মত বদলাইয়া ফেলে! কী ঝঞ্ঝাট, এখন মেসে বসাইয়া উহাকে ফ্রেন্ডচার্জ দিয়া খাওয়াও, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখাও—কোথায় বা ব্যাঙ্ক, আর কোথায় বা টাকা!

যদুবাবু শ্রীশ রায়ের মেসে আসিয়া উঠিবার পরে অবনী মুখুজ্জের পর পর তিন-চারিখানি তাগাদার চিঠি পাইলেন। তিনি উত্তর লিখিয়া দিলেন, হেডমাস্টার অনুপস্থিত—টাকা ধারেরকোনো উপায় হইল না, সেজন্য তিনি খুব দুঃখিত। তবুও চেষ্টায় আছেন। যদুবাবুর স্ত্রী বেচারিরখোঁটা খাইতে খাইতে প্রাণ যাইতেছে। সে বেচারি লিখিল, পরের বাড়ি এমন করিয়া ফেলিয়ারাখা কি তাহার উচিত হইতেছে? কবে তিনি আসিয়া লইয়া যাইবেন? আর সে এক দণ্ডওএখানে থাকিতে চায় না!

যদুবাবু স্ত্রীর পত্রের কোনো উত্তর দিলেন না।

যদুবাবুরও খুব দোষ দেওয়া যায় না। স্কুল খুলিবার পর প্রত্যেক মাস্টার মাত্র পনেরোটাকা করিয়া পাইলেন ছুটির মাসের দরুন। তাহার মধ্যে মেসখরচ করিয়া আর হাতে কিছু থাকেনা। এদিকে পুরাতন বাড়িওয়ালা স্কুলে আসিয়া তাগাদা দিয়া গায়ের ছাল ছিঁড়িয়া খাইবারউপক্রম করিতেছে। হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করিবার ভয় দেখাইয়া গিয়াছে, কেমন ভদ্রলোকসে দেখিয়া লইবে।

চায়ের দোকানের মজলিসে বসিয়া মাস্টারের দল পয়সাকড়ির টানাটানির কথা রোজই আলোচনা করে। কারণ, অবস্থা সকলেরই একরূপ। জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, সামান্য ত্রিশটেটাকা, তাও দু মাস বাকি। সাহেবের কাছে বলতে গেলাম, সাহেব আজ দু' টাকা দিলে মোটে।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমাদেরও তো তাই, সংসার অচল।

যদুবাবু বলিলেন, আমার দুর্দশা তো দেখতেই পাচ্ছ। দু' বেলা শাসিয়ে যাচ্ছে।ক্ষেত্রভায়া, তোমার ছেলেমেয়ে কোথায় এখন?

—রেখেছিলাম আমার শাশুড়ির কাছে দু'মাস। এখন আবার এনেছি।

নারাণবাবু বলিলেন, আহা, বউমার কথা ভাবলে কী কষ্ট যে পাই মনে। লক্ষ্মীস্বরূপিণী ছিলেন। আমি যেন তার বাবা, তিনি মেয়ে—এমন ব্যবহার করতেন আমার সঙ্গে।

উপস্থিত সকলেই ক্ষেত্রবাবুর স্ত্রী-বিয়োগের কথা স্মরণ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

ক্ষেত্রবাবু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। তাহার নিগুঢ় কারণও ছিল। এই গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি বর্ধমানে তাহার জাঠতুতো ভাইয়ের কাছে গিয়াছিলেন। জাঠতুতো ভাই বর্ধমানে রেলে কাজকরেন। বউদিদি সেখানে তাহার জন্য একটি পাত্রী ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। পাত্রীপক্ষ এজন্য তাঁহাকে অনুরোধও করিয়া গিয়াছে। তিনি এখনও মত দেন নাই বটে, কিন্তু এ শনিবার হঠাৎ তাহার মন বর্ধমানে যাইতে চাহিতেছে কেন!

চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া টুইশানিতে যাইবার পূর্বে ক্ষেত্রবাবু ওয়েলেস্‌লি স্কোয়ারে একটু বসিলেন। বেঞ্চিখানাতে আর একজন কে বসিয়া ছিল, তিনি বসিতেই সে উঠিয়াগেল। ক্ষেত্রবাবু একটু অন্যমনস্ক! পুনরায় বিবাহ করিবার অবশ্য তাঁহার ইচ্ছা নাই। করিবেনওনা। তবে আর একটা কথাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিশেষ কষ্ট।সেই কোন্ সকালে তিনি স্কুলে চলিয়া আসিয়াছেন। বড় মেয়েটার উপরে সব ভার—তার বয়সএই মাত্রসাড়ে সাত। সে-ই রান্নাবান্না, ছোট ভাই-বোনদের খাওয়ানো-মাখানোর ঝুঁকি ঘাড়েলইয়া গৃহিণী সাজিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু আজ যদি একটা শক্ত অসুখবিসুখ হয় কাহারও—কেদেখাশোনা করিবে তাহাদের? এ সব ভাবিয়া দেখিবার জিনিস।

স্কুলের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হইয়া আসিতেছে। গ্রীষ্মের ছুটির পর দুই মাস চলিয়া গিয়াছে, অথচ ছুটির মাহিনা এখনও সম্পূর্ণ শোধ হয় নাই। সাহেবকে বার বার বলিয়াও কোনো ফল হয়না। সাহেবের এক কথা, এ বছর কষ্ট সহ্য করিতে হইবেই। যাহার না পোষায়, সে চলিয়া যাইতেপারে।

একদিন সাহেবের সারকুলার-অনুযায়ী ছুটির পর সাহেবের আপিসে শিক্ষকদের হাজিরহইতে হইল। সাহেব বলিলেন, আজ একটা বিশেষ জরুরি মিটিং করা দরকার। থার্ড ক্লাসেগণিতের ফল আদৌ ভাল হইতেছে না, এ বিষয়ে শিক্ষকদের লইয়া পরামর্শ করা নিতান্ত আবশ্যক।

মিটিং চলিল। হতভাগ্য টিচারের দল খালিপেটে শ্রান্তদেহে পাঁচটা পর্যন্ত নানারূপ কৌশল উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত রহিল—থার্ড ক্লাসে কী করিয়া অ্যালজেব্রা ভালরূপে শিখানো যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন বৈদেশিক শক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করিলে ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী এতদপেক্ষাঅধিক আগ্রহ ও উদ্যোগ দেখাইতে পারিতেন না তাহার ক্যাবিনেট মিটিংয়ে!

পাঁচটা বাজিয়া গেল। তখনও প্রস্তাবের অন্ত নাই। থার্ড ক্লাসের গণিত শিক্ষার ভারপ্রাপ্তটিচার হতভাগ্য শেখরবাবু ম্লানমুখে বসিয়া শুনিয়া যাইতেছেন, কারণ এ অবস্থার জন্য তিনিই ধর্মত দায়ী। তাহার দপ্তরেই এ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। উক্ত ক্লাসের গত দুইটি সাপ্তাহিক পরীক্ষায়গণিতের ফল আদৌ আশাপ্রদ হয় নাই।

সাড়ে পাঁচটার সময় হেডমাস্টার উঠিয়া ধীরে ধীরে গণিতশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধেগুরুগম্ভীর প্রবন্ধ পাঠ শুরু করিলেন—খাতার বহর দেখিয়া মনে হইল, সাড়ে ছয়টার কমে সে প্রবন্ধ শেষ হইবে না।

হঠাৎ নতুন টিচার দাঁড়াইয়া বলিলেন, স্যার, আমার একটা কথা বলবার আছে।

হেডমাস্টার প্রবন্ধ পাঠ করিতেছিলেন, থামিয়া মুখ তুলিয়া বিস্মিতভাবে নতুন টিচারেরদিকে চাহিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ইয়েস?

—স্যার, ছ'টা বাজে, মাস্টারেরা সকলেই ক্ষুধার্ত। আজ এই পর্যন্ত থাকলে ভাল হয়। নতুন টিচারের সাহস দেখিয়া সবাই বিস্মিত ও স্তম্ভিত।

হেডমাস্টার বলিলেন, জানো মাস্টার, আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে কোনো বাধাসৃষ্টি পছন্দ করি না?

—স্যার, আমায় ক্ষমা করবেন। স্পষ্ট কথা বলবার সময় এসেছে। আপনার এ রকম মিটিং মাস্টারদের পক্ষে বড় কষ্টদায়ক হয়। এতে স্কুলের কাজ হয় না।

—স্কুলের কাজ কি তোমার কাছে আমায় শিখতে হবে?

—আপনিই ভেবে দেখুন, এতে স্কুলের কী ভাল হচ্ছে? ছাত্র ছেড়ে গিয়েছে, রিজার্ভফন্ড নেই, মাইনে পাই না আমরা নিয়মমত। অথচ আপনি এই সব শিক্ষককে নিয়েআলোচনা-সভার প্রহসন করচেন। আপনিই ভেবে দেখুন, এতে কী উপকার হয়? এই সবটিচার মুখ ফুটে বলতে পারেন না; কিন্তু চারটের পর আপনি এঁদের কাছ থেকে ভাল কিছুআশা করতে পারেন কি?

এবার হেডমাস্টারের পালা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবার। একজন সামান্য বেতনের টিচারেরকাছে তিনি এ ধরনের সোজা ও স্পষ্ট কথা প্রত্যাশা করেন নাই। বলিলেন, আমি কতদিনহেডমাস্টারি করছি, তা তোমার জানা আছে?

—তা আমার জানবার দরকার নেই স্যার। কিন্তু আপনার এই শাসনপ্রণালী যে আদৌ ফলপ্রদ নয়, তা আপনাকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়াতে আপনি আমায় শত্রু ভাববেন না। আমি বন্ধুভাবেই এ কথা বলছি। আপনাকে সদুপদেশ দেওয়ার লোক নেই।

মাস্টারেরা সকলে কাঠের মতো বসিয়া আছেন। এমন একটা ব্যাপার তাহারা কখনও এস্কুলে ঘটিতে পারে বলিয়া কল্পনাও করেন নাই। দুই-চারিজন সপ্রশংস দৃষ্টিতে নতুন টিচারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নতুন টিচার যে এমন চোস্ত ইংরেজি বলিতে পারদর্শী—এতথ্য আজইতাহারা অবগত হইলেন।

হেডমাস্টারের মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, তুমি কি বলতে চাও আমি স্কুলচালাতে জানিনে?

নতুন টিচার কী একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে নারাণবাবু নতুন টিচারকে বলিলেন, ভায়া, ছেড়ে দাও! আর তর্ক-বিতর্ক কোরো না! সাহেব যা বলছেন, ওনার ওপর আরকথা বোলো না!

আশ্চর্যের বিষয়, সেই সভাতেই সাহেবের সামনে দুই-তিনজন টিচার, তাঁহাদের মধ্যে ক্ষেত্রবাবু ও শ্রীশবাবু আছেন—নারাণবাবুর মধ্যস্থতা করিতে যাওয়ায় স্পষ্টতই বিরক্তি প্রকাশ করিলেন।

পিছন হইতে হেডমৌলবী বলিল, আহা, বলতে দ্যান ওনাকে নারাণবাবু, বাধা দেবেননা।

আলম বেঞ্চির কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, মুখে কথাটি নাই।

নতুন টিচার বলিলেন, স্যার, আপনি ভেটারান্ হেডমাস্টার, স্কুল চালাতে জানেন না, তাই কি বলছি? কিন্তু আপনি স্কুলের বাজেট দেখে ব্যয়সঙ্কোচের ব্যবস্থা করুন, দু'মাসের মাইনে পাননি যে সব মাস্টার, তাঁদের নিয়ে ছ'টা পর্যন্ত মিটিং করা চলে কি স্যার?

নারাণবাবু বলিলেন, থামো ভায়া, থামো!

দুই-তিনজন টিচার একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, নারাণদা, ওঁকে বলতে দিন।

হেডমাস্টার দেখিলেন, সভার সমবেত মত তাহারই বিরুদ্ধে—নতুন টিচারের সপক্ষে।

তাঁহার নিজের স্কুলে বসিয়া এই তাঁহার প্রথম পরাজয়।

একটা দুর্বল কথা তিনি হঠাৎ বলিয়া বসিলেন। বলিলেন, কেন, চারটের পর আমিমাস্টারদের জন্যে জলখাবারের ব্যবস্থা তো করে দিই! আজ যদি তোমাদের খিদে পেয়ে থাকে, আমাকে আগে জানালেই আমি ব্যবস্থা করতাম!

সকলেইবুঝিল,হেডমাস্টারের এ উক্তি দুর্বলতাজ্ঞাপক।

নতুন টিচার বলিলেন, সামান্য দু-চারখানা লুচি জলখাবারের কথা ধরিনি স্যার! সে যাঁরাখেতে চান, তাঁরা খেতে পারেন। আমার বলবার উদ্দেশ্য, মাস্টারদের ওপর নানা দিক থেকেঅন্যায় হচ্ছে—আপনি এর প্রতিকার করুন।

হেডমাস্টার যে আদৌ দমেন নাই, ইহা দেখাইবার জন্য মুখখানাতে গর্বসূচক হাসিআনিয়া সকলের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া বলিলেন, শীগ্‌গির তোমরা আমার মতলব জানতে পারবে স্কুলের উন্নতি সম্বন্ধে।—বলিয়াই চশমাটি খুলিয়া ধীরভাবে মুছিয়া ফেলিতে ফেলিতেকৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, আচ্ছা, এখন আমরা আমাদের প্রবন্ধ পাঠ আরম্ভ করি—কোন্ পর্যন্ত পড়েছিলাম তখন ? দেখি—

এমন ভাব দেখাইবার চেষ্টা করিলেন, যেন নতুন টিচারের মন্তব্য তিনি গায়েই মাখেননাই। ও-রকম বহু অর্বাচীনের উক্তি তিনি বহুবার শুনিয়াছেন, কিন্তু ওসব শুনিতে গেলে তাঁহারচলে না।

সাড়ে ছয়টার সময় প্রবন্ধ শেষ হইল। ইতিমধ্যে যদুবাবু কখন খাবারের টাকা লইয়াগিয়াছিলেন, কেহ লক্ষ্য করে নাই—তিন টুকরি লুচি কচুরি আলুর দম কখন আসিয়া পৌঁছিয়া গিয়াছে!

হেডমাস্টার নিজে দাঁড়াইয়া শিক্ষকদের খাওয়ার তদারক করিলেন।

নতুন টিচারের মর্যাদা যথেষ্ট বাড়িয়া গেল স্কুলে এই দিনটির পর হইতে। দোর্দণ্ডপ্রতাপক্লার্কওয়েল যার সামনে হঠাৎ নরম হইয়া সরু-সুতা কাটিতে লাগিলেন, তাহার ক্ষমতা আছে বৈকি।

মি. আলম হেডমাস্টারকে বলিলেন, স্যার, আপনার মুখের ওপর তর্ক করে, আপনি তাই সহ্য করলেন কাল? বলুন, আজই পড়ানোর ভুল ধরে রিপোর্ট করে দিচ্ছি, দিন ওর চাকরিখেয়ে।

—নতুন টিচার অত ভাল ইংরেজি বলে, আমি জানতাম না মি. আলম। আমি ওর ক্লাস ওয়ার্ক আগেও দেখেচি। তাকে খারাপ বলা যায় না ঠিক।

—স্যার, আমার কাল রাগ হচ্ছিল ওর বেয়াদবি দেখে। আর দেখলেন, মাস্টারেরা প্রায়অনেকেই ওকে সাপোর্ট করলে!

—সেটা আমিও ভেবেছি। মাস্টারেরা মাইনে ঠিকমতো পায় না বলে অসন্তুষ্ট। অসন্তুষ্টলোক দিয়ে কাজ হয় না। স্কুলের বাজেট্টা সামনের বছর থেকে ব্যালান্স না করাতে পারলে আরএরা সন্তুষ্ট হচ্ছে না।

—স্যার, কাল কোন্ কোন্ টিচার ওকে সাপোর্ট করেছিল, তাদের নাম আমি লিখেরেখেচি।

নামগুলো দিয়ো আমার কাছে।

—বলেন তো ওদের ক্লাস-ওয়ার্ক দেখি আজ থেকে। রিপোর্ট করি।

একদিন মি. আলম চুপি চুপি সাহেবের কাছে আসিয়া বলিল, স্যার, মাস্টারেরা নতুন টিচারকে নিয়ে দল পাকাচ্ছে!

—কে কে?

—স্যার, ক্ষেত্রবাবু, যদুবাবু, শ্রীশবাবু, জ্যোতির্বিনোদ, দত্ত, বোস—কেবল নারাণবাবুনয়।

—নারাণবাবু ইজ অ্যান ওল্‌ড্ লয়্যালিস্ট।

—স্যার, নতুন টিচারকে নিয়ে দল পাকায়—মোড়েই ওই চায়ের দোকানে রোজ ছুটিরপর ওদের মিটিং হয়। নতুন টিচার ওদের দলপতি।

—তোমাকে কে বললে?

—ক্লার্ক সুবল দে আমায় সব কথা বলে। ও ওদের দলে যোগ দিয়ে শুনে এসে আমায় বলেছে। আমাদের স্কুলের সম্বন্ধে ইউনিভার্সিটিতে নাকি ওরা জানাবে। নতুন টিচারের কে আত্মীয়আছে ইউনির্ভাসিটিতে!

—দেখ মি. আলম, যে যা পারে করুক। আর ও-সব স্পাইগিরি আমি পছন্দ করিনে।এটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, এর মধ্যে ও-সব দলাদলি, ডার্টি পলিটিক্স—আই হেট! আমার একমাত্রউদ্দেশ্য ছেলেদের শিক্ষা, স্কুলকে ভাল করব। গড ইজ অন মাই সাইড—

—আমার মনে হয়, ওই নতুন টিচারকে না তাড়ালে স্কুলে দলাদলি আরও বাড়বে।ও-ই ভাঙবে স্কুলটাকে। ও লোক সুবিধের নয়।

কিন্তু এ রিপোর্টে ফল উলটা হইল। সাহেবের কাছে মাস দুইয়ের মধ্যে নতুন টিচারের প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। মাস্টারেরা সব নতুন টিচারকে লিডার বানাইয়াছে, তাহাদের অভাব অভিযোগের কথা নতুন টিচারের মুখে ব্যক্ত হয় হেডমাস্টারের কাছে। আজ ইহাকে দুই টাকাআগাম দিতে হইবে, কাল 'টিচার্স এড ফন্ড' হইতে উহাকে পাঁচ টাকা ধার দিতে হইবে—নতুনটিচারকে মুখপাত্র করিয়া সবাই পাঠাইয়া দেয়।

সাহেব বলেন, কী, রামেন্দুবাবু?

—স্যার, আজ যদুবাবুকে কিছু আগাম দিতে হবে।

—কেন?-ও-মাসে দেওয়া হয়েছে সাত টাকা!

—ওঁর বড় ঠেকা। দেনা হয়েছে—

—বড় অবিবেচক লোক ওই যদুবাবু। আমি শুনেছি, ও রেস খেলে।

—না স্যার। রেস খেলার পয়সা কোথায় পাবেন? মেসে থাকেন এখানে—

মি. আলমের কানে কথাটা উঠিল। আজকাল নতুন টিচার সাহেবের কাছে মাস্টারদের জন্য সুপারিশ করে এবং তাহাতে ফলও হয়। আলম একদিন সুবল দে কেরানীকে বাহিরে একটা চায়ের দোকানে লইয়া গেলেন। বলিলেন, সুবল, এসব হচ্ছে কী?

—কী বলুন, স্যার?

—সাহেব নাকি ওই নতুন টিচারের কথা খুব শুনছেন!

—তাই মনে হয় স্যার। সেদিন জ্যোতির্বিনোদকে দু দিন ছুটি দিলেন ওঁর সুপারিশে।

—কেন, কেন?

—জ্যোতির্বিনোদের ভাগ্নীর বিয়ে।

—জ্যোতির্বিনোদের ক্যাজুয়াল লিভের হিসেবটা চেক করে কাল আমায় জানিও তো।বুঝলে?

—বেশ, স্যার।

—স্কুলে যা-তা হচ্ছে, না?

কেরানী চুপ করিয়া রহিল। কেরানী মানুষ, বড় টিচারের সামনে যা-তা বলিয়া কি শেষেবিপদে পড়িবে? মি. আলম বলিলেন, তোমার কি মনে হয়?

—স্যার, আমরা চুনোপুঁটির দল, আমাদের কিছু না বলাই ভাল।

—নতুন টিচার বড় বাড়িয়েচে, না?

—হুঁ। তবে একটা কথা—

—কী?

—স্যার, নতুন টিচার রামেন্দুবাবু কিন্তু লোকের অসুবিধে বা উপকার এই ধরনের ছাড়াঅন্য কথা নিয়ে সাহেবের কাছে যায় না।

—তুমি কি করে জানলে?

—আমি জানি স্যার। সেই জন্যেই মাস্টারবাবুরা ওর খুব বাধ্য হয়ে পড়েছেন।

—থাক। তোমায় আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। তুমি কাল জ্যোতির্বিনোদের ক্যাজুয়াল লিভটা চেক করে আমায় জানাবে, কেমন তো?

—হ্যাঁ স্যার, তা করে দেব। বলেন তো আজই দিই।

—কালই দেবে।

পরদিন হিসাব করিয়া ধরা পড়িল, জ্যোতির্বিনোদের তিন দিন ছুটি বেশি লওয়া হইয়া গিয়াছে এ বছর। মি. আলম সাহেবের কাছে রিপোর্ট করিলেন। জ্যোতির্বিনোদের তিন দিনেরবেতন কাটা গেল। মি. আলম হাসিয়া নিজের দলের মাস্টারদের বলিলেন, লিডার হলেই হলনা! সব দিকে দৃষ্টি রেখে তবে লিডার হতে হয়! স্কুলটাকে এবার উচ্ছন্ন দেবে আর কি!সাহেবেরও আজকাল হয়েচে যেমন!

হেডপণ্ডিত ছুটিপ্রার্থী হইয়া সাহেবের টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়াছেন।

সাহেব মুখ তুলিয়া বলিলেন, হোয়াট পাণ্ডিট্?

—স্যার, কাল তালনবমী, টিচারেরা ও ছেলেরা ছুটি চাচ্ছে।

—টালনব—হোয়াট ইজ দ্যাট পাণ্ডিট্? নেভার হার্ড দি নেম!

—স্যার, মস্ত বড় পরব হিন্দুর। দুর্গাপুজোর নিচেই—মস্ত পরব।

সাহেব চিন্তা করিয়া বলিলেন, না পণ্ডিত, এ বছর একশো দিন ছাড়িয়েছে। ইন্সপেক্টরআপিসে গোলমাল করবে। কী তুমি বলছ— টাল—কী ?

—তালনবমী।

—ফানি নেম! যাই হোক, এতে ছুটি দেওয়া চলে না।

হেডপণ্ডিত মাস্টারদের শেখানো ইংরেজি আওড়াইয়া বলিলেন, নেক্সট টু দুর্গাপূজাসার—গ্রেট্—গ্রেট্—ইয়ে—

'ফেস্টিভ্যাল' কথাটা ভুলিয়া গিয়াছেন, অত বড় কথা মনে আনিতে পারিলেন না। '

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, ইয়েস, আণ্ডারস্ট্যাণ্ড্—ইউ মিন ফেস্টিভ্যাল—আমি বুঝেছি। হবে না। ক্লাসে পড়াওগে যাও।সকলেই জানিল, ছুটি হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ঠিক শেষ ঘণ্টায় মথুরা চাপরাসীকে সারকুলার-বই লইয়া ক্লাসে ক্লাসে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে দেখা গেল। তালনবমীর ছুটি হইয়া গিয়াছে।

মনে সকলেরই খুব স্ফুর্তি। জ্যোতির্বিনোদের ঘরে ছাদের উপর অনেকে আড্ডা দিতেগেলেন। জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, বাব্বা, কাল সেই পাগল বউটার কী কাণ্ড রাত্রে !

হেডপণ্ডিত বলিলেন, কী হয়েছিল ?

—আরে, কখনও কাঁদে কখনও হাসে! রাত্রে ছাদে কতক্ষণ বসে রইল! ওঁর দুই দেওর এসে শেষে ধরে নিয়ে গেল। মারলেও যা!

নারাণবাবু বলিলেন, বড় কষ্ট হয় মেয়েটার জন্যে। ওর অদৃষ্টই খারাপ।

যে বাড়ির বধূর কথা বলা হইতেছে, বাড়িটা বেশ বড়লোকের, স্কুলের পশ্চিম দিকে, গতছয় মাসের মধ্যে বাড়িটাতে অনেকগুলি বিবাহ হইয়াছিল খুব জাঁকজমকের সঙ্গে। সেই হিড়িকেএই মেয়েটিও বধূরূপে ও-বাড়িতে

ঢোকে, কারণ তাহার পূর্বে মাস্টারেরা আর কোনোদিন উহাকে দেখেন নাই ও-বাড়িতে। কিন্তু বিবাহের মাসখানেক পর হইতেই বধূটি কেন যে পাগল হইয়া গিয়াছে, তাহা ইঁহারা কী করিয়াই জানিবেন! তবে বধূটি যে আগে ভাল ছিল, এ ব্যাপার ইঁহারা স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, হ্যাঁ হে, সেই পার্শী মেয়েটাকে আর তো দেখা যায় না ও-বাড়িতে!

শ্রীশবাবু বলিলেন, ও-বাড়িতে অন্য ভাড়াটে এসে গিয়েছে। তারা চলে গিয়েছে।

—কি করে জানলে ?

—এই দিন-পনেরো থেকে দেখছি, ছাদে বাঙালি মেয়ে গিন্নি পুরুষমানুষ ঘোরে।

পার্শী মেয়েটিকে ইঁহারা সকলেই প্রায় দুই বছর ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছিলেন। তাহারআগে বছর পাঁচেক ও-বাড়িতে অন্য ভাড়াটে দেখিয়াছিলেন। মেয়েটি ছাদের লোহার চৌবাচ্চার ছায়ায় বসিয়া একমনে পিঠের উপর বেণী ফেলিয়া বসিয়া পড়িত—যেন সাক্ষাৎ সরস্বতীপ্রতিমা। কোনো স্কুল বা কলেজের ছাত্রী হইবে। দুপুরে বা বিকালে শতরঞ্জির উপর একরাশ বইছড়াইয়া পড়িত—কী একাগ্র মনে পড়িত!

তাহাকে লইয়া মাস্টারদের কত জল্পনা-কল্পনা !

—আচ্ছা, ও কি স্কুলের ছাত্রী ?

—কিন্তু ওর বয়েস হিসেবে কলেজের বলেই মনে হয়।

—খুব বড়লোক, না?

—এমন আর কী! ফ্ল্যাট নিয়ে তো থাকে। ওদের চাল খুব বেশি—পার্শী জাতটার—

—বিয়ে হয়েছে বলে মনে হয়?

এই রকম কত কথা! সে তরুণী পার্শী ছাত্রীটি বিবাহিতা হইলেই বা কাহার কী, না হইলেইবা তাহাতে মাস্টারদের কী লাভ! তবুও আলোচনা করিয়া সুখ।

অধিকাংশ মাস্টার এ স্কুলে বহুদিন ধরিয়া আছেন—দশ, তেরো, আঠারো, বিশ বছর। এইউঁচু তেতলার ছাদ হইতে চারিপাশের বাড়িগুলিতে কত উত্থান পতন পরিবর্তন দেখিলেন।অনেকে বাড়ি যাইতে পান না পয়সার অভাবে, জ্যোতির্বিনোদ কি নারাণবাবু, কিংবা মেস্পালিত শ্রীশবাবু—গৃহস্থবাড়ির মা, বোন, মেয়ে, ইহাদের চলচ্চিত্র মাত্র অত উঁচু হইতে দেখিতেপান এবং দেখিয়া কখনও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন নিজেদের নিঃসঙ্গ জীবনের কথা ভাবিয়া, কখনওআনন্দ পান, কখনও পরের দুঃখে দুঃখিত হন; উদ্বিগ্ন হন। এই চলিতেছে বহুদিন ধরিয়া।

এ এক অদ্ভুত জীবনানুভূতি—দূর হইয়াও নিকট, পর হইয়াও আপন, অথচ যে দূর সে দূরই, যে পর সে পরই। অনেক কুশ্রী ঘটনাও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ওই লাল বাড়িটাতে নয়বৎসর আগে এক মেয়ে একটি ছেলের সঙ্গে পলাইয়া গিয়াছিল, এদিকের ওই বাড়িটাতে প্রৌঢ়াগৃহিণীকে প্রত্যেকদিন—থাক, সে সব কথায় দরকার নাই।

কত দুঃখের কাহিনীও এই সঙ্গে মনে পড়ে। ওই পুবদিকের হলদে দোতলা বাড়িটাতে আজ প্রায় সাত-আট বছর আগে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে আত্মহত্যা করে। এতদিন পরেও সে কথাটিফিনের ছুটির সময় মাঝে মাঝে উঠে। বেকার স্বামী, পরিবার প্রতিপালন করিতে না পারিয়াস্ত্রীর সঙ্গে মিলিয়া বেকার-জীবনের অবসান করে।

সে সব দিনে ক্লার্কওয়েল সাহেব ছিল না। ছিলেন সুধীর মজুমদার হেডমাস্টার।অনুকূলবাবুর পরের কথা।

হেডপণ্ডিত বলেন, অনেকদিন হয়ে গেল এ স্কুলে যদু ভায়া, কী বলো? সেই বউবাজার স্কুলভেঙে এখানে আসি—মনে পড়ে সে-কথা? হেডমাস্টারের নাম কী ছিল যেন—শশীপদ কীযেন? আমার আজকাল ভুল হয়ে যায়, নামমনে আনতে পারিনে।

যদুবাবু বলেন, শশীপদ রায়চৌধুরী। বউবাজার থেকে তারপর রানী ভবানীতেগিয়েছিলেন, মনে নেই?

—আমরা তো স্কুল ভেঙে গেলে চলে এলুম। শশীবাবুর আর কোনো খোঁজ রাখিনে।এ স্কুলে তখন অনুকূলবাবু হেডমাস্টার। ওঃ, অমন লোক আর হয় না। আমাদের নারাণদাদা সেই আমলের লোক, না দাদা?

নারাণবাবু বলেন, আমি তারও কত আগের। তুমি আর যদু এসেচ এই আঠারো বছর, আমি তারও বারো বছর আগে থেকে এখানে। অনুকূলবাবুতে আমাতে মিলে স্কুল গড়ি।

ক্ষেত্রবাবু বলেন, আপনারা গড়লেন স্কুল, এখন কোথা থেকে মি. আলম আর সাহেব এসে নবাবী করচে দেখ!

নারাণবাবু বলেন, আমি কিছু নই, অনুকূলবাবু গড়েন স্কুল। তার মতো ক্ষমতা যার-তার থাকে না। অনুকূলবাবুর মতো লোক হচ্ছে এই সাহেব। সত্যিকার ডিউটিফুল হেডমাস্টার হিসেবেসাহেব অনুকূলবাবুর জুড়িদার। লেখাপড়া শেখে সবাই, কিন্তু অন্যকে শেখানো সবাই পারে না। যে পারে, তাকে বলে টিচার। তুমি আমি টিচার নই—টিচার ছিলেন অনুকুলবাবু, টিচার হল এইসাহেব।

হেডপণ্ডিত বলেন, না, দাদা, আপনি টিচার নিশ্চয়ই। আমরা না হতে পারি—

নারাণবাবু বলেন, অত সহজে টিচার হয় না। এই শুনবে তবে অনুকূলবাবুর দু-একটাঘটনা? একবার একটা ছেলে এল, তার বাবা বর্মায় ডাক্তারি করে, দু'পয়সা পায়। ছেলেটাকে আমাদের স্কুলে দিয়ে গেল বাংলা শিখবে বলে। বর্মী ভাষা জানে, বাংলা ভাল শেখেনি।পয়সাওলা লোকের ছেলে, বদমাইশও খুব। স্কুল পালায়, বাবা মোটা টাকা পাঠায়—সেই টাকায়থিয়েটার দেখে, হোটেলে খায়, পড়াশুনোয় মন দেয় না।

—এখানে থাকে কোথায়?

—থাকে তার আত্মীয়-বাড়ি। সেই ছেলের জন্যে অনুকূলবাবুকে রাতের পর রাত বসেভাবতে দেখেচি। আমায় বললেন—নারাণ, মারধর বা বকুনিতে ওকে ভাল করা যাবে না। উপায় ভাবচি। তারপর ভেবে করলেন কী, রোজ সেই ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বারহতেন আর মুখে মুখে গল্প করতেন পাপের দুর্দশা, অধঃপতনের ফল—এই সব সম্বন্ধে। গল্প নিজেই বসে বসে বানাতেন রাত্রে। আমায় আবার শোনাতেন পয়েন্টগুলো। সেই ছেলে ক্রমেশুধরে উঠল, ম্যাট্রিক পাস করে বেরুল। তার বাবা এসে অনুকূলবাবুকে একটা সোনার ঘড়ি দেয়ছেলে পাস করলে। অনুকূলবাবু ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, আমায় এ কেন দিচ্ছেন? আমার একার চেষ্টায় ও পাস করেনি, আমার স্কুলের অন্যান্য মাস্টারের কৃতিত্ব না থাকলে আমি একা কীকরতে পারতাম? তা ছাড়া, আমি কর্তব্য পালন করেছি, ভগবানের কাছে আপনার ছেলেরজন্যে আমি দায়ী ছিলাম, কারণ আমার স্কুলে তাকে ভর্তি করেছিলেন। সে দায়িত্ব পালন করেছি, তার জন্যে কোনো পুরস্কারের কথা ওঠে না।—আজকাল ক'জন শিক্ষক তাদের ছাত্রের সম্বন্ধেএকথা ভাবেন বলুন দিকি? আদর্শ শিক্ষক বলতে যা বোঝায়, তা ছিলেন তিনি। আমাদেরসাহেবকে দেখি, অনেকটা সেইরকম ভাব আছে ওঁর মধ্যে।

ক্ষেত্রবাবু ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, দাদা, এতক্ষণ অনুকূলবাবুর কথা বলছিলেন, বেশ লাগছিল। আবার তার সঙ্গে সাহেবের নাম করতে যান কেন ?

নারাণবাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন, কেন করি, তোমরা জান না—আই নো এ রিয়াল টিচারহোয়েন দেয়ার ইজ ওয়ান—আমার কথা শোন ভায়া, সাহেবকে তোমরা অনেকেই চেনো নি।

শিক্ষকের দল পরস্পরের কাছে বিদায় গ্রহণ করিলেন; কারণ সকলেরই টুইশানির সময় হইয়াছে।

পূজার ছুটির মাসখানেক দেরি। স্কুলের অবস্থা খুবই খারাপ। হেডমাস্টার সারকুলার দিলেন যে, যে মাস্টারের নিতান্ত দরকার, তাহারা আসিয়া জানাইলে কিছু কিছু টাকা দেওয়া হইবে, বাকি শিক্ষকদের ছুটির পর স্কুল খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে মাহিনা লওয়ার জন্য।

স্কুলে শিক্ষকদের মধ্যে হট্টগোল পড়িয়া গেল।

যদুবাবু বলিলেন, এ সারকুলারের মানে কী হে ক্ষেত্র-ভায়া? আমাদের মধ্যে কেতালেবর আছে, যার টাকার দরকার নেই?

ক্ষেত্রবাবু কিছু জানেন না, তবে তাহার নিজের টাকার দরকার এটুকু জানেন।

শ্রীশবাবু বলিলেন, তোমার যেমন দরকার, গরিব মাস্টার—পুজোর সময় শুধুহাতে বাড়ি যেতে হবে সারা বছর খেটে—সকলেরই দরকার। রামেন্দুবাবুকে সকলে বলা যাক।

কিন্তু শোনা গেল, টাকা আদৌ নাই। আশামত আদায় হয় নাই। যা আদায় হইয়াছে,বাড়িভাড়া আর কর্পোরেশন-ট্যাক্স দিতেই হইবে, যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে নিতান্ত অভাবগ্রস্তশিক্ষকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

সেদিন টিচারদের ঘরে হঠাৎ মি. আলমের আগমনে সকলে বিস্মিত হইল। মাস্টারদেরবসিবার ঘরে মি. আলম বড় একটা আসেন না।

মি. আলমকে দেখিয়া মাস্টারেরা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। যে বসিয়াছিল সে উঠিয়া দাঁড়াইল, যে শুইয়াছিল সে সোজা হইয়া বসিল।মি. আলম হাসিমুখে চারদিকে চাহিয়া বলিলেন, বসুন, বসুন।

তারপর ধীরে ধীরে নিজের আগমনের উদ্দেশ্য পাড়িলেন। হেডমাস্টারের এই যেসারকুলার, এ নিতান্ত জুলুমবাজি। কাহার টাকার জন্য কে এখানে খাটিতে আসিয়াছে?

সকলে এ উহার মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। মি. আলম সাহেবের বিশ্বাসীলেফটেন্যান্ট, তাঁহার মুখে এ কী কথা? সাহেবের স্পাই হিসাবেও মি. আলম প্রসিদ্ধ। কে কী কথাবলিবে তাহার সামনে।

মি. আলম বলিলেন, না, সাহেবকে দিয়ে এ স্কুলের আর উন্নতি নেই। আমি আপনাদের কো-অপারেশন চাই। আমার সঙ্গে মিলে সবাই সাহেবের বিরুদ্ধে সেক্রেটারির কাছে আরপ্রেসিডেন্টের কাছে চলুন। স্কুলের যা আয়, তাতে মাস্টারদের বেশ চলে যায়। সাহেব আর মেমপুষতে সাড়ে চারশো টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। এ স্কুলের হাতি পোষার ক্ষমতা নেই। আসুন, আমরাম্যানেজিং কমিটিকে জানাই।

যদুবাবু প্রথমে কথা বলিলেন। তাহার ভাব বা আদর্শ বলিয়া জিনিস নাই কোন কালে, সুবিধা বা স্বার্থ লইয়া কারবার। তিনি বলিলেন, ঠিক বলেছেন মি. আলম। আমিও তা ভেবেচি।

মি. আলম বলিলেন, আর কে কে আমাকে সাহায্য করতে রাজী ?

জ্যোতির্বিনোদের রাগ ছিল হেডমাস্টারের উপর, বলিলেন, আমি করব।

যদুবাবু বলিলেন, আমিও।

শ্রীশবাবুও সাহায্য করিতে রাজী।

কেবল নতুন টিচার ও নারাণবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

মি. আলম বলিলেন, কী রামেন্দুবাবু, আপনি কী বলেন?

নতুন টিচার বলিলেন, আমি দু বছর প্রায় হল এ স্কুলে এসেছি, যা বুঝেছিএ স্কুলেরউন্নতি নেই। স্কুলের বাজেট যিনি দেখেছেন, তিনিই এ কথা বলবেন। মি. আলম যা বলেছেন, তা খুবই ঠিক।

—তা হলে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

—কী জন্যে সাহায্য চান?

—টু রিমুভ দি প্রেজেন্ট হেডমাস্টার! আশী টাকার হেডমাস্টার রাখলে স্কুল চলে যায়, মেমের কী দরকার? ওতে ছেলে বাড়ছে না যখন, তখন হাতি পোষা কেন? আমরা অনাহারে আছি, আর সাহেব মেম সাড়ে চারশো টাকা নিয়ে যাচ্ছে!

—ঠিক কথা।

—তবে আপনি কী করবেন ?

—আমি এতে নেই।

—কেন?

—প্রকাশ্যভাবে প্রতিবাদ করি বলে গোপনে শত্রুতা করতে পারব না, মাপ করবেন মি. আলম। তবে আমি নিউট্রাল থাকব, কারও দিকে হব না—এ কথা আপনাকে দিতে পারি।

—বেশ, তাই থাকুন। নারাণবাবু?

—আমি বুড়ো মানুষ, আমায় নিয়ে কেন টানাটানি করেন মি. আলম? আপনি জানেন, আমি নির্বিরোধী লোক। আমায় আর এর মধ্যে জড়াবেন না।

—অন্য সব টিচারের মুখের দিকে চেয়ে রাজী হোন নারাণবাবু। আপনি হেডমাস্টার, হোন, খুব খুশি হব সবাই। এঁদের মধ্যে কেউ নেই, যিনি তাতে অমত করবেন। কিংবারামেন্দুবাবু হেডমাস্টার হোন—কারও আপত্তি হবে না।

সকলে সমস্বরে এ প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

এই দিনটির পরে মি. আলমের চক্রান্ত রোজই চলিতে লাগিল। মাস্টারদের মধ্যেস্বার্থান্বেষী, প্রিন্সিপল-বিহীন যাঁহারা (যেমন যদুবাবু), মি. আলমের দলে যোগ দিয়াছেন; ক্ষেত্রবাবুও শ্রীশবাবু মনে মনে মি. আলমের দলে আছেন, মুখে কিছু বলেন না। কেবল নারাণবাবু ওনতুন টিচার রামেন্দু দত্ত নিরপেক্ষ, কোনো দলেই নাই।

ইহাদের মিটিং প্রতি দিন ছুটির পর তেতলার ঘরে হয়—নতুন টিচার ও নারাণবাবু সেখানে থাকেন না।

এই অবস্থার মধ্যে আসিল পূজার ছুটির সপ্তাহ। শনিবারে ছুটি হইবে। ছেলেরা ক্লাসে ক্লাসে ছুটির দিন শিক্ষকদের জলযোগের ব্যবস্থা করিতেছে। শিক্ষকদের মধ্যে কেহ কেহ গোপনেতাহাদের উসকাইয়া না দিতেছেন এমন নয়।

—কী রে, পড়াশুনো কিছুই হয়নি কেন? গ্রামার মুখস্থ ছিল, টাস্ক ছিল, কিছু করিসনি ? খাওয়াতে ব্যস্ত আছিস বুঝি? কি ফর্দ করলি এবার ?

ফর্দ শুনিয়া যদুবাবু উদাসীন ভাবে বলিলেন, এ আর তেমন কী হল—এবার থার্ড ক্লাসেযা করবে, শুনে এলুম—

ক্লাসের চাঁই বালকেরা সাগ্রহ কলরবে বলিয়া উঠিল, কী স্যার—কী স্যার?

—আইস্‌ক্রিম, লুচি, আলুর দম, হরি ময়রার কড়াপাকের সন্দেশ—

—স্যার, আমরাও করব আইস্‌ক্রিম।

হরি ময়রার সন্দেশ স্যার কোথায় পাওয়া যায় ?

—সে আমি তোদের এনে দেব, ভাবনা কী! পয়সা দিস আমার হাতে।

—কালই দেব চাঁদা তুলে।

—স্যার, আপনার হাতে আমরা দশ টাকা দেব, আপনি যাতে থার্ড ক্লাসের চেয়ে ভালহয়, তা কিন্তু করবেন।

থার্ড ক্লাসে গিয়া যদুবাবু বলিলেন, ওঃ, ছুটির টাস্কটা সবাই লিখেনে, ভুলে গিয়েচিএকেবারে। তোদের এবার কী বন্দোবস্ত হচ্ছে রে? কিন্তু এবার ফোর্থ ক্লাসে যা হচ্ছে, তার কাছেতোরা পারবিনে।

শ্রীশবাবু ও জ্যোতির্বিনোদ অন্য অন্য ক্লাসে উস্কাইলেন। প্রতি বৎসর ক্লাসে ক্লাসে টেক্কা দিবার চেষ্টা করে।

ছুটির পর হেডমাস্টারের ঘরে নতুন টিচার গিয়া টেবিলের সামনে দাঁড়াইলেন।

—স্যার, আপনার সঙ্গে গোপনীয় কথা আছে—কখন আসব?

—ওঃ, মি. দত্ত! তুমি সন্ধ্যার পর এসো—আজ আর টুইশানিতে যাব না।

—বেশ।

ছুটির পর প্রায় দেড় ঘণ্টা মাস্টারেরা থাকিয়া ছেলেদের সেকেন্ড টার্মিনাল পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করিলেন, প্রোগ্রেস-রিপোর্ট লিখিলেন, বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সিজিল-মিজিলকরিলেন—বড় একটা ছুটির আগেঅনেক কাজ। অথচ সকলেই জানে, ছুটির মাহিনা কেহপাইবে না। এই শারদীয় পূজার সময়ে সকলকে শুধুহাতে বাড়ি যাইতে হইবে—উপায় নাই। ইহায়ে স্বার্থত্যাগ-প্রণোদিত ব্যাপার তাহা নহে, নিরুপায়ে পড়িয়া মার খাওয়া মাত্র। এ চাকরি ছাড়িলে কোন্ স্কুলে হঠাৎ চাকরি মিলিতেছে?

সন্ধ্যার পর নতুন টিচার হেডমাস্টারের নিজের বসিবার ঘরের দরজায় কড়া নাড়িলেন।

—হ্যাঁ, এসো। কাম্ ইন্—

নতুন টিচার ঢুকিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

—বোসো মি. দত্ত, বোসো। এক পেয়ালা চা?

—না, ধন্যবাদ। এই খেয়ে আসছি। মিস্ সিবসন্ কোথায় ?

উনি আজকাল পড়াতে বেরোন। ভাল টুইশানি পেয়েছেন—পঞ্চকোটের রাজকুমারীকেএক ঘণ্টা ইংরিজি পড়াতে—

—কী কথা বলবে বলছিলে?

নতুন টিচার পকেট হইতে একটা কাগজ বাহির করিলেন। গলা ঝাড়িয়া বলিলেন, স্যার, আপনি এবার কি কিছু দেবেন না আমাদের মাইনে ?

—তোমায় তো সব দেখিয়েছি মি. দত্ত। স্কুলের আর্থিক অবস্থা তুমি আর মি. আলমজানো, আর জানে নারাণবাবু। বেশি লোককে বলে কোনো লাভ নেই। স্কুলকে বাঁচিয়ে রাখবারচেষ্টা করছি প্রাণপণে। বাড়িওলা নালিশ করবে শাসিয়েছিল—তাকে পাঁচশো টাকা দিতে হয়েছে। মিস্ সিবসনকে দেড়শো টাকা দিতে হবে, উনি দার্জিলিং যাচ্ছেন। কিন্তু তার মধ্যে মোটে পঁচাত্তর দিতে পারছি। আমি এক পয়সা নিচ্ছিনে। এ আমাদের স্ট্রাগলের বছর, এ বছর যদি সামলে উঠি—সামনের বছরে হয়তো সুদিন আসবে। সকলকেই স্বার্থত্যাগ করতে হবে, কষ্টস্বীকার করতে হবে এ বছরটাতে। বুঝলে না?

—হ্যাঁ স্যার।

—তুমি কিছু চাও? কত দরকার বলো?

—না স্যার। আমি একরকম ম্যানেজ করে নেব। ধন্যবাদ স্যার। এই ক'জনকে কিছু কিছুদিতেই হবে, যে করে হোক ম্যানেজ করুন।

নতুন টিচার হাতের কাগজ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, ক্ষেত্রবাবু কুড়ি টাকা, জ্যোতির্বিনোদ পনেরো টাকা, শ্রীশবাবু আঠারো টাকা, হেডপণ্ডিত দশ টাকা, যদুবাবু কুড়ি—

সাহেব কুইনাইন সেবনের পরের অবস্থার মতো মুখখানা করিয়া বলিলেন, ও, দীজ আর দি ট্রাবল্-মেকারস্—

—না স্যার, এঁদের না হলে চলবে না। এঁদের অবস্থা সত্যিইখারাপ—প্রত্যেকেরই বিশেষদরকার আছে। জ্যোতির্বিনোদের বাড়ি পৈতৃক পুজো, তাকে বাড়ি যেতে হবে, ভাড়া চাই।ক্ষেত্রবাবুর আবশ্যক আমি ঠিক

জানিনে, তবে তারও দরকার জরুরি। হেডপণ্ডিত পুজো করতে যাবেন দক্ষিণে শিষ্যবাড়ি। কাপড়চোপড় নেই, কিনবেন। যদুবাবু—

—দি কানিং ওল্ড ফক্স—

—যদুবাবুর স্ত্রী আজ তিন-চার মাস পড়ে আছেন জ্ঞাতির বাড়ি, তাদের সেখান থেকেআনলে নয়—তারা চিঠি লিখছেন কড়া কড়া। ট্রেনভাড়া খরচ চাই—

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, তোমার কাছে সবাই বলে, তোমাকে ধরেছে আমাকে বলতে।বুঝলাম।

—হাঁ, স্যার।

—টাকা আমি যে করে হয় ম্যানেজ করব, তুমি যখন বলছ। তুমি নিজের জন্যে কিছুনেবে না ?

—না স্যার। আমার দুটো টুইশানির টাকা পাব—একরকম করে চালিয়ে নেব এখন।এখনও তো কত মাস্টারকে কিছু দেওয়া হচ্ছে না। শুধু এই ক'জনের নিতান্ত জরুরি দরকার,তাই—

—বেশ, কাল ওদের বলো, টাকা দিয়ে দেব যে করেই হোক।

—আর একটা কথা স্যার, যদি জানুয়ারি মাসে সুবিধে হয়, জ্যোতির্বিনোদের কিছু মাইনেবাড়িয়ে দিতে হবে। বড় গরিব।

—কেন, ওকে আমরা যা দিই, ওর বিদ্যাবুদ্ধির পক্ষে তা যথেষ্ট নয় কি?

—না স্যার। ওর প্রতি অবিচার করবেন না। গরিব বড়—

—কিন্তু বড় ফাঁকিবাজ, ক্লাসে কিছু করে না। আরও দু-চারজন আছে ফাঁকিবাজ। তুমিভাবো, আমি তাদের চিনিনে ? স্কুলের অবস্থা ভাল না বলে কিছু বলিনে। আচ্ছা, তোমার কথামনে রইল, জানুয়ারি মাসে বেশি ছেলে ভর্তি হলে থার্ড পণ্ডিতের কেস আমি বিবেচনা করব।নতুন টিচার বিদায় লইলেন।

যদুবাবু সত্যই বিপদে পড়িয়াছেন।

গত গ্রীষ্মের ছুটিতে স্ত্রীকে সেই যে গ্রামে শরিকের বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছিলেন, অর্থাভাবে তাহাকে আনিতে পারেন নাই। অবনী মুখুজ্জেকে টাকা ধার দিবেন বলিয়াছিলেন, সে অদ্য তিন মাস ধরিয়া তাগাদার উপর তাগাদা দিয়া আসিয়াছে—নানা ছলছুতা, সত্য-মিথ্যানানারূপ স্তোকবাক্যে তাহাকে কতদিন ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন। যদুবাবুর স্ত্রী লিখিল, তুমি অবনীঠাকুরপোকে টাকা দিবার কথা নাকি বলিয়া গিয়াছিলে, সে একদফা নিজে, একদফা তাহার দিদি ও স্ত্রীর দ্বারা আমার গায়ের ছাল খুলিয়া ফেলিতেছে, তোমার কাছে টাকা ধারের সুপারিশকরিতে। তুমি কোথা হইতে টাকা দিবে জানি না। তবে এমন বলিলেই বা কেন, তাহাও ভাবিয়া পাই না। যদি টাকা দিতে না পারো, তবে আমাকে এখান হইতে সত্বর লইয়া যাইবে। ইহাদের খোঁটাও গঞ্জনা আর আমার সহ্য হয় না।

যদুবাবু স্ত্রীকে স্তোকবাক্য দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, সে আজ দেড় মাসের কথা। তারপরস্ত্রীর যত চিঠি আসিয়াছে, তাহার কোনো উত্তর দেন নাই।

দিবেনই বা কী করিয়া, স্কুলে দুই মাস খাটিয়া এক মাসের মাহিনা পাওয়া যায়—মাসের ঊনত্রিশ তারিখে গত মাসের মাহিনা যদি হইল, তবে মাস্টারেরা ভাগ্য প্রসন্ন বিবেচনা করেন।মেসের দেনা ঠিকমতো দেওয়া যায় না—টুইশানি ছিল, তাই চলে। স্ত্রীকে ইহার মধ্যে আনেন কোথায়, বাসা করিবার খরচ জুটাইবেন কোথা হইতে, বলিলেই তো হইল না।

শনিবার পূজার ছুটি হইবে, আজ বৃহস্পতিবার। যদুবাবু টুইশানি করিয়া ফিরিবার পথেভাবিতেছিলেন, ছুটিতে কি বেড়াবেড়ি যাইবেন? রামেন্দুবাবুকে ধরিয়াছেন, হেডমাস্টারকেবলিয়া-কহিয়া অন্তত কুড়ি টাকা যাহাতে পাওয়া যায়। রামেন্দুবাবুর কথা আজকাল সাহেব বড়শোনে।

কিন্তু তা যেন হইল। এই সামান্য টাকা হাতে সেখানে গিয়া কী করিবেন ? স্ত্রীকে আনিয়াকোথায়ই বা রাখেন? অর্থকষ্টের বাজারে বাসা করিবেনই বা কোন্ সাহসে, হাওয়ায় ভর করিয়াদাঁড়াইয়া এত ঝুঁকি লওয়া চলে না।

আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে যদুবাবু মেসের দরজায় ঢুকিতেই মেসের একটি লোক বলিয়া উঠিল—একটি ভদ্রলোক আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন অনেকক্ষণ থেকে। শ্রীশদা এখনও ছেলে পড়িয়ে ফেরেননি, আপনাদের ঘরে আমি বসিয়ে রেখেছি আপনার সীটে।

যদুবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমার জন্যে? কোথা থেকে?

—তা তো জিগ্যেস করিনি। দেখুন না গিয়ে, আপনার সীটেই বসে আছেন। বললেন এখানে খাব। আমি আবার ঠাকুরকে বলে দিলাম যদুবাবুর ফ্রেন্ড খাবে। নইলে রান্নাবান্না হয়েযাবে, আপনি যখন ফিরবেন।

যদুবাবু দুরুদুরু বক্ষে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া নিজের ঘরে ঢুকিতেই সম্মুখের সীট হইতে অবনী মুখুজ্জে দাঁত বাহির করিয়া একগাল হৃদ্যতার হাসি হাসিয়া বলিল, আসুন দাদাএই যে! প্রণাম। ওঃ কতক্ষণ থেকে বসে আছি!

যদুবাবুর হৃদ্‌স্পন্দন যেন এক সেকেন্ডের জন্য থামিয়া গেল। চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন।তখনই কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, আরে অবনী যে! এসো এসো ভায়া! তারপর, সব ভাল ? তোমার বউদিদি ভাল তো?

—হেঁ হেঁ দাদা, সব একরকম আপনার আশীর্বাদে—

—বেশ বেশ।

—তারপর দাদা এলাম, বলি, যাই দাদার কাছে। জঙ্গলে পড়ে থাকি, দুদিন মুখ বদলানো হবে, আর শহরে দেখে-শুনে আসিগে যাই থিয়েটার-বায়োস্কোপ। দিন পনেরো কাটিয়ে আসিপুজোর মহড়াটা। ম্যালেরিয়ায় শরীর জ্বরজ্বর, একটু গায়ে লাগুক—দাদা যখন আছেন।

যদুবাবু পুনরায় কাষ্ঠহাসি হাসিলেন, তা বেশ তা বেশ। তবে—

তারপর আপনার কাছে বলতে লজ্জা নেই দাদা—ধার করে গাড়ির ভাড়াটিকোনোক্রমে যোগাড় করে তবে আসা। হাতে কানাকড়িটি নেই। বাড়িতে আপনার বউমার, ছেলেপুলের পরনে কাপড় নেই কারও—বছরকার দিন, পুজো আসছে। নিজেরও—দাদা, এই দেখুন না, সাত-পুরনো ধুতি, তাই পরে তবে—বলি, যাই দাদার কাছে, একটা হিল্লে হয়েইযাবে। আপাতত গোটা কুড়ি টাকা নিয়ে কাপড়গুলো তো কিনে রাখি! এর পর বাজার আক্রাহয়ে যাবে কিনা!

যদুবাবুর কপাল ঘামিয়া উঠিয়াছে। তাহার রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে কী একটা কথা অস্ফুটভাবে উচ্চারিত হইল, ভাল বোঝা গেল না। অবনী তাহাকেই সম্মতিসূচক বাণী ধরিয়া লইয়া বলিল, না, কালই সকালে টাকাটা নিয়ে বাজার করে নিয়ে আসি। আর আপনি না দিলেই বা যাচ্ছি।কোথায় বলুন! আপনার ওপর জোর খাটে বলেই তো আসা! না হয় দুটো বকবেন, না হয়মারবেন—কিন্তু ছোট ভাইয়ের আবদার না রেখে তো পারবেন না—হেঁ হেঁ—

যদুবাবু বেচারি সারাদিন খাটিয়াছেন, সেই কোন সকালে দুইটি খাইয়া বাহির হইয়াছিলেন।রাত দশটা, এখন কোথায় খাইয়া ঘুমাইবেন, এ উপসর্গ কোথা হইতে আসিয়া জুটিল বল তো!

পাড়াগাঁয়ের দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি, দেখাশুনা ঘটিত কালেভদ্রে, এখন মাখামাখি করিতে গিয়ামুশকিলেই পড়িয়া গেলেন। পাড়াগাঁয়ের লোকের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করিতে নাই—ইহারা হাত পাতিয়াই আছে। পাড়াগাঁয়ের লোকের এ স্বভাব তিনি জানিতেন না যে তাহা নয়, কিন্তু বহুদিন কলিকাতায় থাকার দরুন ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাই আজ এ দুর্দশা। বলিলেন, চলো, এসো—খাবে।

যদুবাবুর ঘরে সাতটি সীট—অর্থাৎ মেঝেতে ঢালা বিছানা পাতিয়া পাশাপাশি সাতটি ক্লান্তপ্রাণী শয়ন করে। তাহার মধ্যে অবনীকে গুঁজিয়া কোনো রকমে শোওয়া চলিল। কিন্তুপাড়াগাঁয়ের লোক, সকলের সম্মুখে অভাব-অভিযোগের কথা উচ্চৈঃস্বরে ব্যক্ত করিতে লাগিল।আর এত বকিতেও পারে! 'হাঁ হাঁ' দিতে দিতে যদুবাবুর মুখ ব্যথা হইয়া গেল।

সকালে উঠিয়া অবনীর জন্য চা ও খাবার আনাইয়া দিয়া যদুবাবু মেসের বাজার করিতেবাহির হইলেন, কারণ বাজার জিনিসটা তিনি করেন ভালই, এবং ইহা হইতে দুই-চারি আনালাভও রাখিতে জানেন নিজের জন্য।

স্কুলে বাহির হইতে যাইবেন, অবনী জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, কখন আসচেন?

—কাল যে সময় এসেছিলাম, রাত হবে।

অবনী সকলের সামনেই বলিয়া বসিল, তা হলে দাদা, কাপড়ের টাকাটা আমায় দিয়ে যান, আজই কাপড়গুলো কিনে রাখি! আর ওবেলা ভাবছি বায়োস্কোপ দেখব, তার দরুনও কিছু দিন, আমার ট্যাঁক যাকে বলে গড়ের মাঠ কিনা! হ্যাঁ—হ্যাঁ—

যদুবাবু তিন-চারজন মেস-বন্ধুর সামনে কী বলিবেন! বলিলেন, আমি এসে দেব এখন, এখন তোইহাতে অবনী চেঁচাইয়া আবদারের সুরে বলিয়া উঠিল, না দাদা, তা হবে না। আপনিদিয়েই যান—

যদুবাবু ফাঁপরে পড়িলেন। টাকা দিবেন কোথা হইতে? কুড়ি টাকা স্কুল হইতে লইবার সুপারিশ ধরিয়াছেন—হয়তো শনিবারের আগে সেই একমাত্র সম্বল কুড়িটি টাকাও হাতে পাওয়া যাইবে না। টুইশানির টাকা হয়তো ও-বেলা মিলিবে। অবশ্য টাকা হাতে আসিলে অবনীকে তিনি দিবেন না নিশ্চয়ই, তাহার নিজের খরচ নাই? বলিলেন, এসো বাইরে আমার সঙ্গে।

পথে গিয়া বলিলেন, অমন করে সকলের সামনে বলতে আছে, ছিঃ! টাকা হাতে থাকলে তোমায় দিতাম না?

অবনী অনুযোগের সুরে বলিল, বা রে! আপনাকে তো কাল রাত থেকে বলছি। সত্যিদাদা, হাতে কিছুই নেই, চা-জলখাবারের পয়সাটি পর্যন্ত নেই। শুধু আপনার ভরসায় এখানেআসা—

—এই রাখো দু আনা পয়সা—চা-খাবার খেয়ো। আমি স্কুল থেকে ফিরি, তারপর বলব।চললাম, বেলা হয়ে যাচ্ছে—

স্কুলে বসিয়া যদুবাবু আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। যখন আসিয়া পড়িয়াছে অবনী, তখন হঠাৎ এক-আধ দিনে চলিয়া যাইবে না। উহার স্বভাবই ওই, টাকা না লইয়া যাইবে না। দুই বেলা আট আনা ফ্রেন্ড-চার্জ দিয়া উহাকে বসাইয়া খাওয়াইতে গেলে যদুবাবু স্কুল হইতে যে কয়টি টাকা পাইবেন, তাহা উহার পিছনেই ব্যয় হইয়া যাইবে! আর কেনই বা উহাকে তিনি এখানে জামাই-আদরে বসাইয়া খাওয়াইতে যাইবেন, কে অবনী? কিসের খাতির তাহার সঙ্গে?

আচ্ছা, যদি মেসে না ফিরিয়া তিনি পলাইয়া দুই দিন অন্যত্র গিয়া থাকেন, তবে কেমনহয় ? মেসে শ্রীশকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়া দেন যদি—বিশেষ কাজে তিনি অন্যত্র যাইতেছেন, এখন দিন-বারো মেসে ফিরিবেন না, কেমন হয় ! হইবে আর কী, অবনী সেই দশ দিন বসিয়া বসিয়া দিব্য খাইবে এখন তাঁহার খরচে!

সামনের শনিবার ছুটি। একদিন আগে কি ছুটি লইবেন?

সাত-পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে টুইশান-শেষে যদুবাবু মেসে গিয়া দেখিলেন, অবনী নাই। চলিয়া গেল নাকি?

পাশের ঘরের সতীশবাবু বলিলেন, যদুবাবু, আসুন। আপনার ছোট ভাই সিনেমা দেখতেগিয়েছে, এখুনি আসবে। ছ'টার শোতে গিয়েছে।

—সিনেমা! আমার ছোট ভাই?

সতীশবাবু যদুবাবুর কথার সুরে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, হ্যাঁ, যিনি কাল এসেছিলেন।আমায় বললেন, দাদার স্কুল থেকে আসতে দেরি হচ্ছে। বায়োস্কোপ দেখতে যাবার ইচ্ছে ছিল।তা বোধ হয় হল না। আমি বললাম—কেন হল না? উনি বললেন, টাকা নেই সঙ্গে, দাদার কাছে চাবি। মনে করে নিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি বললাম—তা আর কী! যদুবাবুর ফিরতে রাত হবে দশটা। আপনার কত দরকার, নিয়ে যান। পরস্পর বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এসব—মেস-মেটের ভাই, আপনার কাছে নেই বলে কি আর অভাব ঘটবে?

—কত নিয়ে গেল?

—দু’ টাকা বললেন দরকার। আর দু’টাকা নিয়েছেন বুঝি আপনার পিসিমার জন্যে কী ওষুধ কিনতে হবে—দোকান বন্ধ হলে আজ আর পাওয়া যাবে না—কাল সকালেই বুঝি উনি চলে যাবেন। তা থাক, তার জন্যে কী, এখন দেবার তাড়া নেই। মাইনে পেলে শনিবার দেবেন, এখন কাজটা তো হয়ে গেল।

যদুবাবু অতিকষ্টে রাগ সামলাইয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং একটু পরেই অবনী সিনেমা হইতে ফিরিয়া ঘরে ঢুকিল। দাঁত বাহির করিয়া বলিল, এই যে দাদা, দেখে এলাম সিনেমা। থাকি গাঁয়েপড়ে, ওসব দেখা অদৃষ্টে ঘটেই না তো! সতীশবাবুর কাছ থেকে গোটাচারেক টাকা নিয়েগেলাম। কুড়ি টাকার মধ্যে চার টাকা সতীশবাবুকে আর ষোলোটা দেবেন আমায়!

যদুবাবু দেখিলেন, অবনী ধরিয়াই লইয়াছে—কুড়ি টাকা তাহার হাতের মুঠার মধ্যেআসিয়া গিয়াছে। কুড়ি টাকা তো দূরের কথা, এই বহু-কষ্টার্জিত টাকার মধ্যে চার টাকা এভাবে বাজে ব্যয় হওয়াই কি কম কষ্টকর? এ চার টাকা দিতেই হইবে ভদ্রতার খাতিরে। যদুবাবুর বহু ভাগ্য যে, সে কুড়ি টাকা ধার করে নাই!

এমন মুশকিলে তিনি জীবনে কখনও পড়েন নাই। কেন মিছামিছি শরিক-জ্ঞাতিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে গিয়াছিলেন! এখন তাহার ধাক্কা সামলাইতে প্রাণ যে যায়! যদুবাবুর ইচ্ছা হইল, তিনি হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিয়া হাত-পা ছোঁড়েন, অবনীকে ধরিয়া দুমদাম করিয়া কিল মারেন, কিংবা একদিকে ছুটিয়া বাহির হইয়া যান। কিন্তু মেসের ভদ্রলোকদের মধ্যে কিছুই করিবার জো নাই। তিনি শান্তমুখে তামাক সাজিতে বসিয়া গেলেন।

অবনী উৎসাহের সঙ্গে সিনেমায় কী দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার গল্প সবিস্তারে আরম্ভ করিল। গল্প তার আর শেষ হয় না। যদুবাবু বলিলেন, চলো, খেয়ে আসি।

অবনী হাসিয়া বলিল, আজ এখনও হয়নি। আজ যে আপনাদের মেসে ফিস্ট। আমিখোঁজ নিয়ে এলাম রান্নাঘরে, এখনও দেরি আছে।

সর্বনাশ! আট আনা ফ্রেন্ডচার্জ আজ ফিস্টের দিনে ! এ ভূতভোজন করাইয়া লাভ কী। তাঁহার রক্ত-জল-করা পয়সায়!

অবনী পরের দিনও নড়িতে চাহিল তো না-ই, টাকার তাগাদা করিয়া যদুবাবুকে উদ্ব্যস্তকরিয়া তুলিল। রাত দশটায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, অবনী কাহার কাছে খবর পাইয়াছে, আগামী কাল শনিবার স্কুল বন্ধ হইবে, সুতরাং ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিল, বলিল, দাদা, কালমাইনে পাবেন দু’মাসের, না? কাল চলুন, আপনার সঙ্গেই স্কুলে যাই—টাকা ষোলোটা দিয়ে দিন, তিনটের গাড়িতে বাড়ি যাই। যদুবাবুর ভয়ানক রাগ হইল, কিন্তু এখানে স্পষ্ট কথা বলিতেগেলেই অবনী ঝগড়া বাধাইবে, তাহাও বুঝিলেন। পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত লোক, কাণ্ডজ্ঞানহীন। কেলেঙ্কারি একটা না বাধাইয়া ছাড়িবে না।

পরদিন ক্লাসের ছেলেরা খাওয়াইল। অবনী গিয়া জুটিল যদুবাবুর সঙ্গে।

যদুবাবু কুড়িটি টাকা বেতন পাইলেন—তাও রামেন্দুবাবুর সুপারিশে। ছুটির সারকুলার বাহির হইয়া গেল। সকলে কে কোথায় যাইবেন, পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। মাস্টারেরা চায়ের দোকানে গিয়া মজলিশ করিবে ঠিক ছিল, কিন্তু সাহেব তাহাদের লইয়া পাঁচটাপর্যন্ত মিটিং করিলেন।

মিটিংয়ের কার্যতালিকা নিম্নলিখিতরূপ :—

(১) ছুটির পরেই বার্ষিক পরীক্ষা—কী ভাবে পড়াইলে ছেলেরা বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে।

(২) দেখা গিয়াছে, তৃতীয় শ্রেণীর ছেলেরা ইংরেজি ব্যাকরণে বড় কাঁচা। এই সময়ের মধ্যে কী প্রণালীতে শিক্ষা দিলে তাহারা উক্ত বিষয়ে পারদর্শী হইয়া উঠিতে পারে।

(৩) টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলি পড়া ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

(৪) সপ্তম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় শ্রুতিলিখন থাকিবে কিনা। থাকলে তাহাতে কতনম্বর থাকিতে পারে।

মি. আলম ক্ষেত্রবাবুর প্রশ্নপত্রের দুই স্থানে দুইটি ভুল বাহির করিলেন। পাঠ্যতালিকারবাহিরে সেই দুইটি প্রশ্ন করা হইয়াছে—এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় ওই দুইটি বিষয় নাই। সাহেবের আদেশে পাঠ্যতালিকা দেখা হইল, ভুলই বটে। ক্ষেত্রবাবু অপ্রতিভ হইলেন।

ধরা পড়িল, যদুবাবু ষষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাসের প্রশ্ন এখনওতৈয়ারি করেন নাই। মি. আলমধরিয়া দিলেন।

সাহেব বলিলেন, কী যদুবাবু? যদুবাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, অত্যন্ত দুঃখিত স্যার। এখুনি করে দিচ্ছি—

—মি. আলম ধরে না দিলে কী মুশকিলেই পড়তে হত! —স্যার, বড় ব্যস্ত ছিলাম। মন ভাল ছিল না।

—সে সব কথা আমি জানি না। কর্তব্য কাজে অবহেলা করে যে তার স্থান নেই আমারস্কুলে। মাই গেট ইজ—

—এবার মাপ করুন স্যার, আর কখনও এমন হবে না।

দোতলা হইতে নামিতেই অবনীর সহিত দেখা। সে সিঁড়ির নীচে তাহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। দাঁত বাহির করিয়া বলিল, মাইনে পেলেন দাদা?

যদুবাবুর বড় রাগ হইল—একে সাহেবের কাছে অপমান, অপরের সুপারিশে মাত্র কুড়ি টাকা প্রাপ্তি, তার উপর এইসব হাঙ্গামা সহ্য হয় ?

যদুবাবু বলিলেন, না।

—মাইনে পাননি? পেয়েছেন দাদা!

—না, পাইনি। কেউই পায়নি।

অবনী একগাল হাসিয়া বলিল, দাদার যেমন কথা! দু'মাসের মাইনে একসঙ্গে পেলেনবুঝি?

যদুবাবু বলিলেন, সত্যিই পাইনি। তুমি মাস্টারমশায়দের জিগ্যেস করে দেখ না?

—এক মাসের মাইনে দেবে না পুজোর সময়—তা কি কখনও হয় ?

—এ স্কুলে এমনি নিয়ম। সাহেবের স্কুল, পুজো-টুজো মানে না।

অবনী কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, তবে আমায় টাকা দেবেন বললেন যে ও-বেলা?

—কোথা থেকে দেব বল? স্কুলের মাইনে যখন হল না, টাকা পাব কোথায় ?

অবনী কথাটা উড়াইয়া দিবার মতো তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল, আপনার আবার টাকারভাবনা! না হয় ডাকঘর থেকে তুলে কিছু দিন দাদা, এখনও সময় যায়নি—

যদুবাবু অবনীর মুখের দিকে চাহিয়া নীরস কণ্ঠে কহিলেন, ডাকঘরে এক পয়সাও নেইআমার। দিতে পারব না।

অবনী আরও কিছুক্ষণ কাকুতি-মিনতি করিল, রাগ করিল, ঝগড়া করিল, যদুবাবুকে কৃপণ বলিল, তাহার স্ত্রীকে এতদিন বাড়িতে জায়গা দিয়া রাখিয়াছে সে খোঁটাও দিতে ছাড়িল না। যদুবাবুর এক কথা—তিনি টাকা দিতে পারিবেন না।

তিনি মাত্র কুড়ি টাকা মাহিনা পাইয়াছেন, তাহা হইতে কিছু দেওয়ার উপায় নাই।

অবনীর হৃদ্যতা আগেই উবিয়া গিয়াছিল, সে বলিল, তা হলে টাকা দেবেন না আপনি? কথা যেন খুঁড়িয়া মারিতেছে!

যদুবাবু বলিলেন, না।

—বেশ। কিন্তু আপনাকে চিনে রাখলাম, বিপদে-আপদে লাগবে না কি আর কখনও ? আচ্ছা, চলি।

কিছু দূর গিয়া তখনই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, হ্যাঁ, বউদিদিকে ওখানে রাখার আর সুবিধেহচ্ছে না। কালই গিয়ে তাকে নিয়ে আসবেন, বলে দিচ্ছি। এত অসুবিধে করে পরের বউকেজায়গা দেবার ভারি তো লাভ! সব চিনি, এক কড়ার উপকারে কেউ লাগে না। কেবল মুখেলম্বা লম্বা কথা—

অবনী চলিয়া গেল। যদুবাবু স্কুলের বাহিরে আসিলেন ভাবিতে ভাবিতে। ক্ষেত্রবাবু পিছনহইতে আসিয়া বলিলেন, চল হে যদুদা, একটু চা খাই সবাই মিলে।

—আর চা খাব কী, মন বড় খারাপ।

—কী হল? তুমি তবুও কুড়ি টাকা পেলে। আমাদের তো এক পয়সাও না।

—না হে, তোমার বউদিদি রয়েছে বেড়াবাড়ি—সেই পাড়াগাঁ। তাকে এবার না আনলেই নয়। কিন্তু এনে কোথায় বা রাখি?

—এখননা-ই বা আনলে দাদা। নিজের বাড়িতেই তো রয়েছেন। থাকুন না। এখন পুজোরসময়, দেশে পুজো দেখুন না। গাঁয়ে পুজো হয় তো?

যদুবাবু গর্বের সহিত বলিলেন, আমার বাড়িতেই পুজো। শরিকি পুজো। আর, বেড়াবাড়ির জমিদার তো আমরা। মস্ত বাড়ি, আমার অংশেই এখনও (যদুবাবু মনে মনে গণনা করিলেন) পাঁচখানা ঘর, ওপর নীচে। বাড়িতেই পুকুর, বাঁধা ঘাঠ। আমার স্ত্রী সেখানেই রয়েছে, আসতে চায় না, বলে—বেশ আছি। হয়েছে কী ভায়া, নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না। আছেসবই, এখনও দেশে গেলে লোকজন ছুটে দেখা করতে আসে, বলে—বড়বাবু, বিদেশে পড়েথাকেন কেন? দেশে আসুন, আপনার ভাবনা কী? কিন্তু ম্যালেরিয়া বড্ড। তেমন আয়ও নেইপুরনো আমলের মতো। নামটাই আছে। নইলে কি আর বত্রিশ টাকা সাত আনায় পড়ে থাকি এই স্কুলে, রামোঃ।যদুবাবু ওয়েলেসলি স্কোয়ারের বেঞ্চিতে বসিয়া মনে মনে বহু আলোচনা করিলেন। স্ত্রীকেএখন কলিকাতায় আনা অসম্ভব।

কুড়ি টাকা মাত্র সম্বলে বাসা করিয়া এক মাসও চালাইতে পারিবেন না। বেড়াবাড়ি এখনগেলে অবনী দস্তুরমতো অপমান করিবে তাঁহাকে। সুতরাং তিনি কলিকাতায় মেসেই থাকিবেন, স্ত্রী কাঁদাকাটা করিলে কী হইবে?

যদুবাবুর স্ত্রী পূজার মধ্যে স্বামীকে পাঁচ-ছয়খানা লম্বা লম্বা পত্র লিখিল। সে সেখানেটিকিতে পারিতেছে না, অবনীর দিদির ও স্ত্রীর খোঁটা এবং দুর্ব্যবহারে তাহার জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে আর থাকিতে হইলে সে গলায় দড়ি দিবে, ইত্যাদি।

যদুবাবু লিখিলেন, তিনি এখন রামপুরহাটের জমিদারের বাড়িতে টুইশানি পাইয়াছেন, ছুটি লইয়া এখন দেশে যাইবার কোনো উপায় নাই। তাহারা তাহাকে বড় ভালবাসে, ছাড়িতে চায় না।

সর্ব্বৈব মিথ্যা।

স্কুলে ঢুকিবার পূর্বে গেটের কাছে একদল ছাত্র ভিড় জমাইয়া তুলিয়াছে। যদুবাবুকে দেখিয়াক্লাস নাইনের একটি বড় ছেলে আগাইয়া আসিয়া বলিল, আজ স্কুলে ঢুকবেন না স্যার, আজআমাদের স্ট্রাইক, কেউ যাবে না স্কুলে।

যদুবাবুর মুখ অপ্রত্যাশিত আনন্দে উজ্জ্বল দেখাইল। এও কি সম্ভব হইবে? আজ কাহারমুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলেন ? স্ট্রাইক হওয়ার অর্থ সারাদিন ছুটি! এখনই বাসায় ফিরিয়া দুপুরে দিবানিদ্রা দিবেন, তারপর বিকালের দিকে উঠিয়া তাহার এক বন্ধুর বাড়ি আছে মলঙ্গা লেনে, সেখানে সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত দাবা খেলিবেন। মুক্তি।

এই সময় শ্রীশবাবু ও মি. আলম একসঙ্গে গেটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে ছেলেরা তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আজ রামতারক মিত্র গ্রেপ্তার হওয়ার দরুন—দেশবিখ্যাত নেতারামতারক মিত্র—কলিকাতার সমগ্র ছাত্রসমাজে দারুণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, স্কুল—কলেজের ছাত্রদল মিলিয়া বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করিবে ও-বেলা।

মি. আলম বলিলেন, আমাদের যেতেই হবে। আর তোমাদেরও বলি, আমি চাই না যে, এ স্কুলের ছাত্রেরা কোনো পলিটিক্যাল আন্দোলনে যোগ দেয়। চলুন যদুবাবু, শ্রীশবাবু—

যদুবাবু মনে মনে ভাবিলেন, গিয়ে সইটা করেই ছুটি, কেউ আসছে না স্কুলে।

হেডমাস্টার স্ট্রাইকের কথা জানিতেন না। তিনি সকালে উঠিয়া খয়রাগড়ের রাজবাড়িতেটুইশানিতে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া সব শুনিলেন। নিজে গেটে দাঁড়াইয়া ছেলেদের বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন অনেক—তাহার কথা কেহ শুনিল না। টিচার্স রুমে বসিয়া মাস্টারেরা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।যদুবাবু বলিলেন, হাঃ শুনছে আজ ক্লার্কওয়েল সাহেবের কথা! তুমিও যেমন! কোথায় রামতারকমিত্তির—অত বড় লিডার আর কোথায় ক্লার্কওয়েল—ফোতো স্কুলের ফোতো হেডমাস্টার!

কিন্তু মাস্টারদের আশা পূর্ণ হইল না। একটু পরেই হেডমাস্টারের স্লিপ লইয়া মথুরা চাপরাশি আসিল, নীচু দিকের ক্লাসে ছোট ছোট ছেলেরা অনেক সকালেই আসে—বিশেষত তাহারা দেশনেতা রামতারক মিত্রের বিরাট ব্যক্তিত্বের বিষয়ে কিছুই জানে না; সুতরাং মাস্টার ও অভিভাবকের ভয়ে যথারীতি ক্লাসে আসিয়াছে। তাহাদের লইয়া ক্লাস করিতে হইবে।

উপরের দিকের ক্লাসের মাস্টার যাঁহারা, এ আদেশে তাহাদের কোনো অসুবিধা হইল না; কেননা উপরের কোনো ক্লাসে একটি ছাত্রও আসে নাই। ধরা পড়িয়া গেলেন শ্রীশবাবু প্রমুখযাঁহাদের প্রথম ঘণ্টায় নীচের দিকে ক্লাস আছে।

যদুবাবু চতুর্থ শ্রেণীতে ঢুকিয়া দেখিলেন, জন-পাঁচ-ছয় ছোট ছেলে বসিয়া আছে। ওপাশে ক্লাস সেভেন-এ জনপ্রাণীও আসে নাই, সুতরাং প্রথম ঘণ্টার শিক্ষক হেডপণ্ডিত দিব্য উপরের ঘরে বসিয়া আড্ডা দিতেছেন, অথচ তাহার—

রাগে দুঃখে যদুবাবু ধপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া কটমট করিয়া চারিদিকে চাহিলেন। এইহতভাগাগুলার জন্যই এই শাস্তি—যদি এই বদমাইসিগুলা না আসিত, তবে আজ তাঁহার দিবানিদ্রারোধ করে কে?

কড়া বাজখাঁই সুরে হাঁকিলেন, আজ পুরনো পড়া ধরব নিয়ে আয় বই—ছাল তুলবআজ পিঠের, যদি পড়া ঠিকমতো না পাই—

ছোট ছোট ছেলেরা তাঁহার রাগের কারণ ঠাহর করিতে না পারিয়া গা টেপাটেপি করিতেলাগিল পরস্পর। একটি ছেলে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আজ তো পুরনো পড়ার কথাছিল না স্যার!

যদুবাবু দাঁত খিচাইয়া বলিলেন, পুরনো পড়া আবার বলা থাকবে কী ? ও যে দিন ধরব, সেই দিনই বলতে হবে—দেখাচ্ছি সব মজা, কোনো ক্লাসের ছেলে স্কুলে আসেনি, ওঁরা এসেছেন—ওঁদের পড়বার চাড় কত! ছাল তুলছি আজ পড়া না পারলে দুই-একটি বুদ্ধিমান ছেলে ততক্ষণ তাঁহার রাগের কারণ খানিকটা বুঝিয়াছে। একজন বলিল, স্যার, না এলে বাড়িতে বকে, বলে—ওপরের ক্লাসের ছেলেরা স্ট্রাইক করেছে তা তোদের কী? সেই আষাঢ় মাসে স্ট্রাইকের সময় এরকম হয়েছিল—

আর একটি অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ছেলে বলিল, স্যার, বলেন তো পালাই।

যদুবাবু সুর নরম করিয়া বলিলেন, পালাবি কোথা দিয়ে ? ইস্কুলের গেটে হেডমাস্টার তালা দিয়ে রেখেছেন।

ক্লাসসুদ্ধ ছেলে বলিয়া উঠিল প্রায় সমস্বরে, গেটের দরকার কী স্যার? আপনি বলুন, টিনের বেড়া রয়েছে পেছনে, ওর তলা দিয়ে গলে বেরিয়ে যাব।

—তবে তাই যা। কাউকে বলিসনে। রেজেস্ট্রি হয়নি তো এখনও—পালা। একে একেযা।

নীচের তলায় আশপাশের ক্লাসে ছেলে নাই, কারণ সেগুলি বড় ছেলেদের ক্লাস।কেবল পূর্বদিকের কোণে হল-ঘরের পাশের ক্লাসে গুটিকয়েক ছোট ছেলে লইয়া জ্যোতির্বিনোদ বিরক্তমুখে বসিয়া আছেন। যদুবাবু বলিলেন, ওহে জ্যোতির্বিনোদ, ওগুলোকে যেতেদাও না!

জ্যোতির্বিনোদ যেন দৈববাণী শুনিলেন, এরূপভাবে লাফাইয়া উঠিয়া আগ্রহের সুরেবলিলেন, দেব ছেড়ে? সাহেব কিছু বলবে না তো?

যদুবাবু মুখে কোনোদিনই খাটো নহেন, ব্যঙ্গের সুরে বলিলেন, ও সব ভাবলে তবে বসেক্লাস করো সেই বেলা তিনটে পর্যন্ত (ছোট ছেলেদের তিনটার সময় ছুটি হইয়া যায়)। এই তোআমি ছেড়ে দিলাম—

—আপনার সব বড় বড়, আমরা হলাম চুনোপুঁটি, সবতাতেই দোষ হবে আমাদের।

—কিছু না, ছেড়ে দাও সব। এই, যা সব পালা—টিনের পার্টিশনের তলা দিয়ে পালা।স্ট্রাইকের দিন স্কুল করতে এসেছে! ভারি পড়ার চাড় !

জ্যোতির্বিনোদও সুরে সুর মিলাইয়া বলিলেন, দেখুন দিকি কাণ্ড যত-পড়ে তো সব উল্টে যাচ্ছেন একেবারে! যা সব একে একে। রোতো, গোল করবি তো হাড় ভাঙব মেরে, কেউটের না পায়—

কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাস প্রায় খালি হইয়া গেল।

যদুবাবু উপরে গিয়া বলিলেন, কোথায় ছেলে? দু-একটা এসেছিল, কে কোথা দিয়েপালিয়ে গেল ধরতেই পারা গেল না—

ক্ষেত্রবাবু ছুটির দিনই রাত্রির ট্রেনে বর্ধমান রওনা হইলেন।

পরদিন সকালের দিকে বর্ধমান স্টেশনে নামিয়া প্ল্যাটফর্মের উত্তর দিকে মালগুদামের ওপার্সেল আপিসের পিছনে দাদার কোয়ার্টারে গিয়া ডাক দিলেন, ও বউদি!

—এসো এসো ঠাকুরপো ! মনে পড়ল এতদিন পরে? তা ভাল আছ বেশ? আমায় শশীবাবুর বউ রোজই বলেন—হা দিদি, তোমার সে ঠাকুরপো কবে আসবেন? আমি বলি— তা কী করে জানব? কলেজে কাজ করেন, বড় চাকরি, ছুটি না হলে তো আসতে পারেন না!তা ছেলেমেয়েদের কোথায় রেখে এলে?

—ওরা তাদের পিসিমার কাছে রইল কালীঘাটে—মেজদিদির কাছে।

—বেশ, এসেছ ভালই হয়েছে। এবার একটা যা হয় ঠিক করে ফেল। ওঁদের মেয়ে বড় হয়েছে, তোমার ভরসাতেই আছে। আর তোমাকে সংসার যখন করতেই হবে, তখন আর দেরি করা কেন, আমি বলি। বসো হাত-পা ধোও, চা করি।

ক্ষেত্রবাবু এইরূপ একটা অস্পষ্ট আশার গুঞ্জনধ্বনি সারারাত ট্রেনের মধ্যে কানের কাছেশুনিয়াছেন—চলমান বাতাসে সে আভাস আসিয়াছিল! বাসায় পা দিতেই এমন কথা শুনিবেন, তাহা কিন্তু ভাবেন নাই। ক্ষেত্রবাবু পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার জাঠতুতো দাদা গোবর্ধনবাবু সন্ধ্যার সময় ডিউটি হইতে ফিরিয়া বলিলেন, এই যে, ক্ষেত্র কখন এলে? তা খেয়েছ? স্কুল কবে—কাল বন্ধ হ'ল ? বেশ।

গোবর্ধনবাবু পাকা লোক। যে খুড়তুতো ভাই আজ সাত-আট বছরের মধ্যে কখনওঘনিষ্ঠতা করা দূরের কথা, বছরে দুইখানি পোস্টকার্ডের পত্র দিয়া খোঁজ-খবর লইত কিনা সন্দেহ, সেই ভাই কাল স্কুল বন্ধ হইতে না হইতে কলিকাতা হইতে বর্ধমানে আসিয়া হাজির, এ নিশ্চয়ই নিছক ভ্রাতৃ-প্রেম নয়। গোবর্ধনবাবু মনে মনে হাসিলেন।

চা-জলখাবার-পর্বান্তে ক্ষেত্রবাবু তাঁহারই সমবয়সী শ্রীগোপাল মজুমদার অ্যাসিস্ট্যান্টস্টেশন-মাস্টারের বাড়ি বেড়াইতে গেলেন। রেলওয়ে সমাজে পরস্পরকে উপাধি দ্বারা সম্বোধনকরাই প্রচলিত।

ক্ষেত্রবাবুকে সেখানেও একদফা চা খাবার খাইতে হইল।

মজুমদার বলিল, তারপর ক্ষেত্রবাবু, শুনছিলাম একটা কথা।

ক্ষেত্রবাবুর বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিয়া উঠিল। বুঝিয়াও না বুঝিবার ভান করিয়াবলিলেন, কী কথা?

—আমাদের মুখুজ্জের ভাইঝির সঙ্গে নাকি আপনার-ক্ষেত্রবাবুসলজ্জ হাসিয়া বলিলেন, না না, কই না—আমার তো—

—না, আমি বলি, দ্বিতীয় সংসার করার ইচ্ছে যদি থাকে, তবে এখানেই করে ফেলুন—মেয়েটি বড় ভাল।

ক্ষেত্রবাবু দুই-একবার বলি-বলি করিয়া অবশেষে বলিলেন, মেয়ে ? ও! দেখেচেন নাকি?

—কে, অনিলা ? অনিলাকে ফ্রক পরে বেড়াতে দেখেছি। আমাদের বাসায় আমার ভাগনীবিমলার সঙ্গে খুব আলাপ।

—বেশ মেয়ে। দেখতে তো ভালই, ঘরের কাজকর্ম সব জানে। চলুন না, পায়ে পায়েমুখুজ্জের বাসায় যাই। আপনি এসেছেন, বোধ হয় জানে না।

ক্ষেত্রবাবু জিভ কাটিয়া বলিলেন, আরে তা কখনও হয়? না না। আমি যাব কেন?

—আমরা যে ক'জন আছি স্টেশনের কোয়ার্টারে—সব এক ফ্যামিলির মতো। এখানেকুটুম্বিতে করি না কেউ কারও সঙ্গে। সেবারে ওই মল্লিকবাবুর মা মারা গেল, আটাত্তর বছর বয়সে। রাত দেড়টা, আমি এইটিনডাউন সবে পাস করে টিকিটের হিসেব চালানে এনট্রি করেছি, এমন সময় বাসা থেকে লোক গিয়ে বললে—শীগ্‌গির চল, এই রকম ব্যাপার। সেই রাত্তিরেমশাই রেলওয়ে কোয়ার্টারের ক'টি প্রাণী, বলি ব্রাহ্মণ আর কায়স্থ কী, হিন্দু তো বটে—ঘাড়ে করে নিয়ে গেলুম শ্মশানে; তা এখানে ওসব নেই। চলুন, যাওয়া যাক।

ক্ষেত্রবাবুর যাওয়ার ইচ্ছা যে না হইয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু দাদা কী মনে করিবেন, এইভয়ে মজুমদারের কথায় রাজী হইতে পারিলেন না।

পরদিন বেলা দশটার সময় ক্ষেত্রবাবু বাসায় বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, এমনসময় একটি মেয়ে এক বাটি তেল আনিয়া সামনে রাখিয়া সলজ্জ সুরে বলিল, দিদি বললেন আপনাকে নেয়ে আসতে।

ক্ষেত্রবাবু চাহিয়া দেখিলেন, সতেরো-আঠারো বছরের মেয়েটি। বেশি ফরসাও নয়, বেশিকালোও না। মুখশ্রী ভাল।

—ও! বউদিদি বললেন?

ক্ষেত্রবাবু যেন একটু থতমত খাইয়া গিয়াছেন, কথার সুরে ধরা পড়িল।

মেয়েটি হাসি চাপিতে চাপিতে বলিল, হ্যাঁ।—এই কথা বলিয়াই সে চলিয়া গেল।

ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন, কে মেয়েটি, কখনও তো দেখেন নাই একে! এ সেই মেয়েটি নয়।

স্নান করিয়া খাইতে বসিয়াছেন, সেই মেয়েটিই আসিয়া ভাতের থালা সামনে রাখিল।আবার ফিরিয়া গিয়া ডালের বাটি আনিয়া দিল। খাওয়ার মধ্যে মেয়েটি অনেকবার যাতায়াতকরিল। ক্ষেত্রবাবু দুই-একবার মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, মুখখানি ভাল ছাড়া মন্দ বলিয়া মনে হইল না তাহার কাছে। ভাল করিয়া চাহিতে পারিলেন না, দাদা পাশে বসিয়াখাইতেছেন। আহারাদির পর ক্ষেত্রবাবু বিশ্রাম করিতেছেন, সেই মেয়েটিই আসিয়া পান দিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবুর কৌতূহল হইল জানিবার জন্য মেয়েটি কে, কিন্তু কখনও অপরিচিতা মেয়েরসঙ্গে কথা কওয়ার বা মেলামেশার অভিজ্ঞতা না থাকায় চুপ করিয়া রহিলেন। গরিব স্কুলমাস্টার, তেমন সমাজে কখনও যাতায়াত নাই।

এ দিন এই পর্যন্ত। মেয়েটি আর আসিল না সারাদিনের মধ্যে। কিন্তু ক্ষেত্রবাবুর মন যেনতাহার জন্য উৎসুক হইয়া রহিল সারাদিন। মুখখানি বেশ। সেই মেয়েটি নাকি? কী জানি!লজ্জায় কথাটা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। পরে আরও দুই দিন গেল, মেয়েটিরকোনো চিহ্ন নাই কোনো দিকে। হঠাৎ তৃতীয় দিনে মেয়েটি সকালে চায়ের পেয়ালা রাখিয়া গেল সামনে। ক্ষেত্রবাবুর বুকের মধ্যে কিসের একটা ঢেউ চলকিয়া উঠিল। মেয়েটি দোরের কাছেএকটুখানি দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল এবং আর কিছুক্ষণ পরে আবার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনাকে কি আর এক পেয়ালা চা দোব?

—চা! তা বেশ।

—আনব?

—হ্যাঁ।

মেয়েটি এবার চলিয়া যাইতেই ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন, লজ্জা কিসের—এবার তিনি জিজ্ঞাসা করিবেনই। সেই মেয়েটি নয়, ও অন্য কেউ, পাশের কোনো বাসার মেয়ে। কী জাতি, তাহারই বা ঠিক কী। তা হোক, একটু আলাপ করিতে দোষ নাই।

এবার চা আনিতেই ক্ষেত্রবাবু লাজুকতা প্রাণপণে চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি বুঝি পাশের বাসাতেই থাকেন?মেয়েটি যেন এতদিন ক্ষেত্রবাবুর কথা কহিবার আশায় ছিল, বহুবিলম্বিত ব্যাপারের অপ্রত্যাশিত সংঘটনে প্রথমটা নিজে যেন কিছু থতমত খাইয়া গেল। পরে বেশ সপ্রতিভভাবেই আঙুল তুলিয়া অনির্দেশ্য একটা বাসার দিকে দেখাইয়া বলিল, পাশে না, ও-ই দিকে আমাদেরবাসা।

—ও!

ক্ষেত্রবাবু আর কথা খুঁজিয়া পান না। মেয়েটি যেন আশা করিয়াই দাঁড়াইয়া আছে, তিনিআবার কথা বলিবেন। ক্ষেত্রবাবু পুনরায় মরীয়া হইয়া বলিলেন, আপনার বাবা বুঝি রেলে কাজকরেন ?

—পার্সেল-আপিসে কাজ করেন।

—বেশ।

মেয়েটি তখনও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া ক্ষেত্রবাবু আকাশ-পাতাল ভাবিয়া জিজ্ঞাসাকরিলেন, আপনি পড়েন বুঝি?

এখন বাড়িতেই পড়ি, গার্লস্ স্কুলে থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিলাম, এখন বড় হয়েছি তাই আর স্কুলে যাইনে।

মেয়েটি যে কয়টি ইংরেজি কথা বলিল, সবগুলির উচ্চারণ স্পষ্ট ও জড়তাশূন্য, অশিক্ষিতউচ্চারণ নয়। ইংরেজি-জানা মেয়ে ক্ষেত্রবাবু এ পর্যন্ত দেখেন নাই, মেয়েটির প্রতি সপ্রশংসদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, এখানে বুঝি গার্লস স্কুল আছে?

—বেশ বড় স্কুল তো, আড়াইশো মেয়ে পড়ে।

—হেডমিস্ট্রেস্ কে?

—আমাদের সময়ে ছিলেন মিস্ সুকুমারী দত্ত বি-এ, বি-টি। এখন কে এসেছেন জানিনে।

বা রে, মেয়েটি ‘বি-টি’র খবর পর্যন্ত রাখে! স্কুলমাস্টার ক্ষেত্রবাবু প্রশংসায় বিগলিতহইয়া উঠিলেন মনে মনে। যেন কোনো অদৃষ্টপূর্ব কিছু দেখিতেছেন। বেশ মেয়েটি তো?

—আপনাদের স্কুলে পুরুষমানুষ টিচার নেই বুঝি?

—নীচের দিকে একজন আছেন ভুবনবাবু বলে, বুড়োমানুষ। আমরা দাদু বলে ডাকতাম।

—পড়ানো বেশ ভাল হত স্কুলে ? অঙ্ক কষাতেন কে?—ক্ষেত্রবাবু এবার কথা কহিবার বিষয় খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

—নীহারদি—মিস্ নীহার তালুকদার, ওঁরা ব্রাহ্ম।

বাঃ, মেয়েটি ব্রাহ্মদের খবরও রাখে! এত বাহিরের খবর-জানা মেয়ে সাধারণ গৃহস্থঘরেবড় একটা দেখা যায় না, অন্তত ক্ষেত্রবাবু তো দেখেন নাই। ইচ্ছা হইল, খানিকক্ষণ মেয়েটির সঙ্গে গল্প করেন; কিন্তু সাহসে কুলাইল না। কে কী মনে করিতে পারে!

পরদিন বৈকালে ক্ষেত্রবাবুর বউদিদি বলিলেন, শশীবাবুদের বাসায় তোমার আর ওঁরনেমন্তন্ন।

ক্ষেত্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, শশীবাবু কে? সেই তাঁরা?

বউদিদি হাসিমুখে বলিলেন, হ্যাঁ গো, সেই তারাই তো।

—সেখানে কি যাওয়া উচিত হবে? —

—কেন?

—একটা আশা দেওয়া হবে, কিন্তু—

—কিন্তু কী ? তুমি বিয়ে করবে কি না, এই তো?

— হ্যাঁ—তো—সেই রকমই ভাবছিলাম—

—কেন, মেয়ে পছন্দ হয়নি?

ক্ষেত্রবাবু আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি তখনই ব্যাপারটা আগাগোড়া বুঝিয়া ফেলিলেন। বউদিদির ষড়যন্ত্র। তাহা হইলে শশীবাবুদের বাসার সেই মেয়েটি! হাসিয়া বলিলেন, সব আপনার কারসাজি! তখন তো ভাবিনি যে, ওই মেয়ে! ও!

—মেয়ে খারাপ?

ক্ষেত্রবাবু দেখিলেন, হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত খেলো করিয়া লাভ নাই, ওজনে ভারী থাকামন্দ নয়। বলিলেন, মেয়ে ? হ্যাঁ—না, তা খারাপ নয়। তবে 'আহা মরি'ও কিছু নয়।

—মনের কথা বলছ ঠাকুরপো ? সত্যি বলো, তোমার পছন্দ হয়নি? অনিলার কিন্তুতোমাকে পছন্দ হয়েছে।

ক্ষেত্রবাবুর সতর্কতার বাঁধ হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি আগ্রহপূর্ণ কণ্ঠেজিজ্ঞাসা করিলেন, কী, কী, কী রকম?

ক্ষেত্রবাবুর বউদিদি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, তবে নাকি ঠাকুরপোর মন নেই? আমাদের কাছে চালাকি ? সত্যি তা হলে ভাল লেগেছে? তবে আমিও বলছি শোনো, অনিলা তোমাকে দেখতেই এসেছিল আসলে। অবিশ্যি ছুতো করে এসেছিল। আমি যেন কিছুবুঝিনি, এইভাবে বললাম, কলকাতা থেকে আমাদের একজন আত্মীয় এসেছে, বাইরে বসেআছে, চা-টা দিয়ে এসো—ভাতটা দিয়ে এসো। একা পারছিনে। তাই ও গিয়েছিল। বার বারপাঠালে ভাল হয়, এমনি মনে হল। আজকালকার সব বড়সড় মেয়ে। ওদের ধরনই আলাদা। যেয়ো কিন্তু।

রাত্রে সেই মেয়েটিই ক্ষেত্রবাবুদের পরিবেষণ করিল। কিন্তু করিলে কী হইবে, দাদা পাশেই বসিয়া। ক্ষেত্রবাবু লজ্জায় মুখ তুলিয়া চাহিতেও পারিলেন না। খাওয়াদাওয়া মিটিয়া গেল।ছোট রেলওয়ে-কোয়ার্টারের বাহিরের ঘরে ক্ষুদ্র তক্তাপোশে শতরঞ্জির উপর ক্ষেত্রবাবু আসিয়া বসিলেন। বাড়ির কর্তা হঠাৎ ক্ষেত্রবাবুর দাদাকে কোথায় ডাকিয়া লইয়া গেলেন। অল্প পরেইসেই মেয়েটি একটা চায়ের পিরিচে চারটি পান আনিয়া তক্তাপোশের এক কোণে রাখিল।ক্ষেত্রবাবু একটা বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন, ও, এটা আপনাদের বাসা? আমি প্রথমটা বুঝতে পারিনি।

মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু চলিয়া গেল না।

ক্ষেত্রবাবু আর কথা খুঁজিয়া পান না। মেয়েটি যখন সামনেই দাঁড়াইয়া, তখন বেশিক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলে বড় খারাপ দেখায়। চট করিয়া মাথায় কিছু আসেও না ছাই! তখন যেকথাটা আজ দুই দিন হইতে মনে হইতেছে প্রায় সব সময়েই, সেটাই বলিলেন, রেলের বাসাগুলো বড় ছোট, না?

—হ্যাঁ।

—এতে আপনাদের অসুবিধে হয় না?

—আমাদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। এই তো রেলে-রেলেই বেড়াচ্ছি কতদিন থেকে—ওসয়ে গিয়েছে। জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত এই রকমই দেখছি।

—এর আগে কোথায় ছিলেন আপনারা?

—আসানসোলে। তার আগে পাকুড়। তার আগে ছিলাম সক্রিগলি জংশন। তখন আমারবয়স সাত বছর, কিন্তু সব মনে আছে আমার—

মেয়েটি বেশ সহজ সুরেই কথা বলিতে লাগিল, যেন ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে তার অনেক দিনের পরিচয়।

—আচ্ছা, আপনাদের দেশ কোথায়?

—হুগলি জেলায় আরামবাগ সাব-ডিভিশনে। কিন্তু সে বাড়িতে আমরা যাইনি কোনোদিন। রেলের চাকরিতে ছুটি পান না বাবা। আমার ভাইয়ের পৈতের সময় বাবা বলেছেনযাবেন।

মেয়েটি তাহাকে কোনো প্রশ্ন করে না, নিজে হইতেও কোনো কথা বলে না; কিন্তু তাহারপ্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য যেন উন্মুখী হইয়া থাকে। এ এমন এক অবস্থা, ক্ষেত্রবাবুর পক্ষে যাহাসম্পূর্ণ নূতন। নিভাননীর সঙ্গে

বিবাহ হইয়াছিল, তখন তাহার বয়স উনিশ, নিভাননীর দশ। তখন নারীর মনের আগ্রহ বুঝিবার বয়স হয় নাই তাঁহার।

এতকাল পরে—এসব নূতন ব্যাপার জীবনের।

আচ্ছা, আপনারা অনেক দেশ ঘুরেছেন, পাহাড় দেখেছেন?

—তিনপাহাড়ি বলে একটা স্টেশন আছে লুপ লাইনে। সেখানে বাবা কিছুদিন রিলিভিং-এ ছিলেন, সেখানে পাহাড় দেখেছি।

—আপনি তো দেখেছেন, আমি এখনও দেখিনি!

মেয়েটি বিস্ময়ের সুরে বলিল, আপনি পাহাড় দেখেননি?

ক্ষেত্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, নাঃ, কোথায় দেখব? বরাবর কলকাতাতেই আছি। স্কুলের ছুটিথাকলেও টুইশানির ছুটি নেই। যাতায়াত বড় একটা হয় না। আপনাদের বড় মজা, পাসেযাতায়াত করতে পারেন।

মেয়েটি বিস্ময়ের সুরে বলিল, ওঃ ওঃ! খু-উ-ব!

—গিয়েছেন কোথাও ?

—দুমকায় আমার এক পিসেমশায় চাকরি করেন, দুমকা রাজস্টেটে। সেখানে মা'র সঙ্গে গিয়ে মাসখানেক ছিলাম একবার। আর একবার পুরী যাওয়ার সব ঠিকঠাক, আমার ছোটভাইয়ের অসুখ হল বলে বাবা পাস ফেরত দিলেন। সামনের বছর যাবেন বলেছেন। ও, আপনাকে আর দুটো পান দি—

—না না, আমি বেশি পান খাইনে। বরং খাবার জল এক গ্লাস যদি—

—আনি—বলিয়াই মেয়েটি বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় (অখণ্ড সুখজীবনে পাওয়া যায় না), তখনই বাহির হইতে শশীবাবুর সহিত ক্ষেত্রবাবুর দাদা গোবর্ধনবাবু ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, ক্ষেত্র, তা হলে চলো যাই!

একটু পরে জলের গ্লাস হাতে মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নিঃশব্দে গ্লাসটি তক্তাপোশেরকোণে রাখিয়া কিঞ্চিৎ দ্রুতপদেই চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু ও তাহার দাদাও বিদায় লইয়াআসিলেন।

সেই দিনই রাত্রে ক্ষেত্রবাবু বউদিদির কাছে প্রকারান্তরে বিবাহে মত প্রকাশ করিলেন।পরবর্তী তিন-চারি দিনের মধ্যে সব ঠিকঠাক হইয়া গেল, সামনের অগ্রহায়ণ মাসের দোসরা ভাল দিন আছে। বরপণ একশো এক টাকা নগদ ও দশ ভরি সোনার গহনা। ঠিকুজী কোষ্ঠীমিলিলে কথাবার্তা পাকা হইবে।

ক্ষেত্রবাবু দাদাকে বলিলেন, দাদা, আমি তা হলে কাল যাব।

—এখনই কেন? আর দু-চার দিন থাক না? —না দাদা, খোকাখুকি রয়েছে পড়ে সেখানে। যাই একবার।

যাইবার পূর্বদিন পুনরায় শশীবাবুর বাড়ি তাহার নিমন্ত্রণ হইল। এদিন কিন্তু ক্ষেত্রবাবুরউৎসুক দৃষ্টি চারিদিক খুঁজিয়াও মেয়েটির টিকি দেখিতে পাইল না।

বার্ষিক পরীক্ষা চলিতেছে। হেডমাস্টারের তাড়নায় মাস্টারেরা অতিষ্ঠ। বড় হলে যদুবাবু ও শরৎবাবু পাহারা দিতেছেন, হঠাৎ মি. আলম তদারক করিতে আসিয়া ধরিয়া ফেলিলেন, দুইজন ছাত্র টোকাটুকি করিতেছে।

মি. আলম বলিলেন, আপনারা কী দেখছেন যদুবাবু! কত ছেলে টুকছে—

যদুবাবু দেখিতেছিলেন না সত্যই—এ স্কুলে উনিশ বৎসর হইয়া গেল তাহার। সাহেবআসিবার অনেক আগে হইতে এখানে ঢুকিয়াছেন। নতুন মাস্টার যাহারা, খুব উৎসাহের সঙ্গে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে, তাহার সে বয়স পার হইয়া গিয়াছে। তিনি চেয়ারে বসিয়া ’ ঢুলিতেছিলেন।

সাহেবের টেবিলের সামনে দাঁড়াইতে হইল দুইজনকেই। সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দুইজনের দিকে চাহিলেন।

—কী যদুবাবু, আপনার হলে এই দুজন ছাত্র টুকছিল—আপনি দেখেন না, আপনাদেরকৈফিয়ত কী ?

—দেখছিলাম স্যার।

—দেখলে এরকম হল কেন?

—ছেলেরা বড় দুষ্টু স্যার,কী ভাবে যে টোকে—

—চেয়ারে বসে পাহারা দেওয়ার কাজ হয় না। বিশেষ করে যদুবাবু, আপনার আরমনোযোগ নেই স্কুলের কাজে, অনেক দিন থেকে লক্ষ্য করছি। এ স্কুলে আপনার আর পোষাবেনা।

যদুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

—আর শরৎবাবু, আপনি নতুন এসেছেন, আজ দু'বছর। কিন্তু এখনি এমনি গাফিলতিকাজের, এর পরে কী করবেন? আপনাদের দ্বারা স্কুলের কাজ আর চলবে না। এখন যানআপনারা, ছুটির পরে একবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

যদুবাবু রাগ করিয়া হলে ঢুকিয়া প্রত্যেক ছাত্রের পকেট খানাতল্লাশ করিলেন, ফলে প্রকাশ পাইল (১) থার্ড ক্লাসের এক ছেলের পকেট হইতে একখানা ইতিহাসের বইয়ের পাতা, (২)ক্লাসের আর একটি ছেলের কোঁচায় লুকানো একখানি আস্ত ইতিহাসের বই, (৩) নারাণবাবুর ছাত্র চুনির খাতার মধ্যে চার-পাঁচখানা কাগজে নানারূপ নোট লেখা, (৪) সেভেনথ্ ক্লাসের একটিছেলের ডেস্ক হইতে দুইখানি বই—একখানি ইংরেজি ইতিহাসের বই (এবেলা আছে ইতিহাসেরপরীক্ষা), আর একখানি হইল ভূগোল, যাহার পরীক্ষা ওবেলা আছে। বোঝা গেল, ইতিহাসেরবই হইতে কিছু আগেও সে টুকিতেছিল।

সব কয়জনকে হেডমাস্টারের কাছে হাজির করা হইল। সাহেবের হুকুমে তাহাদের এবেলাপরীক্ষা দেওয়া রহিত হইয়া গেল। বাড়িতে তাহাদের অভিভাবকদের কাছে পত্র গেল।নারাণবাবুর ছাত্র চুনি বাড়ি যাইতেছিল, নারাণবাবু ডাকিয়া পাঠাইলেন।—হ্যাঁ চুনি, তুমি নোট লিখে এনেছিলে ?

চুনি চুপ করিয়া রহিল।

—কেন এনেছিলে? কার কাছ থেকে লিখে এনেছিলে? ও লিখে আনা কি তোমার উচিতহয়েছে?

—না স্যার।

—তবে আনলে কেন?

—আর কখনও আনব না।

—তা তো আনবে না বুঝলাম। এদিকে একটা পেপার পরীক্ষা দিতে পারলে না।পাসনম্বর থাকবে কী করে, তাই ভাবছি।...চুনি, খিদে পেয়েছে? কিছু খাবি ? আয় আমার ঘরে।

নিজের ছোট ঘরটাতে লইয়া গিয়া নারাণবাবু তাহার পিঠে হাত দিয়া কত ভাল ভালকথা বুঝাইলেন—মিথ্যা দ্বারা কখনও মহৎ কাজ হয় না, ইত্যাদি। গীতার শ্লোক পড়িয়াশোনাইলেন। ছোলা-ভিজা ও চিনি এবং আধখানা পাঁউরুটি খাওয়াইলেন। চুনি যাইবার সময়বলিল, স্যার, একটা কথা বলব? বাড়ি গিয়ে কোনো কথা বলবেন না যেন—

—না, আমার যেচে বলবার দরকার কী! কিন্তু হেডমাস্টারের চিঠি যাবে তোমার বাবারনামে!

চুনির মুখ শুকাইল। বলিল, কেন স্যার?

—তাই সাহেবের নিয়ম।

—আপনি হেডস্যারকে বুঝিয়ে বলুন না। আপনি বললেই—

—যা, বাড়ি যা এখন। দেখি আমি।

চুনি চলিয়া গেলে নারাণবাবু ভাবিতে লাগিলেন, চুনির এ অসাধু প্রকৃতিকে কী করিয়া ভিন্নপথে ঘুরাইবেন! আজ যেভাবে বলিলেন, ও ঠিক পথ নয়। গীতার শ্লোক বলা উচিত হয় নাই—অতটুকু ছেলে গীতার কথা কী বুঝিবে? তাঁহার নোটবুকে টুকিয়া রাখিলেন—চুনি মিথ্যা ব্যবহার, হাউ টু কারেক্ট, অনুকূলবাবু হইলে কী করিতেন? নারাণবাবু গভীর দুশ্চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

চায়ের দোকানে বসিয়া সেদিন যদুবাবুআস্ফালন করিতেছিলেন : এক পয়সার মুরোদ নেই স্কুলের—আবার লম্বা লম্বা কথা! ডিউটি, ট্রুথ! আরে মশাই, পুজোর ছুটির মাইনে দু টাকাএক টাকা করে সেদিন শোধ হল। গরিব মাস্টারেরা কী খায় বল তো?

ক্ষেত্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, না পোষায়, চলে যেতে পারেন দাদা। সাহেবের গেট ইজওপ্‌ন্—

রামেন্দুবাবু আর নতুন টিচার নন—দু-তিন বছর হইয়া গেল এ স্কুলে, তিনি সব দিন এমজলিসে থাকেন না, আজ ছিলেন। বলিলেন, জানয়ারি মাস থেকে মাইনে কাটা হবে, জানেননা বোধ হয় ?

সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। যদুবাবু ও জগদীশ জ্যোতির্বিনোদ একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, কে বললে? অ্যাঁ, আবার মাইনে কাটা!

—জানুয়ারি মাসে ছাত্র ভর্তি না হলে মাইনে কাটা হবেই।

—এই সামান্য মাইনে, এও কাটা হবে! আপনি একটু বলুন হেডমাস্টারকে—

—বলেছিলাম। কিন্তু বাজেট যা, তাতে মাইনে না কাটলে মাস্টারদের মধ্যে দু-একজনকেজবাব দিতে হবে কাজ থেকে। তার চেয়ে সকলকে রেখে মাইনে কাটা ভাল।

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, সে যাকগে, যা হয় হবে। এখন সাহেবের কাছে একটা দরখাস্তদেওয়া যাক আসুন, যাতে মাসের মাইনেটা ঠিক সময় পাই। আড়াই মাস খেটে এক মাসের মাইনে নিয়ে এভাবে তো আর পারা যাচ্ছে না!

রামেন্দুবাবু বলিলেন, ও করতে যাবেন না। তাতে ফল হবে না। আমি কি ও নিয়ে বলিনি ভাবছেন?

যদুবাবু বলিলেন, না, আপনি যা বলেন, তার ওপর আমাদের কথা কওয়ার দরকার কী!যা ভাল হয় করবেন।

চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া কে একজন বলিলেন, আজ যে নারাণদাকে দেখছিনে?

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, যখন আসি, ঘরে উঁকি মেরে দেখি, তিনি লিখছেন বসে বসে একমনে। আমি আর ডাকলাম না।

রামেন্দুবাবু বলিলেন, ওই একজন বড় খাঁটি সিনসিয়ার লোক, সেকালের গুরুর মতো।ও টাইপ আজকাল বড় একটা দেখা যায় না এ ব্যবসাদারির যুগে। আচ্ছা, আমি এখন চলি—বসুন।

বসিবার সময় নাই কাহারও। সকলকেই এখনই টুইশানিতে যাইতে হইবে।

ক্ষেত্রবাবু চায়ের দোকান হইতে পাশেই শ্রীনাথ পালিতেরলেনে বাসায় গেলেন। পনেরোটাকা ভাড়ায় দুইখানি ঘর একতলায়, ছোট্ট রান্নাঘর। একদিকে সিঁড়ির নিচে কয়লা রাখিবারজায়গা। অন্ধকার কলঘরে একজন লোক দিনমানে ঢুকিলেও বাহির হইতে হঠাৎ দেখিবার জোনাই। তারের আলনায় কাপড় শুকাইতেছে। বাড়িওয়ালী শুচিবেয়ে বুড়ি গামছা পরিয়া ঝাঁটাহাতে উঠানে জল দিয়া ঝাঁট দিতেছে ও ধুইতেছে।

অনিলা বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে বলিল, দেরি হল যে?

—কোথায় দেরি? কানু কই?

—সে বল-খেলা দেখতে গিয়েচে, ইন্টার-স্কুল ম্যাচ আছে কোথায়। চা খাবে?

—না, এই খেয়ে এলাম দোকান থেকে।

অনিলা হাত-পা ধুইবার জল আনিয়া একটা ছোট টুল পাতিয়া দিল, একখানা গামছাটুলের উপর রাখিল। তারপর একটা বাটিতে মুড়ি মাখিয়া এক পাশে একটু গুড় দিয়া স্বামীকে খাইতে দিল। ক্ষেত্রবাবু হাত মুখ ধুইয়া জলযোগ সমাপনান্তে টুইশানিতে যাইবার জন্য প্রস্তুতহইলেন।

অনিলা বলিল, একটু জিরোবে না?

—না, দেরি হয়ে যাবে।

—অমনি বাজার থেকে ছোট খুকির জন্যে একটা বার্লি কিনে এনো, আর জিরে মরিচ।

—আর কী কী নেই দেখ।

—আর সব আছে, আনতে হবে না।

বড় খুকি এই সময়ে বলিল, বাবা, আমার জন্যে একটা পেন্সিল কিনে এনো—আমারপেন্সিল নেই।

অনিলা বলিল, পেন্সিল আমার কাছে আছে, দেব এখন। মনে করে দিস কাল সকালে।

ক্ষেত্রবাবু মাসখানেক হইল, নতুন বাসায় উঠিয়া আসিয়া নতুন সংসার পাতিয়াছেন। মন্দলাগিতেছে না। নিভাননীর মৃত্যুর পরে দিনকতক বড় কষ্ট গিয়াছিল, এখন আবার একটু সেবাযত্নের মুখ দেখিতেছেন। চিরকাল স্ত্রী লইয়া সংসার-ধর্ম করায় অভ্যস্ত, স্ত্রী-বিয়োগের পরসব যেন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকিত। অসুবিধাও ছিল বিস্তর, আট বছরের খুকিকে গৃহিণী সাজিতে হইয়াছিল, কিন্তু খুকি যতই প্রাণপণে চেষ্টা করুক, অনভিজ্ঞ শিশু মেয়ে কি তাহার মায়ের স্থানপূর্ণ করিতে পারে?

আবার সংসারে আয়না-চিরুনির দরকার হইতেছে, সিঁদুরের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে, স্নো পাউডার কিনিবার প্রয়োজন তা আসিয়া পড়িল। চিরকাল যে গরুর কাঁধে জোয়াল, ছাড়া পাইলে অনভ্যস্ত মুক্তির অভিজ্ঞতা তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। মনে হয়, সংসার হইল না, কাহারজন্য খাটিয়া মরিব, কে আমার অসুখ হইলে মুখে একটু জল দিবে—ইত্যাদি। যে বলিষ্ঠ ওশক্তিমান মন মুক্তির পরিপূর্ণতাকে ভোগ করিতে পারে, নির্জনতার ও উদাস মনোভাবের মধ্য দিয়া জীবনে নব নব দর্শন ও অনুভূতিরাজির সম্মুখীন হয়—নিরীহ স্কুলমাস্টার ক্ষেত্রবাবুর মনসে ধরনের নয়। কিন্তু না হইলে কী হয়? যে ভাবে যে জীবনকে ভোগ করিতে পারে, সেইভাবেই জীবন তাহার নিকট ধরা দেয়—ইহাতেই তাহার সার্থকতা। বাঁধা-ধরা নিয়ম কী-ই বাআছে জীবনকে ভোগ করিবার?

ক্ষেত্রবাবু ছাত্রদের একতলা কুঠুরির অন্ধকূপে গিয়া ভীষণ গরমের মধ্যে পাখার তলায় অবসন্ন দেহ একখানা ইংরেজি ডিকশনারির উপর এলাইয়া দিয়া পড়ানো শুরু করিলেন। আগেবেশ সময় কাটিত এখানে। এখন মনে হয় অনিলার সঙ্গে গিয়া কতক্ষণে দুইদণ্ড কথা বলিবেন! ছাত্রও ছাড়ে না। এটা বুঝাইয়া দিন, ওটা বুঝাইয়া দিন, করিতে করিতে রাত সাড়ে নয়টা বাজাইয়া দিল। তারপর আসিল ছাত্রের কাকা। সে এফএ ফেল, কিন্তু তাহার বিশ্বাস ইংরেজিতেতাহার মতো পণ্ডিত আর নাই, ভুল ইংরেজিতে সে ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিল, কী ভাবে ছেলেদের ইংরেজি শিখাইতে হয়। আজকালকার প্রাইভেট মাস্টারেরা ফাঁকিবাজ, পড়াইতে জানে না, কেবল মাহিনা বাড়াও—এই শব্দ মুখে।তারপর সে আবার দেখিতে চাহিল, আজ ক্ষেত্রবাবু ছেলেদের কী পড়াইয়াছেন, কালকার পড়া বলিয়া দিয়াছেন কি না, টাস্ক দিয়াছেনকি না।

লোকটার হাত এড়াইয়া রাত দশটার সময় ক্ষেত্রবাবু বাসার দিকে আসিতেছেন, এমন সময়ে পথে রাখাল মিত্তিরের সঙ্গে দেখা। ক্ষেত্রবাবু পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিয়াও পারিলেননা, রাখাল মিত্তির ডাকিয়া বলিল, এই যে! ক্ষেত্রবাবু যে! শুনুন, শুনুন—

—রাখালবাবু যে! ভাল আছেন ?

—কই আর ভাল, খেতেই পাইনে, আপনারা তো কিছু করবেন না! বলিতে বলিতে রাখালবাবু ক্ষেত্রবাবুর দিকের ফুটপাতে আসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, আসুন না, কাছেই আমার বাসা। একুট চা খেয়ে যান। সেদিন আপনাদের স্কুলে গিয়েছিলাম আমার বই দুখানা নিয়ে। সাহেব তো কিছুবোঝে না বাংলা বইয়ের, আপনারা একটু না বললে আমার বই ধরানো হবে না।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, এত রাত্তিরে আর যাব না রাখালবাবু, এখন চা খায় কেউ? আমিযাই—

—তবে আসুন, এই মোড়েই চায়ের দোকান, খাওয়া যাক একটু!

অগত্যা ক্ষেত্রবাবুকে যাইতে হইল। রাখালবাবু নাছোড়বান্দা লোক, অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় ক্ষেত্রবাবু জানেন, ইহার হাতে পড়িলে নিস্তার নাই। চা খাইতে খাইতে রাখালবাবু বলিলেন, এবার মশাই ধরিয়ে দিতে হবে আমার বই দুখানা। আপনাদের মি. আলম ভারী বদ লোক, আমায় বলে কিনা—ওসব চলবে না, আজকাল অনেক ভাল বই বেরিয়েছে। আমি বলি, তোমার বাবা আমার বই পড়ে মানুষ হয়েছে, তুমি আজ এসেচ রাখাল মিত্তিরের বইয়ের খুঁতধরতে!

রাখাল মিত্তিরকে ক্ষেত্রবাবু বহুদিন জানেন। বয়স পঁয়ষট্টি, জীর্ণ অতি মলিন লংক্লথের পিরান গায়ে, তাতে ঘাড়ের কাছে ছেঁড়া, পায়ে সতেরো-তালি জুতা। রাখালবাবু কলিকাতার স্কুলসমূহে অতি পরিচিত, পনেরো বছর হইল স্কুল-মাস্টারি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কয়েকখানিস্কুলপাঠ্য বই স্কুলে স্কুলে শিক্ষকদের ধরিয়া চালাইয়া দেন। তাতেই কায়ক্লেশে সংসার চলে।

ক্ষেত্রবাবুর দুঃখ হয় রাখালবাবুকে দেখিয়া। এই বয়সে লোকটা রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, টোটো করিয়া স্কুলে স্কুলে সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠানামা করিয়া বই চালানোর তদ্বির করিয়া বেড়ায়। কিন্তুবিশেষ কিছু হয় না। লোকটার পরন-পরিচ্ছদেই তাহা প্রকাশ।

বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, না না, আপনার বই খারাপ কে বলে! · চমৎকার বই!

রাখাল মিত্তির খুশি হইয়া বলিলেন, তাই বলুন দিকি! সকলে কি বোঝে? আপনি একজন সমজদার লোক, আপনি বোঝেন। আরে, এ কালে ব্যাকরণ জানে কে ? আমি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাতে ব্যাকরণে ফার্স্ট হই, আমার মেডেল আছে, দেখাব।

—বলেন কী!

—সত্যি। আপনি আমার বাসায় কবে আসছেন বলুন, দেখাব।

—না, দেখাতে হবে কেন! আপনি কি আর মিথ্যে বলছেন!

—সেদিন অমনি এক স্কুলের হেডমাস্টার বললে—মশাই, আপনার বই পুরনো মেথডেলেখা, ও এখন আর চলে না। এখন কত নতুন অথর বেরিয়েছে, তাদের বইয়ের ছাপা, ছবি, কাগজ অনেক ভাল। আপনার বই আজকাল ছেলেরাই পছন্দ করে না। শুনলেন? আরে, রাখালমিত্তিরের বই পড়ে কত অথর সৃষ্টি হয়েছে! অথর! আমাকে এসেছেন মেথড শেখাতে! পয়সাহাতে পাই তো ভাল ছাপা ছবি আমিও করতে পারি। কিন্তু কী করব, খেতেই পাইনে, চলেইনা।বুড়ো বয়সে লোকের দোরে দোরে ঘুরে বই ক'খানা ধরাই, তাতেই কোনো রকমে—ছেলেটাআজ যদি মরে না যেত, তবে এত ইয়ে হত না। ধরুন, পঁচিশ বছরের জোয়ান ছেলে, আজ বাঁচলে চৌত্রিশ বছর বয়স হত। আমার ভাবনা কী!

—আচ্ছা, আমি দেখব চেষ্টা করে। এখন উঠি রাখালবাবু, রাত অনেক হল।

—এই শুনুন, নব ব্যাকরণ-সুধা প্রথম ভাগ—ফোর্থ ক্লাসের জন্যে। নব ব্যাকরণ-সুধাদ্বিতীয় ভাগ থার্ড ক্লাসের উপযুক্ত, আর এবার নতুন একখানা বাংলা রচনা লিখেছি, রচনাদর্শপ্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। খুব ভাল বই, পড়ে

দেখবেন। সব রকমের রচনা আছে তাতে। কী ভাষা! ব্যাটারা সব বই লিখেছে, রচনা হয় কারও? কোনো ব্যাটা বাংলা সেন্টেন্স শুদ্ধ করে লিখতে জানে? নিয়ে আসুন বই, আমি পাতায় পাতায় ভুল বের করে দেব—একবার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় 'কৃৎ' প্রত্যয়ের—চললেন যে, ও ক্ষেত্রবাবু, আচ্ছা! তাহলে শনিবারে বই নিয়ে যাব, শুনুনমনে থাকবে তো? দেবেন একটু বলে হেডমাস্টারকে। আর শুনুন, বাংলা রচনাওএকখানা নিয়েযাব—যাতে হয়, একটু দেবেন বলে—নমস্কার—

ক্ষেত্রবাবু শেষের কথাগুলি ভাল শুনিতে পাইলেন না, তখন তিনি একটু দূরে গিয়াপড়িয়াছেন।

বাসায় অনিলা তাঁহার ভাত ঢাকা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ক্ষেত্রবাবু ভাবেন, ছেলেমানুষ—এত রাত পর্যন্ত জাগিয়া থাকার অভ্যাস নাই, সারাদিন খাটিয়া বেড়ায়। স্ত্রীকে ডাকদেন। অনিলা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলে, স্বামীকে দেখিয়া অপ্রতিভ হয়। বলে, এত রাত আজ?

—ঘুমুচ্ছিলে বুঝি?

অনিলা হাসিয়া বলিল, হাঁ, খোকাখুকিদের খাইয়ে দিলাম, তারপর একখানা বই পড়তেপড়তে কখন ঘুম এসে গিয়েছে।

ক্ষেত্রবাবু আহারাদি করিলেন। অনিলা বলিল, হ্যাঁ গা, রাগ করোনি তো ঘুমুচ্ছিলাম বলে ?

—বাঃ, বেশ! রাগ করব কেন?

—আমার বার্লি আর জিরে-মরিচ এনেচ?

—ওই যাঃ! একদম ভুলে গিয়েছি। ভুলব না? যদিবা ছাত্রের কাকার হাত এড়িয়ে বেরুলাম, তো পড়ে গেলাম রাখাল মিত্তিরের হাতে। সব স্কুলের সব মাস্টার ওকে এড়িয়ে চলে।একবার পাকড়ালে আর নিস্তার নেই!

—সে কে?

—অথর।

—কী কী বই আছে? কই, নাম শুনিনি তো?

—শুনবে কি—বঙ্কিমবাবু, না রবি ঠাকুর, না শরৎ চাটুজ্জে? স্কুলের—স্কুলের বই লেখে, নব কবিতাপাঠ, বাল্যবোধ—এই সব। বড় গরিব, হাতেপায়ে ধরে বই চালায়। ছিনেজোঁক।

—একদিন এনো না বাসায়, দেখব। আমি অথর কখনও দেখিনি—একদিন চা খাওয়াব।

রক্ষে করো। তুমি চেনো না রাখাল মিত্তিরকে। বাসায় আনলে আর দেখতে হবে না। সেকথাই তুলো না।

—বড়লোক?

—খেতে পায় না। বই চলে না। সেকেলে ধরনের বই, একালে অচল। এই যে বললাম, নাছোড়বান্দা হয়ে ধরে-পেড়ে চালায়।

অনিলার লেখাপড়ার উপর খুব অনুরাগ দেখিয়া ক্ষেত্রবাবুর আনন্দ হয়। নিভাননীলেখাপড়া জানিত সামান্যই; অনিলা মন্দ লেখাপড়া জানে না, ইংরেজিও জানে। বই পড়িতেভালবাসে বলিয়া শাঁখারিটোলার লাইব্রেরি হইতে ক্ষেত্রবাবু গত মাস হইতে বই আনিয়া দেন, দুইখানা বই একদিনেই কাবার। সম্প্রতি স্কুলের লাইব্রেরি হইতে ছোট ছোট ইংরেজি বই আনেন—অনিলার সেগুলি পড়িতে একটু সময় লাগে।

অনিলা সব সময় সব কথার মানে বুঝিতে পারে না। বলে, হ্যাঁ গা, হপ মানে কী? বইয়েতে আছে এক জায়গায়—

লাফিয়ে লাফিয়ে চলা।

“উঁহু, লাফানো নয়, কোনো গাছপালা হবে। লাফানো হলে সে জায়গায় মানে হয় না।

—ওহো, ও একরকমের লতা, চাষ হয় ইংলন্ডে, বিশেষ করে স্কটল্যান্ডে। মদ চোলাই হয়ওই লতা থেকে, হুইস্কি বিশেষ করে—

ছোট খুকি ঘুমের ঘোরে ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠিতে অনিলা ছুটিয়া গেল।

বেলা চারিটা বাজে। হেডমাস্টারের সারকুলার বাহির হইল, ছুটির পরে জরুরি মিটিং, কোনো মাস্টার যেন চলিয়া না যায়। মাস্টারদের মুখ শুকাইল। দুইদিন আগে সাহেব ক্লাসেঘুরিয়া পড়ানোর তদারক করিয়া গিয়াছেন, আজ সেই সেই সব ব্যাপারের আলোচনা হইবে, কাহার না জানি কী খুঁত বাহির হইয়া পড়িল!

যদুবাবু ফাঁকিবাজ মাস্টার, তাহার খুঁত বাহির হইবেই তিনি জানেন। অনেক দিন অনেকতিরস্কার খাইয়াছেন, বড় একটা গ্রাহ্য করেন না।

মিটিংয়ে হেডমাস্টার বলিলেন, সেদিন আপনাদের ক্লাসের পড়ানো দেখে খুব আনন্দিতহওয়ার আশা করেছিলাম; দুঃখের বিষয়, সে আনন্দলাভ ঘটেনি। টিচারদের কর্তব্য সম্বন্ধেআপনাদের অনেকবার বলেছি, কিন্তু তবুও এমন কতকগুলি টিচার আছেন, যাঁদের বার বার সেকর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিতে হয়, এটা বড় দুঃখের কথা। রামবাবু?

একটি ছিপছিপে ছোকরা-গোছের মাস্টার দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, স্যার?

—আপনি ফিফথ্ ক্লাসে জিওগ্রাফি পড়াচ্ছিলেন, কিন্তু ম্যাপ নিয়ে যাননি কেন?

রামবাবু নিরুত্তর।

—কতবার না বলেছি, ম্যাপ না দেখালে জিওগ্রাফি পড়ানো—

এইবার রামবাবু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন, স্যার, দেশের কথা পড়ানো হচ্ছিল না, বাংলাদেশের উৎপন্ন দ্রব্য পড়াচ্ছিলাম, তাই—

—ও! উৎপন্ন দ্রব্য পড়ালে ম্যাপ নিয়ে যেতে হবে না? কেন, বাংলাদেশের ম্যাপনেই?—আর ক্ষেত্রবাবু?

ক্ষেত্রবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

—আপনি রচনা শেখাচ্ছিলেন থার্ড ক্লাসে। কিন্তু শুধু সামনের বেঞ্চিতে যারা বসে আছে, তাদের দিকে চেয়ে কথা বলছিলেন, পেছনের বেঞ্চির ছাত্ররা তখন গল্প করছিল। ক্লাসসুদ্ধছেলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে না পারলে আপনার পড়ানো বৃথা হয়ে গেল, বুঝতে পারলেননা ? তা ছাড়া ব্ল্যাকবোর্ড আদৌ ব্যবহার করেননি সে ঘণ্টায়। পাণ্ডিট্?

পণ্ডিত বলিতে কোন্ পণ্ডিত, বুঝিতে না পারিয়া দুই পণ্ডিতই উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সাহেব জ্যোতির্বিনোদের দিকে আঙুল দিয়া বলিলেন, আপনি বাংলা পড়াচ্ছিলেন ফোর্থক্লাসে। আপনি কি ভাবেন, খুব চেঁচিয়ে পড়ালেই ভাল পড়ানো হল! আপনি নিজের প্রশ্নের নিজেই উত্তর দিচ্ছিলেন, নামতা পড়ানোর সুরে চিৎকার করে পড়াচ্ছিলেন, ফলে, ইউ ফেল্ড্টু ক্যারি দি ক্লাস উইথ ইউ!

পরে হেডপণ্ডিতের দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহস্যের সুরে বলিলেন, তা বলে ভাববেন , আপনার পড়ানো নিখুঁত! আপনি এক জায়গায় বসে পড়ান, সামনের বেঞ্চিতে দৃষ্টি রাখেন এবং মাঝে মাঝে অবান্তর গল্প করেন। যদুবাবু?

যদুবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

—আপনার কোনো দোষই গেল না। আমার মনে হয়, আপনার কাজে মন নেই। আপনারদোষের লিস্ট এত লম্বা হয়ে পড়ে যে, তা বলা কঠিন। আপনি কোনোদিন ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করেন না, ক্লাসে ছেলেদের প্রশ্ন করেন না, টাস্ক দেন না—সেদিন বায়ুপ্রবাহের গতিবোঝাচ্ছিলেন, গ্লোব নিয়ে যাননি ক্লাসে! গ্লোব না নিয়ে গেলে—

এমন সময়ে একটি ছাত্রকে মিটিংয়ের ঘরের মধ্যে উঁকি মারিতে দেখিয়া হেডমাস্টার ধমকদিয়া বলিলেন, কী চাই? এখানে কেন ?

ছাত্রটি মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, স্যার, ফোর্থ ক্লাসের ধীরেনের চোখে বল লেগে চোখ বেরিয়ে এসেছে—

সকলেই লাফাইয়া উঠিলেন।

হেডমাস্টার বলিলেন, চোখ বেরিয়ে এসেছে, কোথায় সে?

সকলে নীচের তলায় ছুটিলেন। স্কুলের বারান্দায় একটা তেরো-চোদ্দো বছরের ছেলেকেশোয়াইয়া আরও অনেক ছেলে ঘিরিয়া মাথায় জল দিতেছে, বাতাস করিতেছে। হেডমাস্টারকেদেখিয়া ভিড় ফাঁকা হইয়া গেল। সত্যই চোখ বাহির হইয়া আধ ইঞ্চি পরিমাণ ঝুলিয়া পড়িয়াছে।বীভৎস দৃশ্য!

তখনই মেমসাহেব খবর পাইয়া আসিয়া ছেলেটিকে কোলে লইয়া বসিল। সাহেবদারোয়ানকে ছেলের বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন। বড়লোকের ছেলে, বাড়িতে মোটর আছে। মোটর আসিতে দেরি দেখিয়া সে স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে বল খেলিতেছিল, তাহার ফলেই এ দুর্ঘটনা।

দেখিতে দেখিতে ছেলের বাড়ির লোক মোটর লইয়া ছুটিয়া আসিল। তাহার পূর্বেই স্কুলের পাশের ডা. বসু হেডমাস্টারের আহ্বানে আসিয়া ছেলেটিকে প্রাথমিক চিকিৎসাকরিতেছিলেন। ছেলের বাবা হেডমাস্টার ও ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ছেলেকে মোটরেমেডিক্যাল কলেজে লইয়া গেল। হেডমাস্টার সঙ্গে দুইজন মাস্টার দিলেন, শরৎবাবু ও গেমমাস্টার বিনোদবাবুকে যাইতে হইল।পরের কয়দিন হেডমাস্টার নিজে এবং আরও তিন-চারজন মাস্টার হাসপাতালে গিয়া ছেলেটিকে দেখিতে লাগিলেন। যে চোখে চোট লাগিয়াছিল, সে চোখটা অস্ত্র করিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে হইল, তবুও কিছু হইল না। ছেলেটির অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যায়।মেমসাহেব প্রায়ই গিয়া বসিয়া থাকে, সাহেবও এক-আধ দিন অন্তর যান, নারাণবাবু টুইশানিফেরতা প্রায় রোজই যান।

একদিন বিকালে হেডমাস্টারকে দেখিয়া ছেলেটি কাঁদিয়া ফেলিল। তখনও তাহার বাড়িহইতে লোকজন আসে নাই। সাহেব গিয়া বসিয়া বলিলেন, ডোন্ট ইউ ক্রাই মাই চাইল্ড—দেয়ারইজ এ লিটল ডিয়ার—বি এ হিরো—এ লিটল হিরো।

মুশকিল এই যে, সাহেব বাংলা বলিতে পারেন না ভাল, ছোট ছেলে তাহার ইংরেজি বুঝিতে পারে না। মুখে কথা বলিতে বলিতে হেডমাস্টার বিপন্ন মুখে ছেলেটির মাথায় ও পিঠে সান্ত্বনাসূচক ভাবে হাত বুলাইতে লাগিলেন : কান্না করে না, কান্না লজ্জার কঠা আছে—ইট ইজএ শেম্ ফর এ বয় টু ক্রাই, বুঝেছ? ভাল বালক আছে, সারিয়া যাইবে। কিচ্ছু হইবে না—

এমন সময় ছেলের মা ও বাড়ির মেয়েদের আসিতে দেখিয়া সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে বলিলেন, টোমার মার সামনে কান্না করে না। দেয়ার ইজ এ গুড বয়—আমার স্কুলের বালক কাঁদিবে না—আই নো ইউ উইল কিপ আপ দি প্রেস্টিজ অফ ইওর স্কুল—আই ব্লেস ইউমাই চাইল্ড—

ছেলেটি খানিকটা বুঝিল, খানিকটা বুঝিল না; কিন্তু সে কান্না বন্ধ করিল, আর কখনও কাহারও সামনে কাঁদে নাই। এমন কি, মৃত্যুর দুই দিন পূর্বে তাহার সংজ্ঞা লোপ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভয় কি দুর্বলতাসূচক একটি কথাও তাহার মুখে কেহ শোনে নাই।

মাস্টারদের বেতন আরও কমিয়া গিয়াছে; কারণ জানুয়ারি মাসে নতুন ছেলে ভর্তি হয়নাই আশানুরূপ। এই মাসের মাহিনা লইতে গিয়া মাস্টারেরা ব্যাপারটা জানিতে পারিলেন।

চায়ের আসরে যদুবাবু বলিলেন, আর তো চলে না হে, একে এই মাইনে ঠিকমতো পাওয়াযায় না, তাতে আরও পাঁচ টাকা কমে গেল! কলকাতা শহরে চালাই কী করে?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তবুও তো দাদা, আপনি বউদিদিকে পাড়াগাঁয়ে রেখেছেন আজ দু' বছর। আমি আর-বছর বিয়ে করে কী মুশকিলেই পড়ে গিয়েছি, বাসার খরচ কখনও চলত না, যদি টুইশানি না থাকত।

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, খোকার অন্নপ্রাশন দেবে কবে ক্ষেত্রবাবু?

—আর অন্নপ্রাশন! খেতে পাইনে তার অন্নপ্রাশন! বাসা-খরচ চলে না, বাসাভাড়া আজতিন মাস বাকি।

—আমার কথা যদি শোনেন, তবে অবাক হয়ে যাবেন। স্কুলের ঘরে থাকি,—ঘরভাড়া লাগে না, তাই রক্ষে। আজ ছ' মাস বাড়িতে পাঁচটা করে টাকা মাসে, তাও পাঠাতে পারিনে। পঁচিশ ছিল, হল বাইশ। এখানেই বা কী খাই, বাড়িতেই বা কী দিই?

যদুবাবু বলিলেন, আমার ভাবনা কিসের শুনবে? বউটাকে এক জ্ঞাতি শরিকের বাড়ি ফেলে রেখেছি দেশে। সেখানে তার কষ্টের সীমা নেই। কতবার লিখেছে, কিন্তু আনি কোথায়বলো? বত্রিশ থেকে আঠাশ হল। মেসে খাই, তাই কুলোয় না!

শরৎবাবু বলিলেন, কোথাও চলে যাই ভাবি, কিন্তু এ বাজারে যাই-ই বা কোথায় ?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আচ্ছা শরৎ, তোমায় একটা কথা বলি। আমাদের না হয় বয়েসহয়েছে, স্কুল-মাস্টারি ধরেছি অনেক দিন থেকে, কোথায় আর এ বয়েসে যাব! কিন্তু তুমি ইয়ংম্যান, কেন মরতে এ লাইনে পচে মরবে? স্কুল-মাস্টারি কি কেউ শখ করে করে ? সমস্ত জীবনটা মাটি। এখনও সময় থাকতে অন্য পথ দেখে নাও—তুমি, কি ওই গেম-টিচারবিনোদবাবু, কেন যে তোমরা এখানে আছ! পিওর লেজিনেস্—

শরৎবাবু বলিলেন, লেজিনেস্ নয় দাদা। এখানে পঁচিশ পেতাম, হল বাইশ। অনেক চেষ্টা করেছি, হেন আপিস নেই যেখানে দরখাস্ত-হাতে যাইনি, হেন লোক নেই যাকে ধরিনি। আমরাগরিব, নিজের লোক না থাকলে হয় না! আমাদের কে ব্যাক করছে, বলুন না দাদা?

—কিন্তু তা তো হল, এ স্কুলের অবস্থা দিন দিন হয়ে দাঁড়াল কী ?

—কে জানে কেমন ! সাহেবের অত কড়াকড়ি, অমন পড়ানোর মেথড—কিছুতেই কিছুহচ্ছে না!

যদুবাবু বলিলেন, তা নয়, কী হয়েছে জানো? পাশের স্কুলগুলো ছেলে ভাঙিয়ে নেয়, ওরাবাড়ি বাড়ি গিয়ে ছেলে যোগাড় করে। হেডমাস্টার মাস্টারদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি যায়।

—আমাদেরও যেতে হবে।

হেডমাস্টার যে রাজী নন। ওতে মাস্টারদের প্রেস্টিজ থাকে না, ওসব ব্যবসাদারি করে স্কুল রাখার চেয়ে না রাখা ভাল—এ সব বিলিতি মত এখানে খাটবে না। আমি জানি, লালবাজারে একটা স্কুল থেকে ছেলে ট্রান্সফার নেবে বলে দরখাস্ত দিলে—হেডমাস্টার দু'জন টিচার নিয়ে তাদের বাড়ি গিয়ে পড়ল, গার্জেনকে বোঝালে—কেন ট্রান্সফার নেবেন, কীঅসুবিধে হচ্ছে বলুন—কত খোশামোদ! কিছুতেই ছেলেকে নিতে দিলে না।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমাদের স্কুলে যেমন ট্রান্সফারের দরখাস্ত পড়েছে, আর সাহেব অমনি তখনই ক্লার্ককে ডেকে বললে—কত বাকি আছে দেখ, দেখে ট্রান্সফার দিয়ে দাও।

—এ রকম করে কি কলকাতার স্কুল চলে? সাহেবকে বোঝালেও বুঝবে না! —প্রেস্টিজ যাবে!

প্রেস্টিজ ধুয়ে জল খাই এখন!

পরদিন স্কুলে মি. আলম টিচারদের লইয়া এক গুপ্ত-সভা করিলেন, স্কুলের ছুটির পরতেতলার ঘরে। উদ্দেশ্য, এ হেডমাস্টারকে না তাড়াইলে স্কুলের উন্নতি নাই। একা দুই শত টাকামাহিনা লইবে, তাহার উপর ছেলে আসে না স্কুলে। মাস্টারদের এই দুর্দশা। হেডমাস্টার ও মেমবিতাড়ন না করিলে স্কুল টিকিবে না।

যদুবাবু বলিলেন, কী উপায়ে সরানো যায় বলুন? হিমালয় পর্বত কে সরায় ?

—কমিটির কাছে দরখাস্ত পেশ করি সবাই মিলে। আমাদের ভিউজ আমরা লিখি।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কিছু হবে না মি. আলম। কমিটি ওতে কানও দেবে না, উলটো বিপত্তি হবে।

মি. আলম বলিলেন, দেখুন কী হয়! আমি বলছি, ওতে ফল হতেই হবে!

এ মিটিংয়ে নারাণবাবু ছিলেন না, কিন্তু রামেন্দুবাবু ছিলেন। তিনি বলিলেন, আমি এঅপোজ করছি। হেডমাস্টার বিতাড়ন করে ফল ভাল হবে কে বলেছে? সেটা উচিতও নয়।

মি. আলম বলিলেন, তবে কিসে ফল ভাল হবে?

—তা আমি জানিনে, তবে হেডমাস্টার কড়া বটে, কিন্তু এ ভেরি গুড টিচার। অমন লোককে বুড়া বয়সে তাড়ালে ধর্মে সইবে না, আর তাড়াতে পারবেনও না।

—কেন ?

—কমিটির কাছে হেডমাস্টারের পোজিশন খুব সিকিওর। তারা ওঁকে মেনে চলে, শ্রদ্ধাকরে।

—শত্রুও আছেন যেমন ডাক্তার গাঙ্গুলী, সাতকড়ি দত্ত, মি. সেন—এঁরা স্বদেশী কিনা, সাহেবকে দেখতে পারেন না। আপনারা বলুন, আমি তদ্বির-তদারক আরম্ভ করি, মেম্বরদের—বিশেষ করে স্বদেশী মেম্বরদের বাড়ি যাই!

রামেন্দুবাবু বলিলেন, আমি এর মধ্যে নেই। তবে আমি সাহেবকেও কিছু বলব না।আপনাদের এর মধ্যেও থাকব না, আপনারা যা হয় করুন।

মি. আলম বলিলেন, একটা কথা আছে এর মধ্যে!

—কি?

—আপনারা সবাই কিন্তু বলুন, এর পরে আমাকে হেডমাস্টার করবেন আপনারা!

মাস্টারেরা দণ্ডমুণ্ডের মালিক নহেন, বেশ ভাল রকমই তাহা জানেন, তবুও ঘাড় নাড়িয়াকেহ সায় দিলেন, কেহ উৎসাহের সহিত বলিলেন, বেশ, বেশ।

অর্থাৎ যে ক্ষমতা তাঁহাদের নাই, অপর একজনের মুখে তাহা তাহাদের আছে শুনিয়ামাস্টারের দল খুশি ও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

রামেন্দুবাবুর দলের দুই-একজন মাস্টার নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিলেন, তাহারা রামেন্দুবাবুকে হেডমাস্টার করিবেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, মি. আলম, তবে আপনাকে মাইনে কম নিতে হবে।

—কত বলুন?

—একশোর বেশি নয়—

—সে আপনাদের বিবেচনা, যা ভাল হয় করবেন।

যদুবাবু বলিলেন, আচ্ছা আপনাকে যদি আর পঁচিশ বেশি দেওয়া যায়, তবে আপনিআমাদের মাইনের বিষয়টাও দেখবেন! এই স্কেল করুন না, গ্র্যাজুয়েট পঞ্চাশ টাকা, আন্ডারগ্র্যাজুয়েট চল্লিশ—

মাহিনার কত স্কেল হইবে, তাহা লইয়া কিছুক্ষণ মাস্টারদেরতুমুল তর্ক-বিতর্কের পর স্থিরহইল, যদুবাবুর প্রস্তাব গ্র্যাজুয়েটদের পক্ষে ঠিকই রহিল, তবে আন্ডার-গ্র্যাজুয়েটদের ত্রিশের বেশিআপাতত দেওয়া চলিবে না।

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, পণ্ডিতদের সম্বন্ধে একটা বিবেচনা করুন।

মি. আলম বলিলেন, আপনারা কত হলে খুশি হন?

যদুবাবু বিষম আপত্তি উঠাইলেন। আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট আর পণ্ডিত এক স্কেলে মাহিনা পাইবে, তাহা হয় না। হেডপণ্ডিত পঁয়ত্রিশ, অন্য পণ্ডিত ত্রিশ ও পঁচিশ।

হেডমাস্টার হওয়ার আসন্ন সম্ভাবনায় উৎফুল্ল মি. আলম যদুবাবুর প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গেলেন। মাস্টারেরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে।

যদুবাবু বলিলেন, আজ দু বছর ধরে আড়াই মাস খেটে এক মাসের টাকা পাচ্ছি—আজএক টাকা, কাল দু' টাকা, এ আর সহ্য হয় না। তার ওপর মাইনে গেল কমে। ইনক্রিমেন্ট তো হলই না আধ পয়সা আজ চোদ্দো বছরের মধ্যে—

হেডপণ্ডিত বলিলেন, আমার উনিশ বছরের মধ্যে—

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, আমার সতেরো বছরের মধ্যে—

বোঝা গেল, সকলেই বর্তমান ব্যবস্থার উপর অসন্তুষ্ট। নতুন কিছু হইলেই খুশি। সকলেরই উন্নতি হইবে, বাজার-খরচ সচ্ছলভাবে করিতে পারিবেন, বাসায় ফিরিয়া পরোটা জলখাবার খাইতে পারিবেন, দুই-একটা জামা বেশি করাইতে পারিবেন, বাড়িতে অনেকেরই বাসনপত্র কম—কিছু থালা বাটি কিনিবেন, কন্যার বিবাহের দেনা কেহ বা কিছু শোধ করিতেপারিবেন।

কাল হইতে স্কুলে ছেলেদের জন্য টিফিনের বন্দোবস্ত হইবে। 'ডি.পি.আই'-এর সারকুলার অনুযায়ী ছেলেদের নিকট হইতে কিছু কিছু খরচা লইয়া স্কুল ছেলেদের টিফিনের সময় জলখাবারের আয়োজন করিবে। সাহেব ঠিক করিয়াছেন—লাল আটার রুটি আর ডাল, ঠাকুর রাখিয়া তৈরি করানো হইবে, প্রত্যেক ছেলেকে দুটি পয়সা দিতে হইবে খাবার বাবদ—দুইখানা রুটি ও ডাল মাথাপিছু।

মি. আলম বলিলেন, শুনুন, মিটিং ভাঙবার আগে আর একটা কথা আছে। কাল থেকেটিফিন দেওয়া হবে ছেলেদের, ওর হিসেবপত্র আর ছেলেদের দেওয়া-থোওয়ার তদারক করতেহবে একজন টিচারকে, আপনাদের মধ্যে কে রাজী আছেন? সাহেব আমাকে লোক ঠিক করতেবলেছেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কে আবার ওই হাঙ্গামা ঘাড়ে নেবে, থাকি টিফিনের সময় একটু শুয়ে—

হেডপণ্ডিত বলিলেন, আমাদের শরৎ-ভায়া বরং করো—ইয়ং ম্যান। তুমি কি বিনোদ—

হিসাবপত্র করিতে হইবেএবং তিনশো ছেলেকে ডাল রুটি দেওয়ার ঝঞ্ঝাট পোহাইতেহইবে বলিয়া কেহই রাজী হয় না। মি. আলম বলিলেন, তাই তো, একটা যা হয় ঠিক করেফেলতে হবে!

যদুবাবু চুপ করিয়া ছিলেন। বলিলেন, তা, তবে—যখন কেউ রাজী হয় না, তখন আরকী হবে, আমাকেই করতে হবে। সাহেবের অর্ডার, না মেনে তো উপায় নেই।

—আপনি নেবেন তা হলে?

—তাই ঠিক রইল মি. আলম। কী আর করি, একটু কষ্ট হবে বটে কিন্তু চাকরি যখন করচি—

কর্তব্যকার্যে এতখানি অনুরাগ যদুবাবুর বড় একটা দেখা যায় না, সুতরাং অনেকে বিস্মিতহইলেন।

মি. আলম বলিলেন, আপনারা নির্ভয়ে নেমে যান। সাহেব টুইশানিতে বার হয়েছে, মেমসাহেবও নেই। কেউ টের পাবে না।

সকলে ভয়ে ভয়ে নীচে নামিয়া গেল।

চায়ের মজলিশে রামেন্দুবাবু বলিলেন, আমাকে আপনারা এর মধ্যে কিন্তু টানবেন না।সকলে বলিলেন, কেন, কেন, কী বলুন?

—মি. আলম হেডমাস্টার হোন, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু সাহেবেরবিরুদ্ধে এ ধরনের ষড়যন্ত্র আমি পছন্দ করিনে। এ ঠিক নয়।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তা ছাড়া আপনি কি ভেবেছেন, এ কখনও হবে? এ হল 'কালনেমিরলঙ্কাভাগ'!

বাহিরে আসিয়া সকলেরই মন হাওয়া-বার-হওয়া বেলুনের মতো চুপসিয়া গিয়াছিল।এতক্ষণ বড় বড় কথা, প্রস্তাব গ্রহণ প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি ব্যাপারের মধ্যে থাকিয়া নিজেদেরপার্লামেন্টের মেম্বরের মতো পদস্থ বলিয়া মনে হইতেছিল। সাহেব-তাড়ানো, সাহেব-বাঁচানো প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ কর্মে ডিক্রি-ডিসমিসের মালিক বুঝি তাহারাই—বর্তমানে ওয়েলেসলি স্ট্রীটেরকঠিন পাষাণময় ফুটপাথে পা দিয়াই সে ঘোর তাঁহাদের কাটিতে শুরু করিয়াছে।

যদুবাবু, যিনি অতগুলি প্রস্তাব আনয়নকারী উৎসাহী মেম্বর, তিনিও টানিয়া টানিয়া বলিলেন, হয় বলে তো বিশ্বাস হচ্ছে না, তবে দেখ—সাহেবকে তাড়াবে কে!

শরৎবাবু বলিলেন, আপনি কখন কোন দিকে থাকেন যদুদা, আপনাকে বোঝা ভার। এইমি. আলমকে গালাগাল না দিয়ে জল খান না, আবার দিব্যি ওঁকে হেডমাস্টার করার প্রস্তাবেরাজী হয়ে গেলেন! কেন, আমরা সকলে ঠিক করেছি রামেন্দুবাবুকে ছাড়া আর কাউকেহেডমাস্টার করা হবে না!

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, আমিও তাই বলি।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমারও তাই মত।

যদুবাবু রাগিয়া বলিলেন, বেশ তোমরা! আমিও বলি, রামেন্দবাবুই উপযুক্ত লোক। আমিওখানে না বলে করি কী? আলম যখন ও-রকম করে বললে, না বলি কী করে?

রামেন্দুবাবু বলিলেন, আপনাদের কারও লজ্জা বা কিছুর কারণ নেই। ক্ষেত্রবাবু ঠিক বলেছেন, এসব কালনেমির লঙ্কাভাগ হচ্ছে। ক্লার্কওয়েল সাহেব যথেষ্ট উপযুক্ত লোক, যদি তিনি চলে যান, তা হলে যে-কেউ হতে পারেন, আমার কোনো লোভ নেই ওতে।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তা নিয়ে এখন আর তর্কাতর্কি করে কী হবে? তবে আমার এই মত, সাহেবের জায়গায় যদি কেউ হেডমাস্টার হওয়ার উপযুক্ত থাকেন স্টাফের ভেতর, তবেরামেন্দুবাবু আছেন।

যদুবাবু বলিলেন, আমি কি বলেচি নয়?

—বলছিলেন তো দাদা, আমি সোজা কথা বলব!

—না, এ তোমার অন্যায় ক্ষেত্রভায়া। তুমি আমার কথা না বুঝে আগেই—

রামেন্দুবাবু হাসিয়া উভয়ের বিবাদ থামাইয়া দিলেন।সেদিনকার চায়ের মজলিশ শেষ হইল।

দিনতিনেক পরে জ্যোতির্বিনোদ ছুটির ঘণ্টা পড়িতেই বাহিরে যাইতেছেন, যদুবাবু ফোর্থক্লাস হইতে ডাক দিয়া বলিলেন, কোথায় যাচ্ছ, ও জ্যোতির্বিনোদ ভায়া?

—একটু কাজ আছে। কেন দাদা?

—না তাই বলছি, এখনই ফিরবে?

—ফিরতে দেরি হবে। শ্যামবাজারে যাব একবার।

—ও!

কিন্তু কী কারণে ওয়েলেসলির মোড় পর্যন্ত গিয়া জ্যোতির্বিনোদের শ্যামবাজার যাওয়ারপ্রয়োজন হইল না। সুতরাং তিনি ফিরিয়া তেতলায় নিজের ঘরে ঢুকিলেন। টিচার্স-রুমের পাশেইছোট ঘর, যাইবার সময় দেখিলেন, যদুবাবু টিচার্স রুমে কী করিতেছেন। কৌতূহলী হইয়া ঘরেঢুকিয়া বলিলেন, কী, একা এখানে বসে এখনও দাদা?

যদুবাবু চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি কী যেন একটা ঢাকিতে চেষ্টা করিলেন, এবং পরেকথা বলিবার প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ ঠিকরাইয়া অস্পষ্টভাবে গোঙরাইয়া কী যেন বলিতে গেলেন।

জ্যোতির্বিনোদ দেখিলেন, যদুবাবুর সামনে টেবিলের উপর শালপাতায় খান পাঁচ-ছয় লালআটার রুটি ও কিছু ডাল—যদুবাবুর মুখ রুটি ও ডালে ভর্তি। আশ্চর্য নয় যে, এ অবস্থায় তাঁহার মুখ দিয়া স্পষ্ট কথা উচ্চারিত হইতেছে না! যদুবাবু ভীষণ আয়াসে ডালরুটির দলাকে জব্দ করিয়া কোনোরকমে গিলিয়া ফেলিলেন এবং স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া অপ্রতিভ মুখেবলিলেন, এই টিফিনের পরে এক-আধখানা বাড়তি রুটি ছিল, তাই বলি ফেলে দিয়ে কী হবে!ঠাকুরকে বললাম, দাও ঠাকুর—

—বেশ বেশ, খান না।

—তা ইয়ে—তুমি যদি খাও, কাল থেকে যদি বাড়তি থাকে, তোমার জন্যেও না হয়— জ্যোতির্বিনোদ কী ভাবিয়া বলিলেন, কেউ আবার লাগাবে মি. আলমের কানে!

যদুবাবু ষড়যন্ত্র করিবার সুরে ও ভঙ্গিতে নিচু গলায় চোখ টিপিয়া বলিলেন, কেউ টের পাবে! তুমিও যেমন! যেখানে আধ মণ ময়দা মাখা হয় ডেলি, সেখানে ছ'খানা কি আটখানারুটির হিসেব কে রাখচে ? আর আমার হাতেই তো হিসেব! তুমি নাও!

জ্যোতির্বিনোদও নির্বোধ নন। তিনি বুঝিলেন, যদুবাবুর এ রুটি খাইতে হইলে ছুটির পরে নির্জনটিচার্স রুম ভিন্ন আর স্থান নাই। সে রুমের পরেই জ্যোতির্বিনোদের থাকিবার ক্ষুদ্র কুঠুরি, তাহাকে অংশীদার না করিলে যদুবাবু উহা একা একা আত্মসাৎ কি করিয়া করিবেন? সেই জন্যই যদুবাবু অত আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, জ্যোতির্বিনোদ কোথায় যাইতেছে, অর্থাৎএখনই ফিরিবে কি না!

ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, তা যদি বাড়তি থাকে, তবে না হয়—

যদুবাবু উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, বাড়তি আছে—বাড়তি আছে—হয়ে যাবে। খানআষ্টেক করে রুটি তোমার জন্যে, তা সে এক রকম হবে এখন। জলখাবারটা বিকেলবেলার, বুঝলে না? পেটে খিদে মুখে লাজ—না ভায়া, ও কোনো কথা নয়।

তিন-চার দিন বেশ খাওয়া-দাওয়া চলিল দুইজনের।

জ্যোতির্বিনোদ দেখিলেন, যদুবাবুক্রমশ রুটির সংখ্যা ও ডালের পরিমাণ বাড়াইতেছেন। একদিন শালপাতা খুলিলে দেখা গেল, বাইশখানা রুটি ও প্রায় সেরখানেক ডাল তাহার ভিতর।

জ্যোতির্বিনোদ ভয় পাইয়া বলিলেন, এ নিয়ে কথা হবে দাদা! এত কেন?

—আরে, নাও না খেয়ে। রাতের খাওয়াটাও এই সঙ্গে না-হয়—সে পয়সাটা তো বেঁচেগেল—এ পেনি সেভড ইজ এ পেনি গট অর্থাৎ—

—কিন্তু দাদা, আমার শরীর খারাপ, আমি এত খেতে পারব না যে!

—বেশ, বেশ, যা পার খাওনা-হয় যা থাকবে, আমিই খাব—ফেলা যাচ্ছে না।

এদিকে মি. আলমের ষড়যন্ত্র বেশ পাকিয়া উঠিল। মি. আলম কয়েকজন মেম্বরের বাড়ি গিয়া তাহাদের বুঝাইলেন, সাহেবকে না তাড়াইলে স্কুলের উন্নতি সম্ভব নয়। মিটিংয়ের দিন পর্যন্তধার্য হইয়া গেল। স্থির হইল, ডাক্তার গাঙ্গুলী সেদিন সাহেবকে সরাইবার প্রস্তাব কমিটিতেউঠাইবেন; কমিটির অন্যতম স্বদেশী মেম্বর সাতকড়ি দত্ত, জনৈক লোহাপট্টির দালাল সে প্রস্তাবসমর্থন করিবে।

রামেন্দুবাবু গোপনে ক্ষেত্রবাবুকে বলিলেন, মি. আলম একদিকে বেশ হেসে কথা বলেহেডমাস্টারের সঙ্গে, আর একদিকে এ রকম ষড়যন্ত্র করে—এ অত্যন্ত খারাপ। আমারমনে হয়, হেডমাস্টারকে ওয়ার্নিং দিয়ে দিলে ভাল হয়।

—কে দেবে?

—আমি দিতে পারতাম, কিন্তু আমার উচিত হবে না। আমি মি. আলমের মিটিংয়ে প্রথমদিন ছিলাম।

—তাই কী? আর তো ছিলেন না। আপনিই গিয়ে বলুন।

—সেটা ভদ্রলোকের কাজ হয় না। আর কাউকে দিয়ে বলাতে পারেন তো বলান।

—আর কে যাবে? এক আপনি, নয়তো নারাণবাবু!

—বুড়োমানুষকে আর এর মধ্যে জড়িয়ে লাভ নেই। হি ইজ টু গুড এ ম্যান ফর অলদীজ—নিরীহ বেচারি, ওঁকে আর এ বয়সে কেন এর মধ্যে?

—আমি বলব?

—আপনার উচিত হবে না। দু-মুখো সাপের কাজ হবে।

—তবে লেট ফেট টেক্ ইটস্ কোর্স —তাই হোক।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষেত্রবাবু ও জ্যোতির্বিনোদ রাত দশটার পরে হেডমাস্টারের দোরে ঘাদিলেন।

সাহেব খয়রাগড়ের রাজকুমারকে পড়াইয়া সবে ফিরিয়াছেন। বলিলেন, কে, নারাণবাবু? ক্ষেত্রবাবু কাশিয়া বলিলেন, না স্যার, আমি ক্ষেত্রবাবু।

—ও। ক্ষেত্রবাবু? এসো এসো। এত রাত্রে ?

ক্ষেত্রবাবু ঘরে ঢুকিয়া সামনের চেয়ারে মেমসাহেবকে দেখিয়া বলিলেন, গুড্ ইভনিং মিস্সিবসন্!

বুদ্ধিমতী মেমসাহেব প্রীতিসম্ভাষণ-বিনিময়ান্তে অন্য ঘরে চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু সাহেবকে সব খুলিয়া বলিলেন।

সাহেব তাচ্ছিল্যের সুরে বলিলেন, এই! তা আমি রিজাইন দিতে প্রস্তুত আছি, তাতে যদিস্কুল ভাল হয়—হোক।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, না স্যার, তা হলে স্কুল একদিনও টিকবে না।

—না, যদি মেম্বররা আমার কাজে সন্তুষ্ট না হন, তবে আমার থাকার দরকার নেই।

—স্যার, আপনি যদি বলেন, তবে আমরাও অন্য অন্য মেম্বরের বাড়ি গিয়ে উলটোতদ্বির করি, আপনাকে পছন্দ করে এমন মেম্বর সংখ্যায় কম নয় কমিটিতে।

সাহেব নিতান্ত উদাসীন ভাবে বলিলেন, আমি এই স্কুল গড়ে তুলেছি, যখন এ স্কুলের ভার আমি নিই, তখন স্কুলে দেড়শো ছেলে ছিল। আমি হাতে নিয়ে চারশো দাঁড়ায় ছাত্রসংখ্যা।তারপর আবার কমে গেল। নতুন প্রণালীতে স্কুল চালাব ভেবেছিলাম, অক্সফোর্ড থেকে শিখে এসেছিলাম, আমার সব নোট করা আছে। একগাদা নোট—দেখতে চাও দেখাব একদিন। কিন্তুযদি কমিটি আমাকে না চায়, রিজাইন দিয়ে চলে যাব। এই অঞ্চলে সবাই আমার ছাত্র—চোদ্দোবছর ধরে এই স্কুলে কত ছাত্র আমার হাত দিয়ে বেরিয়েছে। বুড়ো বয়সে খেতে না পাই, এর বাড়ি একদিন ব্রেকফাস্ট খেলাম, আর-এক ছাত্রের বাড়ি একদিন ডিনার খাওয়ালে—এই রকমকরে চলে যাবে। নারাণবাবু কোথায় ?

—বোধ হয় এখন টুইশানিতে।

—ওই একজন সাধুপ্রকৃতির মানুষ। এ সব কথা নারাণবাবু জানে?

—আমাদের মনে হয় শোনেননি। ওঁর কাছে এ কথা কেউ ইচ্ছে করেই ওঠায় না।

—দেখে এসো তো! যদি এসে থাকে, ডেকে নিয়ে এসো—

নারাণবাবু কিছুক্ষণ পরে জ্যোতির্বিনোদের সঙ্গে ঘরে ঢুকিলেন।

সাহেব বলিলেন, শুনেছেন নারাণবাবু, আমাকে কমিটি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পরামর্শ হচ্ছে!

নারাণবাবু বিস্মিত মুখে অবিশ্বাসের সুরে বলিলেন, কে বললে স্যার?

—জিজ্ঞেস করুন এঁদের। আমার বিশ্বস্ত লেফটেন্যান্ট মি. আলম এই চক্রান্ত করছে। এত্তু ব্রুতি!

নারাণবাবু হাসিয়া বলিলেন, জগতে ব্রুটাসের সংখ্যা কম নেই স্যার! কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে, এতদিন আমি কিছুই শুনিনি এ কথা!

—কোথা থেকে শুনবেন? আপনি থাকেন আপনার কাজ নিয়ে।

—স্যার, আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আপনার কিচ্ছু হবে না।

—ভয় কিসের? আমি রিজাইন দিতে রাজী আছি এই মুহূর্তে!

—আমার মত শুনুন। কাউন্টার প্রোপাগান্ডা একটা করতে হয়—

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমি তা বলেছি। আসুন—আপনি, আমি, শরৎবাবু, গেম্-টিচার সব মেম্বরদের বাড়ি বাড়ি যাই।

—আমার আপত্তি নেই।

হেডমাস্টার বলিলেন, না, নারাণবাবুকে আমি কোথাও নিয়ে যেতে বলিনে। লিভ হিম এলোন। আমি আপনাদেরও যেতে বলিনে। আমি ও-সব জিনিসকে বড় ঘৃণা করি। এটাশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, রাজনীতির আসর নয়, এর মধ্যে দল-পাকানো, ষড়যন্ত্র—এ সবের স্থান নেই। না হয় চলেই যাব।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, স্যার, আমাদের অনুমতি দিন। আমরা দেখি—

নারাণবাবু বৃদ্ধ বটে কিন্তু বেশ তেজী লোক, তাহা বোঝা গেল। তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, একটা কথা বলে যাচ্ছি স্যার, আপনাকে কেউ তাড়াতে পারবে না এ স্কুল থেকে। কিন্তু একটা ভবিষ্যদ্বাণী করি, মি. আলম এ স্কুলে আর বেশিদিন নয়।

সাহেব বলিলেন, ভাল কথা, রামেন্দুবাবুর কী মত?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তিনি নিরপেক্ষ। তিনি কোনো দলেই যেতে রাজী নন।

—হি ইজ্ এ বর্ন্ জেন্টল্ম্যান—জুন লোক দেখলাম এ স্কুলে, একজন সামনেই বসে, আর একজন ওই রামেন্দুবাবু।

পরে হাসিয়া ক্ষেত্রবাবুদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, মাই অ্যাপোলজি টু ইউ, আপনাদের ওপর কোনো মন্তব্য করিনি এতদ্বারা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, স্যার, আমাকে তিনটে টাকা দিন—আমি একবার এই রাত্রেই দু একজন মেম্বারের বাড়ি যাই—ডা. সেনের বাড়ি যাওয়া বিশেষ দরকার। সেক্রেটারি বিপিনবাবু আমাদের দিকে আছেন। মিটিংয়ের দেরি নেই, একটু চটপট চেষ্টা করা দরকার।

সাহেব টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

ক্ষেত্রবাবু বাহিরে আসিয়া নারাণবাবুকে ইঙ্গিতে তাহার সঙ্গে আসিতে বলিলেন।

হেডমাস্টার তখনই দোরের কাছে দাঁড়াইয়া তিরস্কারের সুরে বলিলেন, ক্ষেত্রবাবু, আশাকরি আপনি আমার আদেশ শুনবেন, আমি এখনও এ স্কুলের হেডমাস্টার মনে রাখবেন।নারাণবাবুকে কোথাও নিয়ে যাবেন না, আমার ইচ্ছা নয়, এই সরল-প্রাণ বৃদ্ধকে আপনারা এ সব কাজে জড়ান। আপনি একা চলে যান—

মিটিংয়ের আগে ক্ষেত্রবাবুর দল মেম্বরদের বাড়ি বাড়ি গেলেন। যেখানেই যান, সেখানেই শোনা যায়, অপর পক্ষ কিছুক্ষণ আগে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

স্বদেশীভাবের লোক গাঙ্গুলীর কাছে ক্ষেত্রবাবুর দল অপমানিত হইলেন।

ডা. গাঙ্গুলী বলিলেন, মশাই, আপনারা কীরকম লোক জিজ্ঞেস করি? পান তো পঁচিশত্রিশ মাইনে। সাহেবের খোশামুদি করতে ইচ্ছে হয় এতে? একেবারে অপদার্থ সব! কী শিক্ষাদেবেন আপনারা ছেলেদের? নিজেদের এতটুকুআত্মসম্মান জ্ঞান নেই? সাহেবের হয়ে তদ্বিরকরতে এসেছেন, লজ্জা করে না? সাহেবকে এ মিটিংয়ে তাড়াবই—তারপর আপনাদের মতোঅপদার্থ দু-একজন টিচারকেও সরাতে হবে, তবে যদি এবার স্কুলটা ভাল হয়, ইত্যাদি।

মিটিংয়ের দিন ক্ষেত্রবাবু দল লইয়া আর-একবার দুই-একজন মেম্বরের বাড়ি গেলেন।মেম্বরদের বিশ্বাস নাই, হয়তো ভুলিয়া বসিয়া আছে, ঘন ঘন মনে না করাইয়া দিলে নিশ্চিন্তহওয়া যায় না। সকলেই বলিল, তাহাদের মনে করাইয়া দিতে হইবে না।

ছয়টার সময় মিটিং। বেলা চারটার সময় হইতে উভয় দল আসিয়া স্কুলে বসিয়া রহিল; অথচ কেহ কাহারও প্রতি অসম্মান দেখাইল না। মি. আলম হেডমাস্টারের ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খাতাপত্র কী কী দরকার আছে মিটিংয়ে নিয়ে যাবার জন্য, বলুন।

—বোসো মি. আলম, চা খাবে এক পেয়ালা ?

"থ্যাঙ্কস্, এখন আর থাক।

মিটিং বসিল। সাহেবের অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব। মি. আলমের দলের অত তদ্বির, অত অনুরোধ, অত ধরাধরি, সব বুঝি ভাসিয়া যায়। সাহেবকে সরাইবার সম্বন্ধে কোনো প্রস্তাব কেহ আনেনা—কার্যতালিকার মধ্যে এ প্রস্তাব নাই; সুতরাং 'বিবিধ' কতক্ষণে আসে, সেই অপেক্ষায় উভয় দল দুরুদুরু বক্ষে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ডাক্তার গাঙ্গুলী, যিনি অত লম্ফঝম্প করিয়াছিলেনসাহেব তাড়ানোর জন্য, তিনি মিটিংয়ের গতিক বুঝিয়া সরু মিহি সুরে প্রস্তাব আনিলেন যেসাহেবকে অত বেতন দিয়া এই গরিব স্কুলে রাখা পোষাইতেছে না, বিশেষত নতুন ছাত্র যখন আশানুরূপ ভর্তি হইতেছে না। অতএব সাহেবের বেতন কমানো হউক।

সে প্রস্তাব সমর্থন করিলেন অন্যতম স্বদেশী মেম্বর নৃপেন সেন। সভাপতি প্রস্তাব ভোটে ফেলিতে দেখা গেল, ডা. গাঙ্গুলী আর নৃপেনবাবু ছাড়া প্রস্তাবের পক্ষে আর কাহারও মত নাই; এমন কি শিক্ষকদের প্রতিনিধি মি. আলম পর্যন্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন।

ডা. গাঙ্গুলী মি. আলমকে ডাকিয়া আড়ালে বলিলেন, এটা কী রকম হল মশাই? আপনি আমাদের নাচালেন, শেষে কিনা আপনি নিজে—

মি. আলম বিনীতভাবে যাহা বলিলেন, তাহা সত্যই অসঙ্গত নয়। তিনি এখনও ক্লার্কওয়েল সাহেবের অধীনে চাকুরি করেন, প্রকাশ্যে তিনি কোনো মতেই তাহার বিরুদ্ধে যাইতেপারেন না; বরং শিক্ষকদের প্রতিনিধি হিসাবে শিক্ষকদের স্বার্থ বজায় রাখিয়া তিনি কর্তব্য পালনই করিয়াছেন।

নৃপেন সেন বলিলেন, জানি জানি, আপনাদের এই রকমই মর‍্যাল কারেজ! ঘেন্না হয়, বাঙালি জাতটা এই রকমেই উচ্ছন্নয় গেল! আপনারা কী শেখাবেন ছেলেদের? ছ্যাঃ ছ্যাঃ—

মিটিং-অন্তে যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবুর দলকে সাহেব ডাকাইয়া বলিলেন, কই যত শুনলাম তোমাদের মুখে, তার কিছুই তো নয় ?

ক্ষেত্রবাবুও একটু আশ্চর্য হইয়াছেন। বলিলেন, তাই তো! কিছু বুঝতেও পারলাম নাস্যার।

—যত শুনেছিলে তোমরা, আমার মনে হয় অতখানি সত্যি নয়। মি. আলম অত খারাপমানুষ নয়।

—স্যার, আমাকে মাপ করবেন, আপনি অবিশ্যি মি. আলমকে সন্দেহ করেন না, সে খুবভাল কথা। তবে আমার স্বচক্ষে দেখা এবং স্বকর্ণে শোনা স্যার।

—যাক, সব ভাল যার শেষ ভাল। নারাণবাবুর কথাই খাটল। বলেছিল, অপর পক্ষের চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

কমিটির মেম্বরদের মধ্যে অনেকেই এই মিটিংয়ের পরে আলমের উপর চটিয়া গেলেন।ফলে এক মাসের মধ্যে মি. আলমের মাহিনা আরও কাটিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। কমিটিতেএই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার কোনো বাধা ছিল না, কিন্তু সাহেব এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যথেষ্ট আপত্তি করিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় মিটিংয়ের পরে ক্ষেত্রবাবু হেডমাস্টারের ঘরে ঢুকিলেন।

সাহেব বলিলেন, বসুন, ক্ষেত্রবাবু। কী খবর?

—আর স্যার, আপনি মি. আলমের পক্ষে অতটা না দাঁড়ালেও পারতেন।

—কেন বল তো?

—আপনার খুব বন্ধু নয় ও।

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, ও! তা বলে আমি কি তার প্রতিশোধ নেব ওভাবে? ওসব কাজ আমাদের দ্বারা হবে না। আমরা শিক্ষক—আমি চাই না ক্ষেত্রবাবু যে, স্কুলের মধ্যে এধরনের দলাদলি হয়। আমি চেয়েছিলাম স্কুলটাকে ভাল করতে। অক্সফোর্ড থেকে অনেক কিছুশিখে এসেছিলাম, নতুন প্রণালীতে শিক্ষা দেব ছেলেদের। এখানে এসে সব মিথ্যে হতে চলেছে দেখছি। এখানকার হাওয়াতে দলাদলি ভাসে।

এই সব ঘটনার পর কিছুদিন দলাদলি ও ষড়যন্ত্র ক্ষান্ত রহিল। আবার মাস দুই পরে মি. আলম নতুনভাবে ষড়যন্ত্র শুরু করিল। এবার মেমসাহেবের বিরুদ্ধে। স্কুলে অত টাকা খরচ করিয়া মেম রাখিবার কোনো কারণ নাই। বিশেষত ছেলেদের স্কুলে মেয়েমানুষ শিক্ষয়িত্রী কেন? এবার মি. আলমের ষড়যন্ত্র সফল হইল। স্বদেশী মেম্বরের দল টেবিল চাপড়াইয়া লম্বা বক্তৃতাকরিল। ফলে মিস্ সিবসনের চাকরি গেল। ছেলেরা মিলিয়া চাঁদা তুলিয়া মেমসাহেবের বিদায়অভিনন্দনজ্ঞাপক সভা করিল। মিস্ সিবসন ছোট ছোট ছেলেদের সত্যই ভালবাসিত, বিদায়সভায় বেচারি প্রীতিভাষণ দিতে উঠিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মেমসাহেব চলিয়া যাওয়াতে সাহেবের কষ্ট হইল খুব বেশি। সকলে বলে, বিলাত হইতে আসিবার সময় সাহেব মিস্ সিবসনকে সঙ্গে করিয়া আনেন, গরিবের ঘরের মেয়ে, ইন্ডিয়ায়একটা চাকুরি জুটিয়া যাইবে—ইহাই ছিল উদ্দেশ্য।

এই স্কুলের ভার সাহেব যতদিন হইতে লইয়াছেন, মেমসাহেবেরও চাকরি এখানে ততদিন।

চায়ের মজলিশে সেদিন মাস্টারদের সংখ্যা কিছু বেশি ছিল।

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, আজ আলমের মনস্কামনা পূর্ণ হল।

ক্ষেত্রবাবু যতখানি সাহেবের পক্ষ তদ্বির করিয়াছিলেন, মিস সিবসনের পক্ষ হইয়াতাহার অর্ধেকও করেন নাই। মেমসাহেব যাওয়াতে তিনি ততটা দুঃখিত হন নাই, ভাবগতিকদেখিয়া মনে হইবার কথা। তিনি বলিলেন, তা বটে, তবে আমার মত যদি জিগ্যেস কর—এ চালটা ওদের খুব গভীর!

শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কী রকম?

—এতে সাহেবকেও তাড়ানো হল!

সকলে একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? কেন?

—সাহেব একা এখানে থাকতে পারবে না।

—তা ছাড়া মেম বেচারিই বা যায় কোথায় ? ও তো খুব গরিব ছিল শুনেছি।

—শুনচি মেম দার্জিলিং গিয়ে থাকবে।

খরচ?

দার্জিলিং ল্যাঙ্গোয়েজ স্কুলে টিচার হবে। মিশনারি সোসাইটিকে সাহেব লিখেছিলেন ওরজন্যে, তারা সব ঠিক করে দিয়েছে।

মেমসাহেব যে খুব ভাল টিচার ও ভাল লোক এ বিষয়ে সকলেই দেখা গেল একমত স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মিস সিবসনকে খুব ভালবাসে, তাহারা নিজেদের মধ্যে চাঁদাতুলিয়া নিজেদের ক্লাসের এক গ্রুপ ফোটো মেমসাহেবকে উপহার দিয়াছে।

একজন কে বলিল, ও ভালই হয়েছে, আমাদের মাইনে পঁচিশ-ত্রিশ—আর মেমসাহেবেরমাইনে আশি! অথচ তিনি ইনফ্যান্ট ক্লাসে পড়াবেন? কেন, আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেচি! তোমাদের স্লেভ-মেন্টালিটি কতদূর হয়েছে, তা বুঝতে পারছ না। এ কাজটা মি. আলম ঠিকই করেছে।

ক্ষেত্রবাবু বোধ হয় এইটুকু অপেক্ষা করিতেছিলেন। বলিলেন, আমারও তাই মত। এবারমি. আলমের এতুটুকুঅন্যায় হয়নি। তাই বুঝে এবার তদ্বিরও করিনি। এটা আলমের ন্যায্যকাজ।

চায়ের দোকান হইতে ক্ষেত্রবাবু বাসায় ফিরিলেন। অনিলা স্বামীকে চা করিয়া দিয়া বলিল, কী খাবার যে দেব! মুড়ি রোজ রোজ খেতে পারো কি? ভেবেছিলাম একটু হালুয়া—

—হ্যাঁ, হালুয়া! ঘিটুকু সব খরচ ক'রে না ফেললে তোমার—

—তুমি তো আধ সের করে মাসে দেবে বলেছ, তার মধ্যেই আমি—

—গত মাসের মাইনের মধ্যে দশটি টাকা আজ পাওয়া গেল, এতে তুমি কত ঘি খাবে, আর কী করবে?

অনিলা দুঃখ ও রাগের সুরে বলিল, আমি কি তোমার ঘি খাই! ছেলেমেয়েরা মুড়িচিবুতে পারে না রোজ, তাই কোনোদিন ওদের জন্যে একটু হালুয়া, কি দুখানা পরোটা—

ক্ষেত্রবাবু ঝাঁঝের সঙ্গে বলিলেন, না, কেন মুড়ি খেতে পারবে না? বিদ্যাসাগর মশায় যেখেয়ে পরের বাসায় থেকে লেখাপড়া শিখেছিলেন! তবে ওসব হয়—যখন যেমন অবস্থা, তখন তেমনি থাকবে।

—আধসের ঘি তুমি বরাদ্দ করেছ কি না মাসে, আমি তাই শুনতে চাই।

—করেছিলাম। এ মাস থেকে হয়তো খরচ কমাতে হবে। পাচ্ছি কোথায়? ঘির আইটেমই হয়তো তুলে দিতে হবে!

অনিলা সামনে গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, হ্যাঁগা, সেই সাড়ে নটায় খেয়ে বেরোও আর সাড়ে পাঁচটায় ফেরো! যদি কিছু না হয় ওতে, তবে ও ছাইপাঁশ চাকরি কেনছেড়ে দাও না!

—ছেড়ে তো দেব, তার পর?

—ছেলে পড়াও যেমন পড়াচ্ছ—তাতে হয় না? আর নয়তো চল বাবার কাছে, ওদিকেঅনেক কিছু জুটে যাবে। ডিহিরি-অন্-সোনে আমার সেই শৈলেনকাকা থাকেন, দেখেছ তো তাঁকে? এক মাড়োয়ারির ফার্মে কাজ করেন। ধরে-পেড়ে বললে—সেখানে চাকরি হতে পারে। যদি বলো তো বাবাকে লিখি!

তা না হয় হল। কলকাতা ছেড়ে যেতে কোথাও মন সরে না। এতদিন এখানেআছি—আর কি জানো, স্কুলের ওপরও বড় মায়া। আমার বলে নয়, সব মাস্টারেরই। সুখে-দুঃখেআজ বারো ষোলো বিশ বছর এক জায়গায় আছি। ওই কেমন একটা নেশা—স্কুলবাড়িটা, ছেলেগুলো, ওই চায়ের দোকানের মজলিসটা, হেডমাস্টার—বেশ লাগে। যত কষ্টই পাই, তবুও যেতে পারিনে কোথাও যে, তাই এক এক সময় ভাবি—

—ভাবাভাবির কোনো দরকার নেই, চলো বেরুই। কলকাতার খরচ বেশি অথচ খাওয়া হচ্ছে কী, একটু দুধ তোমার পেটে পড়ে না, একটু ঘি না। আমাদের গয়ায় এগারো সের করেখাঁটি দুধ—

—বুঝি সবই। কিন্তু কোথাও গিয়ে থাকতে পারিনে যে। তোমাদের গয়া কেন, আমারনিজের পৈতৃক গ্রামে চোদ্দো সের করে দুধ টাকায়। পাঁচসিকে উৎকৃষ্ট গাওয়া ঘিয়ের সের—কিন্তু সেবার তোমার দিদি থাকতে নিয়ে

গেলুম—মন টেকে না মোটে। ছেলেমেয়েদের মন মোটেটেকে না—সব কলকাতায় মানুষ। তোমার দিদি তো ছটফট করতে লাগল দেশে। তা ছাড়া ম্যালেরিয়াও আছে—

এই সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, ক্ষেত্রবাবু আছেন?

—কে ডাকচে দেখ তো জানলা দিয়ে?

অনিলা দেখিয়া বলিল, একটা ছেলে। তোমার স্কুলের ছেলে নাকি, দেখ না!

ক্ষেত্রবাবু বাহিরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে আবার ঢুকিয়া বলিলেন, সেই তোমার অথর গো, সেই যে সেদিন বলেছিলাম—অথর রাখাল মিত্তির! তিনি তাঁর ছেলের হাত দিয়ে চিঠিদিয়েছেন, তার অসুখ, বড় কষ্ট পাচ্ছেন, আমি যেন গিয়ে দেখা করি—

অনিলা ব্যগ্রভাবে বলিল, আহা, তা যাও! কষ্ট পাচ্ছেন, সত্যি তো—অথর একজন—যাও—

ক্ষেত্রবাবু ছেলেটির পিছু পিছু ইটিলি সাউথ রোডের মধ্যে এক অন্ধ গলির ভিতরে গিয়া পড়িলেন। ছেলেটি তাঁহাকে একটা দরজার সামনে দাঁড় করাইয়া বলিল, আপনি দাঁড়ান, দরজাখুলে দি।

সে কোন দিক দিয়া চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন, আমি নিজেও ঠিক চৌরঙ্গীতেথাকিনে, কিন্তু এ কী গলি, বাপ্!

দরজা খুলিল। দরজার পাশে ক্ষুদ্র একটা রোয়াকের সামনে অন্ধকার এক ঘরে ছেলেটি তাঁহাকে লইয়া গেল। এত অন্ধকার যে প্রথমে বোঝা যায় না, ঘরের মধ্যে কিছু আছে কি না!অন্ধকারের ভিতর হইতে একটা ক্ষীণ স্বর তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, কে? ক্ষেত্রবাবুএসেছেন?

ক্ষেত্রবাবু দেখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া চোখ ঠিকরাইয়া একটা বিছানা বা কিছুরঅস্পষ্ট আভাস ও একটি শায়িত মনুষ্যমূর্তি-গোছ যেন দেখিতে পাইলেন। আর অগ্রসর নাহইয়া দাঁড়াইলেন, কিছু বাধিয়া ঠোকর খাইয়া পড়িয়া না যান।

ক্ষীণস্বর চিঁ-চিঁ করিয়া বলিল, ওই জানালার ওপরটাতে বসুন। ওরে, একটা কিছু পেতেদে না! ও রাধু—

থাক থাক, পেতে দিতে হবে না। আপনার কী হয়েছে?

—আর কী হবে! জ্বর আর কাশি আজ পনেরো দিন। পড়ে আছি। উত্থানশক্তিরহিত—

—তাই তো দেখতে পাচ্ছি। বড় কষ্ট পাচ্ছেন তো!

এইবার ক্ষেত্রবাবু ঘরের ভিতরটা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। ওই যে রাখালবাবুতাকিয়া ঠেস দিয়া মলিন বিছানায় কাত হইয়া আছেন, পাশে একটা ততোধিক মলিন লেপ, বিছানার এক পাশে দড়ির আলনাতে দু-চারখানা ময়লা ও আধময়লা কাপড় ঝুলিতেছে, বিছানারসামনে একটা তাক, তাকের উপর অনেক বই কাগজ। এক পাশে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন।দেওয়ালে কয়েকখানি সস্তা ধরনের ক্যালেন্ডার—বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক বিক্রেতাদের নাম ও বিজ্ঞাপনছাপানো। ঘরের আসবাবপত্রের বীভৎস দারিদ্র্যে গরিব স্কুলমাস্টার ক্ষেত্রবাবুও যেন শিহরিয়াউঠিলেন।

—কতদিন অসুখ বললেন?

—তা আজ দিন পনেরো।

—কেউ দেখছে?

—না, দেখেনি। পয়সা নেই, সত্যি কথা বলতে কি ক্ষেত্রবাবু, আজ তিন দিন ঘরে একপয়সাও নেই। ছেলেকে পাঠিয়েছিলাম রাধাকৃষ্ণ কর অ্যান্ড সন্সের দোকানে। আমার সেই—সেই—সেই—(রাখালবাবু একটু হাঁপ জিরাইলেন) রচনার বইখানা দশ কপি পাঠিয়ে দিয়েএকখানা চিঠি লিখে দিলাম, বলি—এখন বইগুলো রেখে দাম দাও, আমি পঁয়ত্রিশ পার্সেন্টকমিশন দেব, এখন আমার হাত বড্ড টানাটানি যাচ্ছে—তা ব্যাটারা বই ফেরত

দিয়েছে। ও বই নাকি কম বিক্রি—ও এখন বিক্রি হবে না। আপনি তো জানেন, চেতলা স্কুলের হেডমাস্টার —নব ব্যাকরণ-সুধা প্রথম ভাগ।

—আচ্ছা, আপনি একটু বিশ্রাম করুন।

—বিশ্রাম আমি করছি সারাদিনই। কিন্তু আমি বলি, দেখুন ক্ষেত্রবাবু, যারা জিনিস চেনে, তাদের কাছে জিনিসের কদর! চেতলা স্কুলের হেডমাস্টার নব ব্যাকরণ-সুধা দেখে বললে, মিত্তির মশাই, এমন বই একালে কে লিখছে আপনি ছাড়া? আপনাকে বলেছি বোধ হয় ক্ষেত্রবাবু, ব্যাকরণে ছাত্রবৃত্তিতে ফাস্ট স্ট্যান্ড করি, মেডেল আছে। দেখতে চান তো দেখাতেপারি।

—না, দেখাতে হবে কেন? আপনি ঠিকই বলছেন। তা চেতলা স্কুলে বই ধরালেআপনার?

—না। বললে—আগে যদি আসতেন! কাকে বুঝি কথা দিয়ে ফেলেছে! আসছে বারেপ্রমিস্ করেছে ধরিয়ে দেবে। আর ওই শাঁকারিটোলা হাই স্কুলে রচনাদর্শখনা পাঠাতে বলেছিল—নমুনা। কিন্তু নমুনা পাঠিয়ে পাঠিয়ে হয়রান। বই ধরাবেন না, নমুনা পাঠাও—

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, ওসব আমরাও জানি। বই ধরাবার ইচ্ছে নেই, বই পাঠান—

রাখালবাবু উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া পাশের তাকে হাত বাড়াইতে গেলেন।

—আপনাকে দেখাই, আর একখানা নীচের ক্লাসের ব্যাকরণ লিখছি—আপনাকে দেখাইখাতাখানাতে লিখছিলাম—

কাশির বেগে রাখালবাবুর খাতা বাহির করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, থাক থাক, এখন রাখুন।

—বড় কষ্ট পাচ্ছি। কেউ নেই, কাকে বলি! তাই ছেলেটাকে প্রথমে আপনার স্কুলে পাঠাই, সেখানে দরোয়ান আপনার বাসার ঠিকানা বলে দিয়েছে, তাই বাসায় গিয়েছিল। এখন কী করি, একটা পরামর্শ দিন দিকি ক্ষেত্রবাবু।

—তাই তো! খুবই বিপদ। বাসাতে কে কে আছেন?

—আমার স্ত্রী, দুটি ছোট ছোট ছেলে, এক বিধবা ভগ্নী, তার একটি মেয়ে—এই। রোজ দুটি করে টাকা হলে তবে সংসার বেশ চলে। এক পয়সা আয় নেই, তায় দু’ টাকা—কী করাযায় বলুন! খেতে পায়নি বাড়িতে আজ দু’ দিন। আপনার কাছে খুলে বলতে লজ্জা নেই—

ক্ষেত্রবাবুর মনে যথেষ্ট দুঃখ ও সহানুভূতির উদ্রেক হইল। নিজেকে তিনি ওই অবস্থায় ফেলিয়া দেখিলেন কল্পনায়। কিন্তু তিনি কী করিবেন! তাহার হাতে বাড়তি পয়সা এমন নাই, যাহা দিয়া তিনি এই দুস্থ বৃদ্ধ গ্রন্থকারকে সাহায্য করিতে পারেন। পরামর্শই বা তিনি কী দিবেন? একমাত্র পরামর্শ হইতেছে পয়সাকড়ির পরামর্শ। কিন্তু কে এই বৃদ্ধকে অর্থসাহায্য করিবে, সেকথাই বা তিনি কী করিয়া জানিবেন? বাধ্য হইয়া দুঃখের সঙ্গে ক্ষেত্রবাবু সে কথা জানাইলেন।তাহার এ ক্ষেত্রে করিবার কিছু নাই। কোনো পথই তিনি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছেন না।

মুশকিল হইল যে, এই সময় রাখাল মিত্তিরের ছেলেটি ভাঙা পেয়ালায় চা আনিয়াক্ষেত্রবাবুর হাতে দিল। রাখালবাবুর স্ত্রী শুনিয়াছেন, তাঁহার স্বামীর একজন বিশিষ্ট প্রতিপত্তিশালীবন্ধু আসিবেন। চিঠি লইয়া ছেলে তাঁহার কাছে গিয়াছে। তিনি আসিলে দুঃখের একটা কিনারাহইবেই। এখন সেই ভদ্রলোকটি আসিয়াছেন শুনিয়া গৃহিণী তাড়াতাড়ি যথাসাধ্য অতিথিসৎকার করিয়াছেন। গরিবের ঘরে এই ভাঙা পেয়ালায় একটু চায়ের পিছনে যে কত ভরসা নির্ভরতা আবেদন নিহিত, ক্ষেত্রবাবু তাহা বুঝিলেন বলিয়াই চায়ের চুমুক যেন গলায় বাধিতেছিল। এখানেআসিলেই হইত। পকেটে আছে মাত্র আট আনা পয়সা। তাই কি দিয়া যাইবেন! সে-ই বা কেমন দেখাইবে!

রাখালবাবু স্বয়ং এ দ্বিধা ঘুচাইয়া দিলেন : তা হলে উঠবেন? আচ্ছা, কিছু কি আপনার পকেটে আছে? যা থাকে! বাড়িতে খাওয়া হয়নি ও-বেলা থেকে—দুটো একটা টাকা—এমনবিপদে পড়ে গিয়েছি!

ক্ষেত্রবাবু ছেলেটির হাতে একটা আট-আনি দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

সমস্ত সন্ধ্যাটা যেন বিস্বাদ হইয়া গেল। সামনেই একটা ছোট পার্ক, ছেলেমেয়েরা দোলনায় দোল খাইতেছে, লাফালাফি করিতেছে, আনন্দকলরবমুখর পার্কের সুবজ ঘাসের উপর দুই-একটি আপিস-প্রত্যাগত কেরানী বসিয়া বিড়ি টানিতেছে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় দুলিতেছে রেলিংয়ের ধারের গাছে, আলু-কাবলির চারিপাশে উৎসাহী অল্পবয়স্ক ক্রেতার ভিড় লাগিয়াছে। ক্ষেত্রবাবুএকখানা বেঞ্চের এক কোণে বসিলেন। বেঞ্চির উপর দুইটি লোক বসিয়া ঘরভাড়া আদায় করারঅসুবিধা সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতেছে।

ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন, রাখালবাবুও তাহার মতো স্কুলমাস্টার ছিলেন একদিন। আজ অক্ষমও পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাই এই দুর্দশা। বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, টুইশানিও জোটে না আর।স্কুলমাস্টারের এই পরিণাম!

বেশি দূর যাইতে হইবে না, তাহাদের স্কুলেই রহিয়াছেন নারাণবাবু—তিন কুলে কেহ নাই, আজীবন পূতচরিত্র, আদর্শ শিক্ষক, কিন্তু স্কুলের চোর-কুঠুরির ঘরে নির্জন আত্মীয়হীন জীবনযাপন করিতেছেন আজ আঠারোবছর কি বাইশ বছর, কে খবর রাখে? আজ যদি চাকুরি যায়, কাল আশ্রয়টুকুও নাই। ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক অবস্থায় ক্ষেত্রবাবু টুইশানিতে চলিয়াছেন, কে পিছন হইতে বলিল, স্যার, ভাল আছেন?

ক্ষেত্রবাবু পিছন ফিরিয়া চাহিলেন, একটি সুবেশ তরুণ যুবক। বেশ দামী সুট পরনে, চোখে কাঁচকড়ার চশমা। মৃদু হাসিয়া বলিল, চিনতে পারছেন না স্যার?

—না, কই, ঠিক—তুমি আমাদের স্কুলের?

—হ্যাঁ, স্যার। অনেক দিন আগে, এগারো বছর আগে—পাস করি। আমার নাম সুরেশ।

—সুরেশ বসু?

—না স্যার, সুরেশ মুখার্জি। সেবার সেই সরস্বতী পুজোর সময়ে আমাদের বারে ভাঁড়ার লুঠ করে ছেলেরা, মনে আছে? হেডমাস্টার ফাইন করেছিলেন সব ছেলেদের, মনে হচ্ছে স্যার?

—হ্যাঁ, একটু একটু মনে হচ্ছে যেন। তোমাদের ছেলেবেলার কথা হিসেবে এসব যত মনে থাকে, আমাদের তত মনে রাখবার ব্যাপার নয় বাবা। বুঝতেই পারচ! কী করো এখন?

—আজ্ঞে স্যার, রাঁচিতে চাকরি করি, এঞ্জিনীয়ার।

—ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিলে বুঝি বাবা?

—আজ্ঞে, শিবপুর থেকে পাস করে বিলেত যাই। আজ তিন বছর বিলেত থেকে ফিরে গভর্নমেন্ট সার্ভিস করছি রাঁচিতে—পি. ডবলিউ. ডি.-তে অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনীয়ার।

—কী নাম বললে, সুরেশ মুখার্জি? এখন চেনা-চেনা মুখ বলে মনে হচ্ছে। অনেক দিনের কথা—আর কত ছেলে আসে-যায়, কাজেই সব মনে রাখা—

—নিশ্চয় স্যার, ঠিক কথা। পুরোনো মাস্টারদের মধ্যে কে কে আছেন স্যার? যদুবাবুআছেন?

—হ্যাঁ, শ্রীশবাবু, থার্ড পণ্ডিত আছেন, নারাণবাবু আছেন—

—নারাণবাবু আজও আছেন স্যার? উঃ, অনেক বয়স হল তাঁর! তিনি কি স্কুলের সেইঘরেই থাকেন—আচ্ছা, একবার দেখা করে আসব। বড্ড ইচ্ছে হয়। চাকরটা আছে, কেবলরাম?

—হ্যাঁ, আছে বইকি। যেয়ো না একদিন স্কুলে।

যুবকটি পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু সগর্বে একবার চারিদিকেচাহিলেন—লোকে দেখুক, এমন একজন সুট-পরা তরুণ যুবক তাহার পায়ের ধূলা লইতেছে। তাহাকে বেশ সুন্দর দেখিতে, সাহেবের মতো চেহারা। কবে হয়তো ইহাকে পড়াইয়াছিলেন মনেনাই, তবুও তোতাঁহাদের স্কুলের ছাত্র। আজ দু পয়সা করিয়া খাইতেছে। বিলাতফেরত অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার—এরকম হয়তো কত ছাত্র কত দিকে আছে, সকলের সন্ধান তো জানানাই।

এইটুকু ভাবিয়াই সুখ। এই ছাত্রের দল তাহাদের বাল্যজীবনের শত সুখস্মৃতির আধার, তাহাদের স্কুল ও স্কুলের শিক্ষকদের ভুলে নাই; কেহ আছে বর্মায়, কেহ আছে সিমলায়, কেহ বাকুমায়ুন, শিলং, মসলিপত্তনে। তবুও দেশের আশা-ভরসাস্থল পুত্র প্রতিম এই সব তরুণ দল একদিন তাহাদেরই হাতে চড়টা-চাপড়টা খাইয়া ইংরেজি ব্যাকরণের নিয়ম শিখিয়াছে, বীজগণিতের জটিল রহস্য বুঝিয়াছে—ভাবিয়াও আনন্দ হয়।

ক্ষেত্রবাবু পাশের গলিতে ঢুকিয়া টুইশানি-পড়া ছাত্রের বাড়ি কড়া নাড়িলেন।

চৈত্র মাস। ইস্টারের ছুটি আজই হইয়া গেল। যদুবাবু মেসে ফিরিয়া দেখিলেন, অবনী চিঠি লিখিয়াছে—তিনি যদি এই মাসের মধ্যে বউদিদিকে এখানে হইতে লইয়া না যান, তবেসে বউদিদিকে কলিকাতায় আনিয়া যদুবাবুর মেসে রাখিয়া যাইবে।

মাত্র পাঁচটি টাকা হাতে—স্কুলের টাকা এ মাসে সামান্যই পাওয়া গিয়াছিল, কোন্ কালে খরচ হইয়া গিয়াছে মেসের দুই মাসের দেনা মিটাইতে। সামান্য কিছু স্ত্রীকে পাঠাইয়াছিলেন, এপাঁচটা টাকা টুইশানির অগ্রিম আদায়ী আংশিক মাহিনা। স্ত্রীকে রাখিবার কোনো অসুবিধা হইতনা বেড়াবাড়ি, যদি নিজের বাড়িঘর সেখানে থাকিত। কিন্তু পৈতৃক বাড়ি ভূমিসাৎ হওয়ার পরেযদুবাবু সেখানে আর যান নাই, সেই হইতেই পথে পথে, বাসায়। আজ দেড় বৎসরের উপর স্ত্রীকে বেড়াবাড়ি পরের সংসারে ফেলিয়া রাখিয়াছেন, ইচ্ছা করিয়া কি? তাহা নয়। নিরুপায় হিসাবে।

এখন গিয়া স্ত্রীকে ওখান হইতে সরাইতেই হইবে।

নতুবা ইতর অবনীটা সত্যসত্যই হয়তো স্ত্রীকে মেসে আনিয়া হাজির করিবে। লোকটাকাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানহীন কিনা।

সাত-পাঁচ ভাবিয়া যদুবাবু টিকিট কাটিয়া সিরাজগঞ্জ-প্যাসেঞ্জারে রাত্রে রওনা হইলেনএবং শেষরাত্রে বগুলায় নামিয়া, স্টেশন রাত কাটাইয়া, পরদিন সকালে সাত ক্রোশ হাঁটিয়া বেলা আড়াইটার সময় গলদঘর্ম ও অভুক্ত অবস্থায় বেড়াবাড়ি পৌঁছিলেন।

অবনী বলিল, আসুন দাদা, তা একেবারে ঘেমে—এঃ, ওরে নিতে কাপালীকে ডেকে এনেগাছ থেকে দুটো ডাব পাড়ার ব্যবস্থা কর। হাত-পা ধুয়ে নিন—তারপর ভাল সব?

যদুবাবু ঠাণ্ডা হইলেন। স্ত্রীকে দেখিয়া কিন্তু চমকিয়া উঠিলেন। অবনীর বিধবা দিদি ক্ষান্তবলিল, বউ প্রায় কেবল জ্বরে ভুগেচে ওদিকে—এই মাসখানেক ফাগুনে হাওয়া পড়ে একটু ভালআছে। তাও দু'বার পড়ল। ঘোর মেলেরিয়া এ সব দিকে। দেখ না, ওই অবনীর ছেলেমেয়েগুলো ভুগে ভুগে হাড্ডি-সার। না একটু ওষুধ, না চিকিচ্ছে—কোথায় পাবে? সামান্য আয়, এদিকেসকালে উঠে দু কাঠা চালের খরচ। বোসো, একটা ডাব কেটে আনি ভাই—

যদুবাবুর স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল। বেচারির ভাগ্যে আজ প্রায় এক বছর পরে তাহার দর্শনলাভঘটিল।

যদুবাবু বলিলেন, কেঁদো না। এঃ, তোমার চেহারা দেখতে বড্ডই—

—হ্যাঁ, বড্ডই! মরে যাচ্ছিলাম কার্তিক মাসে। মরে বেঁচে উঠেছি। আচ্ছা, মানুষ কী করে। এমন হতে পারে? এত করে চিঠি দিলাম, একবার চোখের দেখা—

—তুমি তো বললে চোখের দেখা। হাতে পয়সা না থাকলে তো আর—

—হ্যাঁ গো যদি মরেই যেতাম, তা হলে একবার তোমার সঙ্গে দেখাটাও যে হত না!

—সে সবই বুঝলাম। আমার অবস্থাটা তোমরা দেখবে না তো? তোমাদের কেবল—

যদুবাবুর স্ত্রী ঝাঁজের সহিত বলিল, অমন কথা বলো না, মুখে পোকা পড়বে। আমি যেমননীরবে সয়ে গেলাম এমন কেউ সহ্যি করবে না, তা বলে দিচ্ছি। রাত্রে জ্বরে পুড়েছি, শুধু মন হাঁপিয়েছে—মরে গেলে তোমাকে একটিবার চোখের দেখাটা হল না বুঝি, তাও কাউকে আমিবিরক্ত করিনি। চারিদিকে চাহিয়া সুর নিচু করিয়া বলিল, আর এমন চামার! এমনচামার! একপয়সার সাবু না, এক পয়সার মিছরি না। বরং তুমি যে টাকা পাঠাতে মাসে মাসে, তা থেকে কেবল আজ দাও এক টাকা, কাল দাও আট আনা—ওই অবনী ঠাকুরপো! না দিলেও চক্ষুলজ্জা, ওদের বাড়ি, ওদের ঘরে জায়গা দিয়েছে। জায়গা দিয়েচে কি অমনি! ওই টাকাটা সিকেটা তোআছেই—আর এদিকে বাক্যির জ্বালা কী! এক-একদিন ইচ্ছেহত—এই সত্যি বলচি দুপুরবেলা— ব্রাহ্মণের সামনে মিথ্যে বলিনি যে, গলায় দড়ি দিয়ে মরি—।

এই সময়ে অবনীর বিধবা দিদি (তিনি যদুবাবুরও বড়) ডাব কাটিয়া আনিয়া বলিলেন, বউ, এক গ্লাস জল নিয়ে এসো, আর এই রেকাবিতে দুখানা বাসোতা—কোথায় কী পাব বল ভাই! বাসোতা দুখানা খেয়ে একটু জল—আমি গিয়ে ভাত চড়াই।

যদুবাবুর স্ত্রী জলহাতে আসিয়া বলিল, ঠাকুরঝি লোকটা এই বাড়ির মধ্যে ভাল লোক। নইলে বউ—ও বাবাঃ—খুরে খুরে নমস্কার! বলিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিয়া জলের গ্লাসটাযদুবাবুর সম্মুখে নামাইয়া রাখিল।

বৈকালের দিকে অবনী বলিল, দাদার কি এখন গুডফ্রাইডের ছুটি?

—হ্যাঁ।

—ক'দিন ?

—মঙ্গলবার খুলবে। ওই দিন ওকে নিয়ে যাব ভাবছি।

—তাই নিয়ে যান। এখানে বউদিদির শরীরও টিকছে না, মনও টিকছে না। তাই কখনও টেকে? আপনি রইলেন পড়ে কলকাতায়, উনি রইলেন এখানে। ছেলে নেই, পিলে নেই—আপনার বউমার কাছে কেবল কান্নাকাটি করেন, দুঃখ করেন। নিয়ে যান, সেই ভাল। তা ছাড়াআমাদের এখানে অসুবিধে। ঘরদোর নেই—দুখানি মাত্র ঘর। আবার আমার ছোট ভগ্নীপতি শিশির নাকি আসবে শুনছি ছেলেমেয়ে নিয়ে—কতদিন আসেনি, তারা এলেই বা কোথায় থাকে? তাই বলি, দাদাকে চিঠি লিখি, দাদা এসে ওঁকে নিয়েই যান।

না, তুমি যা করেছ, যথেষ্ট উপকার করেছ। এতদিন কে রাখে! যাই, একটু বেড়িয়েআসি—

এ বেড়াবাড়ি গ্রামের বাহিরে খুব বড় বড় মাঠ—আধ মাইল কি তারও কম দূরে চূর্ণী নদী। নদীর ধারে খেজুরগাছ, নিমগাছ ও ভাঁটসেওড়ার বন। এখন নিমফুলের সময়, চৈত্রেরতপ্ত বাতাসে নিমফুলের সুবাস-মাখানো ঘেঁটুফুলের দল কিছুদিন আগে ফুটিয়া শেষ হইয়াগিয়াছে—এখন শুধু রাঙা রাঙা সুঁটির মেলা ভাঁটগাছের মাথায় মাথায়। উত্তর দিকের মাঠেপ্রকাণ্ড একটা কচিপাতা-ভরা বটগাছের শীর্ষদেশ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া। কিছুদিন আগে সামান্যবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, চষা-ক্ষেতের মাঝে মাঝে জল জমিয়া ছিল, এখনও আধশুকনো কাদায় তারচিহ্ন আছে। একটা তুঁতগাছের তলায় অনেক শুকনো তুঁতফল পড়িয়া আছে। যদুবাবু একটাতুঁতফল কুড়াইয়া মুখে দিলেন—মনে পড়িল, বাল্যকালে এই সময় তুঁতফল খাওয়ার সে কত আগ্রহ! কোথায় গেল সে সব সুখের দিন! বাবা গোয়াড়ি কোর্টে কাজ করিতেন, শনিবারে শনিবারে গ্রামের বাড়িতে আসিতেন, হাঁড়ি-ভর্তি খাবার আনিতেন ছেলেমেয়ের জন্য। তাহাদের বাড়িতে মোংলা বলিয়া এক গোয়ালা-ছোঁড়া থাকিত। সরভাজা খাইবার লোভে সে ছুটিয়া গিয়া রাস্তায় দাঁড়াইত—কর্তা হাঁড়ি-হাতে আসিতেছেন, না শুধু হাতে আসিতেছেন দেখিবার জন্য।

নদীতে ডিঙিনৌকায় জেলেরা মাছ ধরিতেছে। যদুবাবু বলিলেন, কী মাছ রে?

—আজ খয়রা আছে কর্তা।

—দিবি চার পয়সার, যাব? অনেকদিন দেশের খয়রা মাছ খাইনি। টাটকা খয়রা মাছটা—

যদুবাবু অবনীর দিদির হাতে মাছ দিয়া বলিলেন, ও দিদি, এই নাও। দেশের খয়রা মাছকত কাল খাইনি!

রাত্রে পাড়ায় এক জায়গায় সত্যনারায়ণের সিন্নি উপলক্ষে যদুবাবু অবনীর সঙ্গে তাহাদের বাড়ি গেলেন। বাড়ির কর্তা যদুবাবুকে যথেষ্ট খাতির করিয়া বসাইল, তামাক সাজিয়া আনিলনিজের হাতে। তাহার বড় ছেলের একটা চাকরি হইতে পারে কিনা কলিকাতায়? ছেলেটিকেডাকিয়া আনিয়া পরিচয় করাইয়া দিল। ম্যাট্রিকে দুইবার ফেল করিয়া সম্প্রতি আজ বছরখানেকবসিয়া আছে। পূর্বেকার অভিজ্ঞতা হইতে যদুবাবু সাবধান হইয়াছিলেন, আবার কলিকাতার মেসেকি বাসায় জুটিয়া উৎপাত করিতে শুরু করিলেই চক্ষুস্থির। পাড়াগাঁয়ের লোককে বিশ্বাস নাই।সুতরাং তিনি বলিলেন, তিনি চেষ্টা করিবেন, তবে এখন কিছু বলিতে পারেন না—আজকাল কত বি. এ., এম.এ., পাস ফ্যা-ফ্যা করিতেছে, তা ম্যাট্রিক!

রাত্রে স্ত্রীকে বলিলেন, তা হলে আর একটা মাস এখানে

—না, তা হবে না। আমায় নিয়ে যাও এবার।

—কিন্তু কোথায় নিয়ে যাই বলো তো?

—তা তুমি বোঝো।

যদুবাবু মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিলেন, তুমি বোঝো! বুঝি কী, সেটা আমায় দেখিয়ে দাও !কলকাতায় কি বাসা ঠিক করে রেখে এসেছি যে, তোমায় নিয়ে ওঠাব? উঠবে কোথায়? শেয়ালদা ইস্টিশানে বসে থাকবে?

যদুবাবুর স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল।

—আঃ, কী মুশকিলেই পড়েছি বিয়ে করে! ঝাড়া-হাত-পা থাকলে আজ আমার ভাবনা কি? তোমার ভাবনা ভাবতে ভাবতেই প্রাণ গেল।

যদুবাবুর স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমার ভাবনা কী ভাবতে হচ্ছে তোমায়? ফেলেরেখেছ এখানে আজ দেড় বছর—জ্বরে ভুগে ভুগে আমার শরীরে কিছু নেই, তাও তোমাকে কিকিছু বলেছি? মুখনাড়া আর খোঁটা দুটি বেলা হজম করতে হত যদি আমার মত, তবে বুঝতে!এততেও তোমার কাছে ভাল হলাম না। তার চেয়ে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরি, তুমি ঝাড়াহাত-পা হও, আপদ চুকে যাক।

—আচ্ছা থামো থামো, রাত-দুপুরে কান্নাকাটি ভাল লাগে না। ঘুম আসছে। ওরা শুনতেপাবে—এক ঘর, এক দোর, দেখি যা হয়—

—তুমি এবার না নিয়ে গেলে অবনী ঠাকুরপো শুনবে নাকি? স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ হয়েছেএবার আমাকে তোমার সঙ্গে ওরা পাঠিয়ে দেবেই। ওদের বাড়িতে জায়গা হচ্ছে না—ওর ভগ্নীপতি নাকি আসবে শুনচি এ মাসের শেষে। সত্যিই তো, ঘরদোর নেই, ওদের অসুবিধে হয়বইকি। এতদিন তো রাখলে।

—হ্যাঁ, রেখেছে তো মাথা কিনেচে কি না! ভারি করেছে! আর আমার মেসে গিয়ে যেসাত দিন থেকে এল, আজ সিনেমা রে, কাল ইয়ে রে, তখন?

—তুমি বুঝি অবনী ঠাকুরপোকে টাক দাওনি সেবার, সে কী খোঁটা আর তোমার নামে কী সব কথা আমায় শুনিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে দিনরাত! আমি বলি, আর তো আমার সহ্যি হয় না, এক দিকে চলেই যাই কি, কী করি! এত কষ্ট গিয়েছে সে সময়—

—আচ্ছা, থাক সে-সব কথা এখন। রাত হয়েছে ঘুম আসছে—সারাদিন খাটুনি আররাত্তিরকালে ভ্যাজর ভ্যাজর ভাল লাগে না।

যদুবাবু বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহার স্ত্রী নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। কিছুকাল পরে বলিল, ঘুমুলে নাকি? ওগো!

যদুবাবু বিরক্তির সুরে বলিলেন, আঃ, কী ?

—তোমার পায়ে পড়ি, আমায় এবার এখানে রেখে যেয়ো না। আমি আর সহ্যি করতে পারছি নে—তুমি বোঝো। কখনও তো তোমায় এমন করে বলিনি—কেবল ওই ঠাকুরঝিরজন্যে এখানে এতদিন থাকতে পেরেছি। নইলে কোন্ কালে এতদিন—একবার রটিয়ে দিলে, তুমিনাকি বিয়ে করেছ, আমার ছেলেপিলে হল না বলে। বলে, দাদা সেইজন্যেই বউদিদিকে ত্যাগ করে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে গিয়েছে। সে কত কথা! আমি ভেবে কেঁদে মরি। শুধুঠাকুরঝি আমায় বোঝাত, বউ, তার কি এখন বিয়ের বয়স আছে যে বিয়ে করবে? তুমি ওসবশুনো না।

—তুমিও কি ভাব নাকি আমার বিয়ের বয়স নেই?

—বয়েস থাকলে কী হবে, একটা বিয়ে করে তাই খেতে দিতে পারো না, দুটো বিয়ে করে তোমার উপায় হবে কী? কুঁজোর সাধ হয় চিত হয়ে শুতে—

এই কথায় যদুবাবুর পৌরুষের অভিমান ভীষণভাবে আহত হওয়ায় তিনি আর কোনো কথা না বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন এবং বোধ হয় খানিকক্ষণ পরেই গভীর নিদ্রায় অভিভূতহইলেন।

চুনি এবার থার্ড ক্লাসে উঠিল। চেহারা আরও সুন্দর হইয়াছে, ওষ্ঠে গোঁফের ঈষৎ রেখাদেখা দিয়াছে।

নারাণবাবু পড়াইতে গিয়া তাহার সঙ্গে গল্প করেন নানা বিষয়ে—চুনিকে ছাড়িয়া যেনউঠিতে ইচ্ছা হয় না। চুনির মধ্যে একটি সুদুর্লভ রহস্য ও বিস্ময়ের ভাণ্ডার যেন গুপ্ত আছে, নারাণবাবু নানাকথায় ও প্রশ্নে সেই রহস্যভাণ্ডারের সন্ধান খুঁজিয়া বেড়ায়। চুনি আসিবামাত্রনারাণবাবু কেমন আত্মহারা হইয়া যান—ভাল করিয়া পড়াইতেও যেন পারেন না, কেবল তাহারসহিত গল্প করিতে ইচ্ছা করে। অথচ চুনি তাঁহাকে কী দিতে পারে? তাঁহাকে সে রাজা করিয়াদিবে না, নারাণবাবু তাহা ভালই জানেন; তবুও কেন এমন হয়, কে জানে? মাস্টার পড়াইতে আসিয়া ঘনঘন ঘড়ির দিকে তাকায়, উঠিতে পারিলে বাঁচে; অথচ নারাণবাবুর উঠিতে ইচ্ছা করে , রাত্রি বেশি হইয়া যায়, চুনি পান্না ঘুমে ঢুলিয়া পড়ে, কলিকাতার কলকোলাহল নীরব হইয়াআসে। নারাণবাবু ধমক দিয়া বলেন, এই চুনি, এই পান্না, ঢুলছিস নাকি? পান্না চমকিয়া উঠিয়া বইয়ের পাতায় মন দিবার চেষ্টা করে, নিচু সলজ্জ সুরে বলে, ঘুম আসছে স্যার, রাত অনেকহল—

চুনির মায়ের সুর খোলা দ্বারপথে ভাসিয়া আসে : আজ তোদের কি হবে না নাকি? সারারাত বসে ভ্যাজর ভ্যাজর করলেই বুঝি ভাল পড়ানো হয় ?

পরে ঈষৎ নেপথ্য হইতে শ্রুত হইল সেই একই কণ্ঠের সুর : বুড়ো মাস্টারটা বসে বসে করে কী এত রাত পর্যন্ত ? এত করে বলি ওঁকে, বুড়ো মাস্টার বদলে ফেল—বুড়ো দিয়ে কি নেকাপড়া হয় ?

চুনি লাফাইয়া উঠিয়া বাড়ির মধ্যে মাকে হয়তো বা মারিতে ছোটে।

নারাণবাবু ধমক দিয়া চিৎকার করিয়া বলেন, এই চুনি, কোথায় যাস? পান্না যা তো, তোর দাদাকে ধরে নিয়ে আয়।

কিছুক্ষণ পরে চুনি ছুটাছুটিতে ঘর্মাক্ত রাঙা মুখে আসিয়া বসিয়া হাঁপাইতে থাকে।

—কোথায় গিয়েছিলি?

—কোথাও না স্যার।

—এই সব জ্ঞান হচ্চে তোমার, না?

—না স্যার। আপনি তাই সহ্য করেন, আপনার খেয়াল নেই কোনো দিকে। আমাদের বাড়িতে আসেন, তা আমাদের কত ভাগ্যি। রোজ রোজ মা এরকম করবে, আমি—

—ছিঃ, মার সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে নেই ছেলের। মায়ের বিচার কি ছেলে করবে? আমারই দেরি হয়ে গিয়েছে আজ, উঠি বরং—

—না স্যার, বসুন না আপনি।

চুনির মার কণ্ঠস্বর পুনরায় দ্বারপথে শ্রুত হইল : খাবি নে পোড়ারমুখো ছেলে ? বামনী কি এত রাত পর্যন্ত তোমাদের ভাত নিয়ে বসে থাকবে নাকি?

নারাণবাবু লজ্জিত কৈফিয়তের সুরে অন্তরালবর্তিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, হ্যাঁবউমা, আমি এই যে যাই—যাচ্ছি—একটু দেরি হয়ে গেল আজ—

ঈষৎ নম্রসুরে উদ্দেশে উত্তর আসিল, ভাত নিয়ে থাকতে হয় ঠাকুরঝি, তাই বলি। নইলে মাস্টার পড়াচ্ছে, পড়াক না—আমি কি বারণ করি?

নারাণবাবু গলির ভিতর দিয়া চলিয়া আসিলেন, মনে অভূতপূর্ব আনন্দ। চুনি তাঁহার দিকেহইয়া মাকে মারিতে গিয়াছিল, তাহাকে চুনি তবে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, ভক্তি করে! কেন এআনন্দ রাখিবার জায়গা নাই, বৃদ্ধ নারাণবাবু তা বুঝিতে পারেন। তাঁহার কেহ আপনার জন নাই এ বিশাল দুনিয়ায়; তবু চুনি আছে, বড় হইলে তাঁহাকে দেখিবে।

স্কুল-বাড়ির বড় ছাদে রাত্রে আহারাদির পর নারাণবাবু পায়চারি করেন—বহুকালেরঅভ্যাস। আকাশের নক্ষত্ররাজি এই তেতলার ছাদ হইতে বেশ দেখা যায় বলিয়াই নারাণবাবুএই সময়ে উন্মুক্ত আকাশতলে বেড়াইতে ভালবাসেন। ডাকিলেন, ও জগদীশ ভায়া, খাওয়াদাওয়া হল ?

টিচারদের ঘরের পাশে ক্ষুদ্র টিনের একখানি চালায় জ্যোতির্বিনোদ মাছ ভাজিতেছিলেন, উত্তর দিলেন, না দাদা, এই ছেলে পড়িয়ে এসে রান্না চড়িয়েছি। ও দাদা, আজ কী হয়েছিল জানেন?বলিতে বলিতে জ্যোতির্বিনোদ বাহিরে আসিলেন; আজ ওই লালবাড়ির সেই যে ছেলেটা ছাদে উঠে ডন কষত, সে আজ বউ নিয়ে এল।

নারাণবাবু আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন বউ হল?

—খাসা বউ হয়েছে—ওরই মতো ফরসা, দু'জনে ছাদে বেড়াচ্ছিল, খুব হাসিখুশি—

—আহা, তা হোক, তা হোক—

—যাই দাদা, মাছ পুড়ে গেল কড়ায়।

কী জানি কেন, নারাণবাবুর হঠাৎ মনে পড়িল একটা ছবি। চুনি বিবাহ করিয়া বউআনিয়াছে, যেমন চমৎকার রূপবান ছেলে, তেমনি লক্ষ্মী-প্রতিমার মতো বধূ। পুত্রবধূর সাধ তাঁহার মিটিয়াছে। চুনি বলিতেছে, আমার বউ স্যার, আপনার সেবা করবে না তো কার সেবা করবে? চুনি পুরীতে বউ লইয়া বেড়াইতে গিয়াছে, সঙ্গে তাহাকে লইয়া গিয়াছে, কারণ তাহারশরীর খারাপ। পুত্রের কর্তব্য করিয়াছে সে।

চুনির বউ বলিতেছে, বাবা, আপনার পায়ে কি এ বেলা তেল মালিশ করতে হবে?

স্বপ্নাচ্ছন্ন অতীত দিবসগুলির কুয়াশা ভেদ করিয়া কত অস্পষ্ট মুখ উঁকিমারে! দুপুরেরসময় টিফিনের ছুটিতে কিংবা বেলা পড়িলে কতবার তিনি এই রকম ছাদে বেড়াইতেন, এইছাদটিতে উঠিলেই সেই পুরানো দিন, তাহাদের সঙ্গে জড়িত কত মুখ মনে পড়ে।

একখানি মুখ মনে পড়ে—সুন্দর মুখখানি, ডাগর চোখে নিষ্পাপ দৃষ্টি, আট-ন' বছরেরছেলে, নাম ছিল সুদেব। মুখের মধ্যে লেবেনচুষ পুরিয়া দিত, তখন নারাণবাবুর মাথার চুলেসবে পাক ধরিয়াছে, টিফিনের সময় রোজ পাকা চুল আটগাছি দশগাছি তুলিয়া দিত। বলিত, আপনাকে ছেড়ে কোনো স্কুলে যাব না স্যার।

তারপর আর ভাল মনে হয় না—অগণিত ছাত্রসমুদ্রে দূর হইতে দূরান্তরে তাহাদেরঅপস্রিয়মাণ মুখ কখন যে হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল, তার হিসাব মনের মধ্যে খুঁজিয়া মেলেআর। জীবনের পথ বহু পথিকের আসা-যাওয়ার পদচিহ্নে ভরা, কোথাও স্পষ্ট, কোথাওঅস্পষ্ট।

ঘরে আসিয়া শুইবার ইচ্ছা হইল না, নারাণবাবু আবার ডাকিলেন, ও জগদীশ, কী করলেরান্নাবান্না ?

জোতির্বিনোদ অন্নপিণ্ডরুদ্ধ স্বরে বলিলেন, খেতে বসেছি দাদা।

—আচ্ছা, খাও খাও—

এই স্কুলবাড়ির ছোট ঘরটিতে কত কাল বাস! কত সুপরিচিত পরিবেশ, কত দূরঅতীতের স্মৃতিভরা মাস, বৎসর, যুগ! আশপাশের বাড়ির গৃহস্থজীবনের কত সুখ, আনন্দ, সঙ্কটতাঁহার চোখের উপর ঘটিয়া গিয়াছে। মনে মনে তিনি এই অঞ্চলের পাড়াসুদ্ধ ছেলে-মেয়ে, তরুণী কন্যা বধূদের বুড়ো দাদু, যদিও তাহাদের মধ্যে কেহই তাহাকে জানে না, চেনে না। আদর্শশিক্ষক অনুকূলবাবুর স্মৃতিপূত এই বিদ্যালয়গৃহ, এ জায়গা যে কত পবিত্র—কী যে এখানেএকদিন হইয়া গিয়াছে, তার খোঁজ রাখেন শুধু নারাণবাবু।

আজ মনে এত আনন্দ কেন?

কী অপূর্ব আনন্দ, একটা তরুণ মনের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আজ তিনি আকর্ষণকরিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছেন। অনুকূলবাবু বলিতেন, দেখ নারাণ, একটা বেলগাছে বছরে কতবেল হয় দেখেছ? একটা বেলের মধ্যে কত বিচি থাকে, প্রত্যেক বিচিটি থেকে এক হাজারমহীরূহ জন্মাতে পারে। কিন্তু তা জন্মায় না। একটা বেলগাছের ষাট-সত্তর বৎসরব্যাপী জীবনে অত বিচি থেকে গাছ জন্মায় না—অন্তত দুটি বেলচারা মানুষ হয়, বড় হয়, আবার বহু বেল ফল দেয়। বহু অপচয়ের হিসেব কষেই এই পুষ্টির ইঞ্জিনিয়ারিং দাঁড় করিয়ে রেখেছেন ভগবান্। তার মধ্যেই অপচয়ের সার্থকতা। স্কুলের সব ছেলে কি মানুষ হয় ? একটা স্কুল থেকে ষাট বছরে দুটো-একটা মানুষ বার হলেও স্কুলের অস্তিত্ব সার্থক। এই ভেবেই আনন্দ পাই নারাণ। প্রত্যেক শিক্ষক, যিনি শিক্ষক নামের যোগ্য—এই ভেবেই তাঁর আনন্দ ও উৎসাহ। দেশের সেবায়সবচেয়ে বড় অর্ঘ্য তারা যোগান—মানুষ।

জ্যোতির্বিনোদ নারাণবাবুর সামনে বিড়ি খান না। আড়ালে দাঁড়াইয়া ধূমপান শেষ করিয়া ছাদের এধারে আসিয়া বলিলেন, দাদা, এখনও খাননি? রাত অনেক হয়েছে।

—না, খাব না, শরীরটা আজ তেমন ভাল নেই।

—কী হয়েছে দাদা? দেখি, হাত দেখি? তাই তো, আপনার যে জ্বর হয়েছে। ছাদে ঠাণ্ডা লাগিয়ে বেড়াবেন না, বেশ গা গরম। চলুন, নীচে দিয়ে আসি।

বোসো বোসো। এ একটু-আধটু গা-গরমে কিছু আসবে-যাবে না। আকাশের নক্ষত্র চেনো? তুমি তোজ্যোতিষ নিয়ে ব্যবসা করো, অ্যাস্ট্রনমি জানো? ওই যে এক-একটা নক্ষত্র দেখছ—এক একটা সূর্য। আমি যদি বলি, এই পৃথিবীর মতো বহু হাজার পৃথিবী ওই সব নক্ষত্রের মধ্যেআছে, তা হলে তুমি কি তার প্রতিবাদ করতে পারো?

—আজ্ঞে না দাদা, প্রতিবাদ তো দূরের কথা—আমি কথাটি বলব না, আপনি যত ইচ্ছেবলে যান। যখন ও নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি—আপনি যেমন জ্যোতিষ আলোচনা করেননি কখনও, বলেন ওসব মিথ্যে—

—মিথ্যে বলিনে, আন্‌সায়েন্টিফিক বলি।

—ওই একই কথা দাদা। দু পয়সা করে খাই, কাজেই বিশ্বাস করি।

নারাণবাবু ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। রাত্রে ভয়ানক পিপাসা। সমস্ত গায়ে ব্যথা। ঘুমের ঘোরে আর জ্বরের ঘোরে কত কী অস্পষ্ট স্বপ্ন দেখিলেন—চুনির মুখ, তাঁহার ছেলে নাই, কেহকোথাও নাই। কেন! এত ছাত্র আছে, চুনি আছে, শিয়রে চুনি বসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছে।

পরদিন নারাণবাবু সকালে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিলেন না। দুই-চার দিন গেল, তবুও জ্বর কমে না। ক্ষেত্রবাবু ও রামেন্দুবাবু প্রায়ই আসিয়া বসিয়া থাকেন। হেডমাস্টার প্রথমে নিজের ঔষধের বাক্স হইতে বাইওকেমিক দিলেন, তারপর ডাক্তার ডাকাইলেন। জ্যোতির্বিনোদ কোথা হইতে নিজের দেশের এক কবিরাজ আনিলেন। ছাত্রেরা কেহ কেহ দেখিয়া গেল। পালাকরিয়া রাত জাগিতেও লাগিল।

সকালে স্কুলের মাস্টারেরা দেখিতে আসিয়া খবরের কাগজে একটা খুনের সংবাদ শুনাইয়া গিয়াছিল। নারাণবাবু শুইয়া ভাবিতেছিলেন, মানুষে কী করিয়া খুন করে? একবার তিনি এই স্কুলের ঘরেই রাত্রে আলো জ্বালিয়া পড়িতেছিলেন, ডেয়ো-পিঁপড়ের দল আসিয়া জুটিল লণ্ঠনেরআশেপাশে—চাপড় মারিয়া গোটাতিনেক ডেয়ো-পিঁপড়ে মারিয়াছিলেন। তারপর সে কী দুঃখ তাঁহার মনে! একটা ডেয়ো-পিঁপড়ে আধমরা অবস্থায় ঠ্যাং নাড়িয়া চিত হইয়া ছটফট করিতেছিল, সেটাকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই সেটাকেবাঁচানো গেল না। নারাণবাবুর মনে হইল, তিনি জীবহত্যা করিয়াছেন—দুঃখ ও অনুতাপেনিজেকে অতি নীচ বলিয়া বিবেচনা হইল। কী জানি, মানুষকে বিচার করার ভার মানুষের উপর নাই। তিনি যে খুনী নহেন, তাহা কে বলিবে?

নারাণবাবু শুইয়া যেন সমস্ত জীবনের একটা ছবি চোখের সামনে খেলিয়া যাইতে দেখিতে পান। তারাজোল গ্রামের উত্তরে প্রকাণ্ড তালদীঘি, তাহার পাড়ে ঘন তালের বন, কোন্‌কালে রাঢ় অঞ্চলের ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতেরা সেই দীঘির পাড়ে মানুষ মারিত। কাঁটাজঙ্গলের ঝোপ, আঁচোড়বাসক ফুলের গাছ নিবিড় হইয়া উঠিয়া মানুষের উগ্র লোলুপতার লজ্জা শ্যামল শান্তি ও বনকুসুমের গন্ধে ঢাকিয়া দিয়াছে। চীনা পর্যটক আই সিং যেমন বলিয়াছেন—মনও অন্তঃকরণের তৃষ্ণা হইতেই দুঃখ আসে, পুনর্জন্ম আসে। কিন্তু তৃষ্ণা দূর করো, লোভকে ঢাকিয়ামনে শান্তি স্থাপন করো—ভ্রমণসমুদ্রে মানবাত্মার পরিভ্রমণ শেষ হইবে। না, কী যেনভাবিতেছিলেন—তারাজোল গ্রামের তালদীঘির কথা। মনের মধ্যে উল্টা-পাল্টা ভাবনা আসিতেছে।

পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বের সেই হুগলি জেলার অন্তঃপাতী ক্ষুদ্র গ্রামখানি আজ আবারস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, মুখুজ্জেবাড়ির ছেলে ছুনু ছিল সঙ্গী, ছুনুর সঙ্গে বাঁশতলায়বাঁশের শুক্‌না খোলা কুড়াইয়া অনিয়া নৌকা করিতেন। একবার তেঁতুলগাছে উঠিয়া তেঁতুলপাড়িতে গিয়া হাত ভাঙিয়াছিলেন, সাত ক্রোশ হাঁটিয়া দামোদরের বন্যা দেখিতে গিয়া পথেএক গ্রামে কামারবাড়ি রাত্রে তিনি ও তাহার দুইজন বালক সঙ্গী চিঁড়া-দুধ খাইয়া তাহাদেরদাওয়ায় শুইয়াছিলেন—যেন কালিকার কথা বলিয়া মনে হইতেছে। কতকাল তারাজোলযাওয়া হয় নাই!

কেহ নাই আপনার লোক সে গ্রামে। বহুদিন আগে পৈতৃক বাড়ি ভাঙিয়া-চুরিয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে তিন দিনের জন্য তারাজোল গিয়া প্রতিবেশীর বাড়িকাটাইয়া আসিয়াছিলেন, আর যান নাই। তখনই বাল্যদিনের সে বাড়িঘর জঙ্গলাবৃত ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়াছে দেখিয়াছিলেন—হ্যাঁ, প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে।

নারাণবাবু মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে

জ্যোতির্বিনোদ ও যদুবাবু একসঙ্গে ঘরে ঢুকিলেন।

যদুবাবু বলিলেন, কেমন আছেন দাদা? এই দুটো কমলালেবু—ওহে জ্যোতির্বিনোদ, দাওনা রস করে।

শ্রীশবাবু উঁকি মারিয়া বলিলেন, কে ঘরে বসে?

যদুবাবু বলিলেন, এই আমরাই আছি। এসো শ্রীশ ভায়া।

—দাদা কেমন?

—এই একটু কমলালেবুর রস খাওয়াচ্ছি।

নারাণবাবুর তৃষিত দৃষ্টি দোরের দিকে চাহিয়া থাকে। দুই দিন, তিন দিন, কোনো দিনইচুনিকে দেখিতে পান না। চুনি আসে না কেন ? বোধ হয় সে শোনে নাই তাহার অসুখের কথা।

সকলে চলিয়া যায়। গভীর রাত্রি। টিমটিম করিয়া আলো জ্বলিতেছে।

উত্তর মাঠে গ্রামের বাঁশবনের ও-পারে দুইটি লোক আকন্দ গাছের পাকা ও ফাটা ফলসংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছে—তুলা বাহির করিয়া খেলা করিবে। তিনি আর ছুনু। প্রায় পঞ্চাশবৎসর পূর্বের তারাজোল গ্রাম। ছুনুবাঁচিয়া নাই—প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে মারা গিয়াছে।...

—কে?

—আমি কমলেশ স্যার, আমাদের নাইট-ডিউটি আজ। বিমলও আসছে।

—নারাণবাবু বলিলেন, হ্যাঁ কমলেশে, চুনিকে চিনিস?

—না স্যার।

—থার্ড ক্লাসে পড়ে—ভাল নামটা কী যেন! দীপ্তি বোধ হয়—

—হ্যাঁ স্যার।

—কাল একবার বলবি বাবা—

নারাণবাবু হাঁপাইতে লাগিলেন। কথা বলিবার শ্রম সহ্য হয় না।

—বলব স্যার, আপনি বেশি কথা বলবেন না—গরমজলটা করি। মালিশটা— পরদিন সকাল হইতে নারাণবাবু আর মানুষ চিনিতে পারেন না।

কমলেশ ও বিমল চুনিকে গিয়া বলিল। চুনি মহাব্যস্ত, আজ তাহাদের পাড়ার ম্যাচ, তাহাকে ব্যাকে খেলিতে হইবে। আচ্ছা, খেলার পর বরং—রাত্রেই সে চেষ্টা করিয়া দেখিবে।

চুনি আসিয়াছিল, কিন্তু নারাণবাবু আর তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। লোকে বলিতেছিল, তাঁহার জ্ঞান নাই। সে কথা আসলে ঠিক নয়। তিনি তখন তারাজোল গ্রামের মাঠে, বনে, দামোদরের বাঁধে বাল্যসঙ্গী ছুনু আর গদাই নাপিতের সঙ্গে আকন্দগাছের ফলের তুলা সংগ্রহকরিতে ব্যস্ত ছিলেন, পঞ্চাশ বৎসর আগের দিনগুলির মতো। চুনির কণ্ঠস্বরও তাঁহাকে সেখানহইতে ফিরাইতে পারিল না।

কখনও বা অনুকূলবাবু তাঁহাকে বলিতেছিলেন, নারাণ, মানুষ তৈরি করতে হবে। তুমি আরআমি দুজনে যদি লাগি—।... বউবাজারে এই স্কুলের একটা ব্রাঞ্চ খুলব সামনের বছর থেকে। তুমি হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার। সব বেলফলের বিচি থেকে কি চারা হয়? বহু অপচয়েরঅঙ্ক হিসেবে ধরেই ভগবানের এই সৃষ্টি। ভগবানের গৃহস্থালী কৃপণের গৃহস্থালী নয় নারাণ।...

স্কুল-মাস্টারের মধ্যে সবাই তাঁহার খাটিয়া বহন করিয়া নিমতলায় লইয়া গেল। হেডমাস্টার নিজের পয়সায় ফুল কিনিয়া দিলেন। অনেক ছাত্রও সঙ্গে গেল। শুধু ক্লার্কওয়েলসাহেবের স্কুল নয়, আশেপাশের দুই-তিনটি স্কুলও এই আদর্শ শিক্ষাব্রতীর মৃত্যুতে একদিন করিয়াবন্ধ রহিল।

যদুবাবু বাজার করিয়া বাসায় ফিরিলেন। স্কুলের সময় হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীকে বলিলেন, মাছটা ভেজে দাও, নটা বেজে গিয়েছে—আজ একজামিন আরম্ভ হবে কি না। ঠিক টাইমে নাগেলে সাহেব বকাবকি করবে।

শীতকালের বেলা। বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হইবে বলিয়া যদুবাবু সকালে উঠিয়া বাসার অতিক্ষুদ্র দাওয়াটাতে দাড়ি কামাইতে বসিয়াছিলেন। দাড়ি কামানো শেষ করিয়া বাজারে গিয়াছিলেন।

দৈর্ঘ্যে সাত ফুট, প্রস্থে সাড়ে তিন ফুট ঘর—দাওয়ার এক পাশে রান্নাঘর। ঘরের জানালা খুলিলে পিছনের বাড়ির ইট-বাহির করা দেওয়াল চোখে পড়ে। ভাগ্যে শীতকাল, তাই রক্ষা—সারা গরমকাল ও বর্ষাকালে ভীষণ গুমটে অধিকাংশ দিন রাত্রে ঘুম হইত না, তাই সাড়ে আটটাকা ভাড়া।

ভাত খাইতে খাইতে যদুবাবু বলিলেন, বাসা বদলাব, এখানে মানুষ থাকে না, তার ওপর অবনীটা এ বাসার ঠিকানা জানে। ও যদি আবার এসে জোটে—

যদুবাবুর স্ত্রী বলিল, তা অবনী ঠাকুরপো তোমার স্কুলে যাবে, স্কুল তো চেনে। বাসাবদলালে কী হবে! কী বুদ্ধি!

—ওগো, না না। স্কুলে আমাদের যার-তার ঢোকবার জো নেই। দারোয়ানকে বলে রেখেদেব, হাঁকিয়ে দেবে। এ বাড়ির ভাড়াটাও বেশি।

—এর চেয়ে সস্তা আর খুঁজো না। টিকতে পারবে না সে বাসায়। এখানে আমি যে কষ্টেথাকি! তুমি বাইরে কাটিয়ে আসো, তুমি কী জানবে?

—কলকাতার বাইরে ডায়মণ্ডহারবার লাইনে গড়িয়া কি সোনারপুরে বাসা ভাড়া পাওয়াযায়—সস্তা, কিন্তু ট্রেন ভাড়াতে মেরে দেবে।

স্কুলে যাইতে কিছু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। মি. আলম ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ক্লাসেপেপার দেওয়া হয়নি। এত দেরি করে এলেন প্রথম দিনটাতেই?

একটু পরেই হেডমাস্টারের টেবিলের সামনে গিয়া যদুবাবুকে দাঁড়াইতে হইল। সাহেব বলিলেন, যদুবাবু, বড়ই দুঃখের কথা—কাজে আপনার আর মন নেই দেখা যাচ্ছে।

—না স্যার, বাড়িতে অসুখ।

—ওসব ওজর এখানে চলবে না—মাই গেট ইজ ওপন—যদি আপনার না পোষায়— —স্যার, এবার আমায় মাপ করুন—আর কখনও এমন হবে না।

ব্যাপার মিটিয়া গেল। যদুবাবু আসিয়া হলে পরীক্ষারত ছেলেদের খবরদারি আরম্ভ করিলেন।

—এই দেবু, পাশের ছেলের খাতার দিকে চেয়ে কী হচ্ছে?

একটি ছেলে উঠিয়া বলিল, তিনের কোশ্চেনটা স্যার একটু মানে করে দেবেন?

—কই, দেখি কী কোশ্চেন! এ আর বুঝতে পারলে না? বুড়োধাড়ি ছেলে—তবেপড়াশুনোর দরকার কী?

—স্যার, এধারে ব্লটিংপেপার পাইনি—একখানা দিয়ে যাবেন—

হেডমাস্টার একবার আসিয়া চারিদিক ঘুরিয়া দেখিয়া গেলেন। গেম-টিচার পাশের ঘরেচেয়ারে বসিয়া একখানা নভেল পড়িতেছিল, হেডমাস্টারকে হলে ঢুকিতে দেখিয়া বইখানা টেবিলেরক্ষিত ছেলেদের বইয়ের সঙ্গে মিশাইয়া দিল। পিছনের বেঞ্চিতে দুইটি ছেলে পাশাপাশি বসিয়াবই দেখিয়া টুকিতেছিল, হেডমাস্টারকে পাশের হলে ঢুকিতে শুনিয়া বইখানা একজন ছেলেতাহার শার্টের তলায় পেটকোঁচড়ে গুঁজিয়া ফেলিল।

জিনিসটা এবার গেম-মাস্টারের চোখ এড়াইল না, কারণ তাহার দৃষ্টি আর নভেলেরপাতায় নিবদ্ধ ছিল না, ধীরে ধীরে কাছে গিয়া ছেলেটির পিঠে হাত দিয়া গেম-টিচার কড়াসুরে হাঁকিল, কী ওখানে? দেখি বার কর—

ছেলেটির মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। সে বলিল, কিছু না স্যার—

—দেখি কেমন কিছু না—

বলা বাহুল্য, বই নিছক জড়পদার্থ, যেখানে রাখ সেখানেই থাকে, টানিতেই বাহির হইয়া পড়িল, ছেলেটি বিষণ্ণমুখে দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। তাহার অপকার্যের সাথী পাশের ছেলেটি তখন একমনে খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিতান্ত ভালমানুষের মতো লিখিয়াচলিয়াছে।

দণ্ডায়মান ছাত্রটি হঠাৎ তাহার দিকে দেখাইয়া বলিল, স্যার, ক্ষিতীশও তো এই বই দেখেলিখছিল!

ক্ষিতীশ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আমি! আমি টুকছিলাম?

গেম-টিচার বইখানি ক্ষিতীশকে দেখাইয়া বলিলেন, এই বই দেখে তুমিও টুকছিলে ?

ক্ষিতীশ অবাক হইয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া বইখানির দিকে চাহিয়া রহিল, যেন জীবনে সেএই প্রথম সে বইখানা দেখিল।

—আমি স্যার টুকব বই দেখে! আমি!

তাহার মুখের ক্ষুব্ধ, অপমানিত ও বিস্মিত ভাব দেখিয়া মনে হয়, যেন গেম-মাস্টার তাহাকে চুরি বা ডাকাতি কিংবা ততোধিক কোনো নীচ কার্যে অপরাধী স্থির করিয়াছেন।

সুতরাং সে বাঁচিয়া গেল। তাহার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নাই—এক আসামী ছাত্রের উক্তিছাড়া গেম-মাস্টার কিছু দেখেন নাই। আসামী হেডমাস্টারের টেবিলের সম্মুখে নীত হইল, সেখানেও সে তাহার সঙ্গীর নাম করিতে ছাড়িল না।

হেডমাস্টার হাঁকিলেন, বি এ স্পোর্ট, আর ইউ নট অ্যাশেমড অফ নেমিং ওয়ান অফইওর ক্লাসমেটস্—কাম, হ্যাভ ইট—

সপাসপ বেতের শব্দে আশেপাশের ঘরের ও হলের ছাত্রেরা ভীত ও চকিত দৃষ্টিতেহেডমাস্টারের আপিস-ঘরের দিকে চাহিল।

ঢংঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িল।

পাহারাদার শিক্ষকেরা হাঁকিলেন, ফিফটিন্ মিনিটস্ মোর—

একটি ছেলে ও-কোণে দাঁড়াইয়া বলিল, স্যার, আমাদের ক্লাসে দেরিতে কোশ্চেন্ দেওয়াহয়েচে—

যদুবাবুই এজন্য দায়ী। তিনি হাঁকিয়া বলিলেন, এক মিনিটও সময় বেশি দেওয়া হবে না—

কারণ তাহা হইলে আরও খানিকক্ষণ তাঁহাকে সে ক্লাসের ছেলেগুলিকে আগলাইয়া বসিয়াথাকিতেহয়। ছেলেরা কিন্তু অনেকেই আপত্তি জানাইল। মি. আলমের কাছে আপীল রুজু হইলঅবশেষে। আপীলে ধার্য হইল, সেই ক্লাসের ছেলেরা আরও পনেরো মিনিট বেশি সময় পাইবে।যদুবাবুকে অপ্রসন্নমুখে আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল।

কেরানী প্রত্যেক টিচারের কাছে স্লিপ পাঠাইয়া দিল,মাহিনা আজ দেওয়া হইবে, যাইবার সময় যে যার মাহিনা লইয়া যাইবেন।

প্রায় সব টিচারই সারা মাস ধরিয়া কিছু কিছু লইয়া আসিয়াছেন—বিশেষ কিছু পাওনা কাহারও নাই। কাটাকাটি করিয়া কেহ বারো টাকা, কেহ পনেরো টাকা হাতে করিয়া বাড়ি ফিরিলেন। ইহার মধ্যে যদুবাবুর অভাব সর্বাপেক্ষা বেশি, তাহার পাওনা দাঁড়াইল পাঁচ টাকা কয়েক আনা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, চা খাবেন নাকি যদুদা? চলুন।

যদুবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আর চা! যা নিয়ে যাচ্ছি এ দিয়ে স্ত্রীর এক জোড়াকাপড় নিয়ে গেলেই ফুরিয়ে গেল।

দুইজনে চায়ের দোকানে গিয়া ঢুকিলেন।

ক্ষেত্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কী খাবেন যদুদা? আর এখন তো স্কুলের মধ্যে আপনিবয়সে বড়, নারাণবাবু মারা যাওয়ার পরে।

—দেখতে দেখতে প্রায় দু বছর হয়ে গেল। দিন যাচ্চে, না জল যাচ্চে! মনে হচ্ছে সেদিন মারা গেলেন নারাণদা।

—হেডমাস্টারকে বলে নারাণবাবুর একটা ফোটো, কি অয়েলপেন্টিং—

—পাগল হয়েছ ভায়া, পুওর স্কুল, মাস্টারদের মাইনে তাই আজ পনেরো বছরের মধ্যেবাড়া তো দূরের কথা, ক্রমে কমেই যাচ্চে—তাও দু মাস খেটে এক মাসের মাইনে নিতে হয়। এ স্কুলে আবার অয়েলপেন্টিং ঝুলানো হবে নারাণবাবুর—পয়সা দিচ্চে কে?

দোকানের চাকর সামনে দুই পেয়ালা চা ও টোস্ট রাখিয়া গেল। যদুবাবুবলিলেন, না, না, টোস্ট না, শুধু চা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, খান দাদা, আমি অর্ডার দিয়েছি, আমি পয়সা দেব ওর।

—তুমি খাওয়াচ্চ? বেশ বেশ, তা হলে একখানা কেকও অমনি—

দুইজনে চা খাইতে খাইতে গল্প করিতেছেন, এমন সময় খবরের কাগজের স্পেশাল লইয়া ফিরিওয়ালাকে ছুটিতে দেখা গেল—কী একটা মুখে চিৎকার করিয়া বলিতে বলিতে ছুটিতেছে। ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কী বলচে দাদা? কী বলছে?

দোকানী ইতিমধ্যে কখন বাহিরে গিয়াছিল। সে একখানা কাগজ আনিয়া টেবিলের উপররাখিয়া বলিল, দেখুন না পড়ে বাবু—জাপান, ইংরেজ আর মার্কিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করচে—

দুইজনেই একসঙ্গে বিস্ময়সূচক শব্দ করিয়া কাগজখানা উঠাইয়া লইলেন। যদুবাবুই চশমাখানা তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া পড়িয়া বিস্ময়ের সঙ্গে বলিলেন, ‘অ্যাঁ—এ কী! এই তোলেখা রয়েছে, জাপান অ্যাটাকস্‌ পার্ল হারবার—এ কী! গ্রেট ব্রিটেন আর মার্কিন—

যদুবাবু ‘গ্রেট ব্রিটেন’ কথাটা বেশ টানটোন দিয়া লম্বা করিয়া গালভরা ভাবে উচ্চারণকরিলেন।

—উঃ ! গ্রেট ব্রিটেন আর ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা!

ক্ষেত্রবাবু ‘ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা’ কথাটা উচ্চারণ করিতে ঝাড়া এক মিনিট সময় লইলেন। দুইজনেই বেশ পুলকিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন হঠাৎ কেন, তাহার কোনো কারণ নাই। একঘেয়ে দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে যেন বেশ একটা নূতনত্ব আসিয়া গেল—

নারাণবাবুর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়াছে, এবং এতদিন, আজ প্রায় দুই বৎসর, চায়ের আসর নিত্যনূতন যুদ্ধের খবরে মশগুল হইয়াছিল। কিন্তু আজ এ আবার এক নূতনব্যাপারের অবতারণা হইল তাহার মধ্যে।

যদুবাবু বলিলেন, আরে চলো চলো, স্কুলে ফিরে যাই—এত বড় খবরটা দিয়ে যাইসকলকে—

—তা মন্দ নয়, চলুন যদুদা। ওহে, তোমার কাগজখানা একটু নিয়ে যাচ্চি। দিয়ে যাবএখন ফেরত।

যে স্কুলের বাড়ি ছুটির পরে কারাগারের মতো মনে হয়, ইহারা মহা উৎসাহে কাগজখানা হাতে করিয়া সেই স্কুলে পুনরায় ঢুকিলেন। মি. আলম, শ্রীশবাবু, জ্যোতির্বিনোদ, হেডপণ্ডিত, রামেন্দুবাবু প্রভৃতির এ বেলা ডিউটি। তাঁহাদের মধ্যে সকলেই বিভিন্ন ঘরে পাহারাদি দিতেছেন— উৎসাহের আতিশয্যে উভয়ে কাগজখানা লইয়া গিয়া একেবারে হেডমাস্টারের টেবিলে ফেলিয়াদিলেন।

হেডমাস্টার বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, কী ?

—দেখুন স্যার, জাপান হাওয়াই দ্বীপ আর পার্ল হারবার হঠাৎ আক্রমণ করেছে—মিটমাটের কথা হচ্ছিল—হঠাৎ—

হেডমাস্টার যেন কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বলিলেন, কই দেখি?

খবরটা বিদ্যুদ্বেগে স্কুলের সর্বত্র ছড়াইয়া গেল। ছেলেরা অনেকে টিচারদের নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল। স্কুলের অটুট শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইয়া বিভিন্ন ঘরে ছেলেদের উত্তেজিত কণ্ঠের প্রশ্ন ওমধ্যে মধ্যে দুই-একজন শিক্ষকের কড়া সুরে হাঁকডাক শ্রুত হইতে লাগিল—এই! স্টপ দেয়ার!উইল ইউ? ইউ, রমেন, ডোন্ট বি টকিং—হু টকস্ দেয়ার? ইত্যাদি ইত্যাদি।

যদুবাবু ও ক্ষেত্রবাবু স্কুল হইতে বাহির হইলেন, কিন্তু চায়ের দোকানে কাগজ ফেরত দেওয়া হইল না, কারণ স্কুলের টিচারদের ব্যূহ ভেদ করিয়া কাগজখানা বাহির করিয়া আনা গেলনা।

পড়াইতে গিয়া যদুবাবু আজ আর ছেলেকে ক্লাসের পড়া বলিয়া দিতে পারিলেন না।।ছেলের বাবা ও কাকাকে জাপানের ও প্রশান্ত মহাসাগরের ম্যাপ দেখাইতে সময় কাটিয়া গেল।

বাসায় ফিরিবার মুখে গলিতে বৃদ্ধ প্রতিবেশী মাখন চক্রবর্তী রোয়াকের উপর অন্যান্যউৎসাহী শ্রোতাদের মধ্যে বসিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতির গুহ্য তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন, যদুবাবুকেদেখিয়া বলিলেন, কে? মাস্টারমশায় ? কী ব্যাপার শুনলেন? খিদিরপুরে পাঁচশো জাপানি গুপ্তচরধরা পড়েছে জানেন তো?

—সে কী! কই, তা তো কিছু শুনিনি। না বোধ হয়—

চক্রবর্তী মশায় বিরক্তির সুরে বলিলেন, না কী করে জানলেন আপনি? সব পিঠমোড় করে বেঁধে চালান দিয়েছে লালবাজারে। যারা দেখে এল, তারা বললে!

—কে দেখে এল?

—এই তো এখানে বসে বলছিল—ওই ওপাড়ার—কে যেন—কে হে? সুরেশ বলেগেল ?

শেষ পর্যন্ত শোনা গেল, কথাটা কে বলিয়াছে, তাহার খবর কেহই দিতে পারে না।

যদুবাবু বাসায় আসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, শুনেছ, আজ জাপানের সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের যুদ্ধ বেধেচে?

—সে কোথায় গো?

—বুঝিয়ে বলি তবে শোনো—ম্যাপ বোঝো? দাঁড়াও, এঁকে দেখাচ্ছি।

—ওগো, আগে একটা কথা বলি শোনো। অবনী ঠাকুরপো এসেচে আজ।

যদুবাবুর উৎসাহ ও উত্তেজনা এক মুহূর্তে নিবিয়া গেল। বলিলেন, অ্যাঁ! অবনী? কোথায়সে?

—আমায় বললে, চা করে দাও বউদি। চা করে দিলাম, তারপর তোমার আসবার দেরি আছে শুনে সন্ধের সময় কোথায় বেরুল।

—তা তো বুঝলাম। শোবে কোথায় ও? বড় জ্বালালে দেখচি। এইটুকু তো ঘর—ওইবা থাকে কোথায়, তুমি আমিই বা যাই কোথায় ? রাঁধছ কী?

—কী রাঁধব, তুমি আজ বাজার করবে বললে এ বেলা। বাজার তো আনলে না, আমিভাত নামিয়ে বসে আছি। দুটো আলু ছিল, ভাতে দিয়েছি, আর কিছু নেই।

—নেই তো আমি কী জানি? আমি কি কাউকে আসতে বলেচি এখানে?

—তা বললে কি হয়! আসতে বলোনি, তুমিও না, আমিও না—কিন্তু উপায় কী? নিয়ে এসো কিছু?

যদুবাবু নিতান্ত অপ্রসন্নমুখে বাজার করিতে চলিলেন। তাহার মনে আর বিন্দুমাত্র উত্তেজনাছিল না—এ কী দুর্দৈব! অবনী আবার কোথা হইতে আসিয়া জুটিল?

রাত্রি নয়টার পরে অবনী একগাল হাসিয়া হাজির হইল : এই যে দাদা, একটু পায়েরধুলো—ভাল আছেন বেশ?

—হ্যাঁ, ভাল। তোমরা সব ভাল? বউমা, ছেলেপিলে? নন্তু ভাল? আমি শুনলাম তোমারবউদিদির মুখে যে, তুমি এসেচ। শুনে আমি ভারী খুশি হলাম। বলি—বেশ, বেশ। কতদিন দেখাটা হয়নি—আছ তো দু-একদিন ?

—তা দাদা, আমি তো আর পর ভাবিনে। এলাম একটা চাকরি-টাকরি দেখতে। সংসার আর চলে না। বলি—যাই, দাদার বাসা রয়েছে। নিজের বাড়িই। সেখানে থাকি গে, একটা হিল্লে নাকরে এবার আর হঠাৎ বাড়ি ফিরচি নে। কিছুদিন ধরে কলকাতায় না থাকলে কিছু হয় না।

অবনীর মতলব শুনিয়া যদুবাবুর মুখের ভাব অনেকটা ফাঁসির আসামীর মতো দেখাইল। তবুও ভদ্রতাসূচক কী একটা উত্তর দিতে গেলেন, কিন্তু গলা দিয়া ভাল সুর বাহির হইল না।

আহারাদির পর যদুবাবুর স্ত্রী বলিল, আমি বাড়িওলার পিসির সঙ্গে গিয়ে না হয় শুই, তুমি আর অবনী ঠাকুরপো—

যদুবাবু চোখ টিপিয়া বলিলেন, তুমি পাথুরে বোকা। কষ্ট করে শুতে হচ্ছে এটা অবনীকেদেখাতে হবে, নইলে ও আদৌ নড়বে না। কিছু না, এই এক ঘরেই সব শুতে হবে।

যদুবাবুর আশা টিকিল না। সেই ভাবে হাত-পা গুটাইয়া ছোট ঘরে শুইয়া অবনী তিন দিন দিব্য কাটাইয়া দিল। যাওয়ার নামগন্ধ করে না।

একদিন বলিল, দাদা চলুন, আজ বউদিদিকে নিয়ে সবসুদ্ধ টকি দেখে আসি। পয়সা রোজগার করে তো কেবল সঞ্চয় করছেন, কার জন্যে বলতে পারেন? ছেলে নেই, পুলে নেই—

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন, তা তোমার বউদিদিকে তুমি নিয়ে গিয়ে দেখাও না কেন?

—হ্যাঁ, আমার পয়সাকড়ি যদি থাকবে—

অবনী একেবারে নাছোড়বান্দা। অতি কষ্টে যদুবাবু আপাতত তাহার হাত এড়াইলেন।

কয়েক দিন কাটিয়া গেল। যুদ্ধের খবর ক্রমশই ঘনীভূত। বৈকালে চায়ের মজলিসেক্ষেত্রবাবু বলিলেন, শুনেছেন একটা কথা? রেঙ্গুনে নাকি কাল বোমা পড়েছে।

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, বল কী ক্ষেত্র ভায়া?

কাগজে এখনও বেরোয়নি, তবে এই রকম গুজব।

শ্রীশবাবু চায়ের পেয়ালা হাতে আড়ষ্ট হইয়া থাকিয়া বলিলেন, আমার ছোট ভগ্নীপতি যেথাকেসেখানে! তা হলে আজই একটা তার করে—

যদুবাবু ও জ্যোতির্বিনোদ দুইজনেই ব্যস্তভাবে বলিলেন, হ্যাঁ ভায়া, দাও—এখুনি একটাতার করা আবশ্যক।

দাদা, আমার হাতে একবারে কিছু নেই—কত লাগে রেঙ্গুনে তার করতে, তাও তোজানিনে।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তার জন্যে কী, আমরা সবাই মিলে দিচ্ছি কিছু কিছু। তার তুমি করে দাও ভায়া, দেখি, কার কাছে কী আছে!

যদুবাবু বিপন্নমুখে বলিলেন, আমার কাছে একেবারেই কিন্তু কিছু নেই—

—আচ্ছা, না থাকে না থাক। আমরা দেখছি—দেখি হে, বিনোদ ভায়া—

সকলের পকেট কুড়াইয়া সাড়ে তিনটাকা হইল। শ্রীশবাবু তাহাই লইয়া ডাকঘরে চলিয়াগেলেন।

যদুবাবু বলিলেন, তাই তো হে, এ হল কী? এমন তো কখনও ভাবিওনি!

ক্ষেত্রবাবু ও জ্যোতির্বিনোদ টুইশানিতে বাহির হইয়া গেলেন। গলির মোড়ে ইংরেজিকাগজের সদ্য প্রকাশিত সংস্করণ লইয়া ফিরিওয়ালা ছুটিতেছে—ভারি খবর বাবু—ভারি কাণ্ডহয়ে গেল—

ক্ষেত্রবাবু পকেট হাতড়াইলেন, পয়সা আছে দুইটি মাত্র। তাহাই দিয়া কাগজ একখানা কিনিয়া দেখিলেন, কাগজে বিশেষ কিছুই খবর নাই। রেঙ্গুনের বোমার তো নামগন্ধও নাই তাহাতে, তবে জাপানি সৈন্য ব্রহ্মের দক্ষিণে টেনাসেরিম প্রদেশে অবতরণ করিয়াছে বটে।

মনটা ভাল নয়, পয়সার টানাটানি! পুনরায় চা এক পেয়ালা খাইলে অবসাদগ্রস্ত মন একটুচাঙ্গা হইত। কিন্তু তার উপায় নাই। এমন সময়ে রামেন্দুবাবুর সঙ্গে দেখা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কী, আজ যে চায়ের মজলিসে ছিলেন না?

—না, সাহেবের সঙ্গে দরকার ছিল। এই তো স্কুল থেকে বেরুলাম।

—যুদ্ধের খবর দেখেছেন? খুব খারাপ!

কী রকম?

—শুনলাম নাকি রেঙ্গুনে বোমা পড়েছে!

—তা আশ্চয্যি নয়! কিন্তু গুজব রটে নানারকম এ সময়ে—কাগজে কিছু লিখেছে এবেলা?

যদুবাবুকে কাহার সহিত যাইতে দেখিয়া দুইজনেই ডাকিয়া বলিলেন, ওই যে, ও যদুদা, শুনে যান—

যদুবাবুর সঙ্গে অবনী। বাজার করিয়া অবনীকে দিয়া বাসায় পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া যদুবাবুতাহাকে লইয়া বাহির হইয়াছেন।

—এটি কে যদুদা?

—এ—ইয়ে আমার খুড়তুতো—দেশ থেকে এসেছে—

—বেশ, বেশ। কার কাছে পয়সা আছে? রামেন্দুবাবু?

—আছে। কত?

—সবাই চা খাওয়া যাক। হবে?

—খুব হবে। চলুন সব।

যদুবাবু বলিলেন, রামেন্দু ভায়ার কাছে চার আনা পয়সা বেশি হতে পারে? বাজার করতেযাচ্ছি কিনা।

রামেন্দুবাবু সকলকে ভাল করিয়া চা ও টোস্ট খাওয়াইলেন। যদুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দাদা, আর কি খাবেন বলুন? কেক্ একখানা দেবে?

—না ভায়া, বরং একখানা মামলেট—

—ওহে, বাবুকে একটা ডবল ডিমের মামলেট দিয়ে যাও।

চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া সকলে যে যাহার টুইশানিতে বাহির হইলেন। যদুবাবু পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ দেখিলেন, প্রজ্ঞাব্রত ওপারের ফুটপাথ দিয়া যাইতেছে। সে এবারম্যাট্রিক দিয়া স্কুল হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। কয়েকটি সমবয়সীবন্ধুর সঙ্গে বোধ হয় মাঠের দিকে খেলা দেখিতে যাইতেছে।

যদুবাবু ডাকিলেন, প্রজ্ঞাব্রত, ও প্রজ্ঞাবত—

প্রজ্ঞাব্রত এদিকে চাহিয়া দেখিল, এবং কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন মুখে ও অনিচ্ছার সহিত এপারে আসিয়া বলিল, কী স্যার?

যদুবাবু সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, ছেলেটির কী সুন্দর উন্নত চেহারা, খেলোয়াড়ের মতো সাবলীল দেহভঙ্গি, গায়ে সিল্কের হাফ-শার্ট, কাবুলী ধরনের পায়জামার মতো করিয়া কাপড় পরা, পায়ে লাল শুঁড়ওয়ালা চটি। স্কুলের নীচের ক্লাসের সে প্রজ্ঞাব্রত আর নাই।

—ভাল আছো বাবা?

—হ্যাঁ স্যার।

—যাচ্ছ কোথায় ?

প্রজ্ঞাব্রত এমন ভাব দেখাইল যে, যেখানেই যাই না কেন, তোমার সে খোঁজে দরকারকী? মুখে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিল, এই একটু ওদিকে—

—হ্যাঁ বাবা, একটা কথা বলব ভাবছিলাম। তোমাদের বাড়ি একবার যাব আজইভাবছিলাম—তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে। তোমার ভাই দেবব্রতকে আজকাল পড়াচ্ছেকে?

—শিবুবাবু বলে এক ভদ্রলোক। আপিসে চাকরি করেন—আমাদের বাড়ির সামনেরমেসে থাকেন—

—ক'টাকা দাও?

—দশ টাকা বোধ হয়—কী জানি, ও-সব খবর আমি ঠিক জানিনে।

—আমি বলছিলাম কি, আমায় টুইশানিটা করে দাও না কেন! স্কুলের মাস্টার ভিন্ন ছেলে পড়াতে পারে? আমি তোমাদের স্নেহ করি নিজের ছেলের মতো, আমি যেমন পড়াব—এমনটিকারও দ্বারা হবে না, তা বলে দিচ্চি—

—কিন্তু এখন তো আমরা সব চলে যাচ্ছি কলকাতা থেকে।

যদুবাবু বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, কলকাতা থেকে? কেন?

—শোনেননি, জাপানিরা কবে এসে বোমা ফেলবে—এর পরে রাস্তাঘাট সব বন্ধ হয়ে যাবে হয়তো। আমরা বুধবারে বাড়িসুদ্ধু সব যাচ্ছি শিউড়ি, আমার দাদামশায়ের ওখানে।আমাদের পাড়ার অনেকে চলে যাচ্ছে।

তাই নাকি?

প্রজ্ঞাব্রত ধীরভাবে বলিল, কেন, আপনি কাগজ দেখেন না? হাওড়া স্টেশনে গেলেই বুঝবেন, লোক অনেক চলেযাচ্চে—আচ্ছা, আসি স্যার—

—আচ্ছা বাবা, বেঁচে থাকো বাবা।

প্রজ্ঞাব্রত চলিয়া গিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। দেখ দেখি বিপদ! যাইতেছি বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াইতে, রাস্তার মাঝখানে ডাকিয়া অনর্থক সময় নষ্ট—কে এখন বুড়ামানুষের সঙ্গে বকিয়া মুখ ব্যথা করে! মানুষের একটা কাণ্ডজ্ঞান তো থাকা দরকার, এই কি ডাকিয়া গল্প করিবারসময় মশায় ?

যদুবাবু কিন্তু অন্য রকম ভাবিতেছিলেন। প্রজ্ঞাব্রতের কথায় তিনি একটু অন্যমনস্ক হইয়াপড়িলেন। কলিকাতা হইতে লোক পলাইতেছে জাপানি বিমানের ভয়ে? তবে কি জাপানি বিমান এত নিকটে আসিয়া পড়িল?

ছোট একটা টুইশানি ছিল। ভাবিতে ভাবিতে যদুবাবু ছাত্রের বাড়ি গিয়া উঠিলেন। দুইটিছেলে, রিপন স্কুলে পড়ে—ইহাদের জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে যদুবাবু একসময়ে কলেজে পড়িয়াছিলেন, সেই সুপারিশেই টুইশানি। যদুবাবু গিয়া দেখিলেন, বাহিরের ঘরে আলো জ্বালা হয় নাই।ডাকিলেন, ও হরে, নরে! ঘর অন্ধকার কেন ?

হরেন নামক ছাত্রটি ছুটিয়া দরজার কাছে আসিয়া বলিল, স্যার?

—আলো জ্বালিসনি যে বড়?

—স্যার, আজ আর পড়ব না।

—কেন রে?

—আমাদের বাড়ির সবাই কাল সকালের গাড়িতেই দেশে চলে যাচ্ছে—মা, জ্যেঠীমা, দুইদিদি—সবাই যাবে। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্ছে, বড় ব্যস্ত সবাই। আজ আর—আপনি চলে যানস্যার!

অন্যদিন টুইশানির পড়া হইতে রেহাই পাইলে যদুবাবু স্বর্গ হাতে পাইতেন, কিন্তু আজকথাটা তেমন ভাল লাগিল না। যদুবাবু বলিলেন, তোরাও যাবি নাকি?

—একজামিনের এখনও দু'দিন বাকি আছে, একজামিন হয়ে গেলে আমরাও যাব।

—কোথায় যেন তোদের দেশ?

—গড়বেতা, মেদিনীপুর।

—আচ্ছা, চলি তা হলে।

আজ খুব সকাল। সবে সন্ধ্যা হইয়াছে। এ সময় বাড়ি ফেরা অভ্যাস নাই। বিশেষত এখনই সে কোটরে ফিরিতে ইচ্ছাও করে না। তার উপর অবনী রহিয়াছে, জ্বালাইয়া মারিবে।

ক্রীক লেনে এক বন্ধুর বাড়ি ছুটিছাটার দিন যদুবাবু সন্ধ্যাবেলা গিয়া চা-টা-আসটা খান, গল্প-গুজব করেন। ভাবিতে ভাবিতে সেখানেই গিয়া পৌঁছিলেন।

বন্ধু বাহিরের ঘরে বসিয়া নিজের ছেলেদের পড়াইতেছেন। যদুবাবুকে দেখিয়া বলিলেন, এসো ভায়া, বোসো। আজ অসময়ে যে? ছেলে পড়াতে বেরোওনি?

—সেখান থেকেই আসছি।

—একটু চা করতে বলে আয় তো তোর কাকাবাবুর জন্যে। আমার আবার বাড়ির সবাই কাল যাচ্ছে মধুপুর। সব ব্যস্ত রয়েছে। বাঁধা-ছাঁদা-

যদুবাবুর বুকের মধ্যে ছাঁত করিয়া উঠিল। বলিলেন, কেন? কেন?

—সবাই বলছে, জাপানিরা যে-কোন সময়ে নাকি এয়ার রেড করতে পারে, তাইমেয়েদের সরিয়ে দিচ্ছি।

যদুবাবুর মনে বড় ভয় হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন, কে বললে?

—বললে কেউ না। কিন্তু গতিক সেই রকমই। এর পরে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যাবে।

—বলো কী!

—তাই তো সবাই বলছে। কলকাতা থেকে অনেকে যাচ্ছে চলে। হাওড়া স্টেশনে গিয়েদেখগে লোকের ভিড়।

যদুবাবু আর সেখানে না দাঁড়াইয়া বাড়ি চলিয়া আসিলেন। বাসার দরজায় দেখিলেন, দুইখানি ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াইয়া। বাড়িওয়ালার বড় ছেলে ধরাধরি করিয়া বিছানার মোট ও ট্রাঙ্ক গাড়ির মাথায় উঠাইতেছে।

যদুবাবু বলিলেন, এসব কী হে যতীন, কোথায় যাচ্ছ?

যতীন বাইশ-তেইশ বছরের ছোকরা, কলেজে পড়ে। বলিল, ও, আমরা দেশে যাচ্ছিমাস্টারমশায়। সকলে বলছে, কলকাতাটা এ সময় সেফ্ নয়। তাই মা আর বউদিদিদের—

—তুমি, তোমার বাবা, এঁরাও নাকি?

—আমি পৌঁছে দিয়ে আবার আসব। কী জানেন, পুরুষমানুষ আমরা দৌড়েও এক দিকেএক দিকে পালাতে পারব। হাই এক্সপ্লোসিভ বম্ব পড়লে এ বাড়িঘর কিছু কি থাকবেভাবছেন? বোমার ঝাপটা লেগেই মানুষ দম ফেটে মারা যায়। সে সব অবস্থায়—

যদুবাবুর পা ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বলিলেন, বলো কী?

—বলি তো তাই। গবর্নমেন্ট বলছে, একখানা করে পেতলের চাকতিতে নামধাম লিখেপ্রত্যেকে যেন পকেটে করে বেড়ায়। এয়ার রেডের পরে ওইখানা দেখে ডেড বডি সনাক্ত করা—

যদুবাবুর তালু শুকাইয়া গিয়াছে। এখনই যেন তাহার মাথায় জাপানি বোমা পড়-পড়হইয়াছে। বলিলেন, আচ্ছা যতীন, তোমরা তো ইয়ং ম্যান, পাঁচ জায়গায় বেড়াও। তোমার কিমনে হয়, বোমা শীগ্‌গির পড়তে পারে ?

—এনি মোমেন্ট পড়তে পারে। আজ রাতেই পড়তে পারে। স্ট্রে রেড করার কি সময়-অসময় আছে?

—তাই তো!

যদুবাবু নিজের ঘরে ঢুকিতেই তাঁহার স্ত্রী তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া ব্যস্তভাবেবলিলেন, হ্যাঁগা, হিম হয়ে তো বসে আছো—এদিকে ব্যাপার কী শোনোনি? আজ রাত্রে নাকিজাপান বোমা ফেলবে কলকাতায়! বাড়িওলারা সব পালাচ্চে—পাশের বাড়ির মটরের বউ আর মা চলে গিয়েছে দুপুরের গাড়িতে। আমি কাঠ হয়ে বসে আছি—তুমি কখন ফিরবে। কীহবে! কী হবে, হ্যাঁগা, সত্যি সত্যি আজ কিছু হবে নাকি?

যদুবাবু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলেন, হ্যাঁঃ—ভারি—কোথায় কী তার ঠিক নেই!

ভাবিলেন, মেয়েদের সামনে সাহস দেখানোই উচিত—নতুবা মেয়েমানুষ হাউ-মাউ করিয়াউঠিবে।

—হ্যাঁ-গা, বাইরে আজ এত অন্ধকার কেন ?

—আজ ব্ল্যাক-আউট একটু বেশি। রাস্তার অনেক গ্যাসই নিবিয়ে দিয়েছে।

—তবুও তুমিবলছ—কোনও ভয় নেই?

এমন সময় অবনী আসিয়া ডাকিল, দাদা ফিরেছেন ?

—হ্যাঁ, এসো।

—আচ্ছা দাদা, আজ রাস্তা এত অন্ধকার কেন ?

—ও, আজ রাত দশটার পরে কমপ্লিট ব্ল্যাক-আউট। মানে, রাস্তার সব আলো নিবুনোথাকবে।

—কেন?

—তুমি কিছু শোনোনি যুদ্ধের খবর ?

—না, কী ?

যদুবাবুর মাথায় একটা বুদ্ধি আসিয়া গেল। বলিলেন, শোনোনি তুমি? জাপানিরা যেকোনো সময়ে এয়ার রেড—মানে বোমা ফেলতে পারে। সব লোক পালাচ্ছে। আজ বাড়িওলারাচলে গেল। আমার ছাত্রেরা চলে গেল—সব পালাচ্চে। হয়তো আজ রাত্রেই ফেলতে পারেবোমা—কে জানে? এখন একটা কথা, তুমি তোমার বউদিদিকে কাল নিয়ে যাও দেশে। আমিতো এখানে আর রাখতে সাহস করিনে—

অবনী পাড়াগেঁয়ে ভীতু লোক। তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। দাদার বাসায় ফুর্তি করিতে আসিয়া এ কী বিপদে পড়িয়া গেল সে! বলিল, হ্যাঁ দাদা, আজ কী দেখলেন? জাপান কি কাছাকাছি এল?

—তা কাছাকাছি বইকি। মোটের ওপর আজ রাতেই বোমা পড়া বিচিত্র নয়, জেনে রাখ।

—তাই তো!

—তুমি—তা হলে কাল সকালেই তোমার বউদিদিকে নিয়ে যাও—

—তা—তা দেখি। অবনী গুম খাইয়া গিয়া আপনমনে কী খানিকটা ভাবিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, হ্যাঁ দাদা, সত্যি সত্যি আজ রাতে কিছু হতে পারে?

—কথার কথা বলছি। হতে পারবে না কেন, খুব হতে পারে। বাধা কী? তুমি বোসো, আমি দু ভাঁড় দই নিয়ে আসি।

যদুবাবুর স্ত্রী কী কাজে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল, অবনী নিজের ছোট্ট টিনের সুটকেসটিখুলিয়া কাপড়চোপড় বাহিরে নামাইয়া আবার তুলিতেছে। তাহাকে দেখিয়া বলিল, বউদিদি, আমার গামছাখানা কোথায় ?

আহারাদির পরে যদুবাবু অবনীর সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। এখানে তিনি স্ত্রীকে আররাখিতে চান না। কাল দুপুরে অবনী তাহাকে লইয়া যাক।

অবনী নিমরাজী হইল।

সকালে উঠিয়া ঘরের দোর খুলিয়া দালানে পা দিয়া যদুবাবু দেখিলেন, অবনীর বিছানাটা গুটানো আছে বটে, কিন্তু সে নাই। অবনীকে ডাকিয়া তুলিতে হয়—অত সকালে তো সে ওঠেনা ! কোথায় গেল?

অবনী আর দেখা দিল না। টিনের সুটকেসটি কখন সে রাত্রে মাথার কাছে রাখিয়াছিল, ভোরে উঠিয়া গিয়াছে কি রাতেই পলাইয়াছে, তাহারই বা ঠিক কী?

পরদিন স্কুলে শিক্ষকদের মধ্যে একটা উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য দেখা গেল। ক্ষেত্রবাবুর বাসার আশেপাশে যাহারা ছিল, সকলেই নাকি কাল বাসা ছাড়িয়া পলাইয়াছে। ক্ষেত্রবাবু স্ত্রীকে লইয়া তেমন বাসায় কী করিয়া থাকেন! যদুবাবুর বিপদ আরও বেশি, তাঁহার যাইবার জায়গা নাই।জ্যোতির্বিনোদের বাড়ি হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে—কলিকাতায় আর থাকিবার আবশ্যক নাই, এখনই চলিয়া এসো, প্রাণ বাঁচিলে অনেক চাকুরি মিলিবে। হেডমাস্টার মিটিং করিলেন— অভিভাবকেরা চিঠি লিখিতেছে, স্কুলের প্রমোশন তাড়াতাড়ি দেওয়া হউক, ছেলেরা সব বাহিরেযাইবে—এ অবস্থায় মাস্টারদের কাছে যে সমস্ত পরীক্ষার খাতা আছে, সেগুলি যত শীঘ্র হয় দেখিয়া ফেরত দেওয়া উচিত।

মি. আলম বলিলেন, অনেক ছেলে ট্রান্সফার চাইছে, কী করা যায় ?

সাহেব বলিলেন, একে স্কুলে ছেলে নেই, এর উপর ট্রান্সফার নিলে স্কুল টিকবে না! তারচেয়েও বিপদ দেখছি, মাইনে তেমন আদায় হচ্ছে না। বড়দিনের ছুটির আগে মাইনে দেওয়াযাবে না।

যদুবাবু উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, দেওয়া যাবে না স্যার?

—নভেম্বর মাসের মাইনে হয়নি এখনও ! আমরা কী করে চালাব স্যার, একটু বিবেচনা করুন। দু মাসের মাইনে যদি বাকি থাকে—

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, আমায় বলা নিষ্ফল, আমি ঘর থেকে আপনাদের মাইনে দেব না তো! না পোষায় আপনার, চলে যাওয়াতে আমি বাধা দেব না—মাই গেট ইজ অলওয়েজ ওপন্—

রামেন্দুবাবুকে সব মাস্টার মিলিয়া ধরিল। অন্তত নভেম্বর মাসের দরুন কিছু না দিলেচলে কিসে? যদুবাবু কাতরস্বরে জানাইলেন, তিনি সম্পূর্ণ নিরুপায়, এ বিপদকালে কোথায় গিয়া উঠিবেন ঠিক নাই, হাতে পয়সা নাই, টুইশানির মাহিনা আদায় হয় কি না-হয়, টুইশানি থাকিবে কিনা তাহারও স্থিরতা নাই—কারণ ছেলেরা অন্যত্র যাইতেছে। কতদিনে তাহারা আসিবে কেজানে? টুইশানি না থাকিলে একেবারেই অচল।

রামেন্দুবাবুকে সাহেব বলিলেন, অবস্থা কী রকম বলে মনে হয়?

—কিছুই বুঝতে পারছি না স্যার।

—এবার জানুয়ারি মাসে নতুন ছাত্র বেশি পরিমাণে ভর্তি না হলে স্কুল চলবে না।তারপর এই গোলমাল—

—ও কিছু না স্যার, জানুয়ারি মাসে সব ঠিক হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। এ একটা হুজুগ, কী বল? ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের রাজ্যেআবার বাইরের শত্রুর ভয়!

—হুজুগ বইকি স্যার। পিওর হুজুগ। ও কিছু না। একটা কথা—

—কী?

—মাস্টারদের মাইনে কিছু কিছু দিতেই হবে স্যার।

—কোথা থেকে দেব? মাইনে আদায় নেই। তবে নিতান্ত ধরেছে—দাও কিছু কিছু। আরএকটা কথা, যে সব ছেলে ট্রান্সফারের দরখাস্ত করেছে, তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদেরঅনুরোধ করতে হবে, তাদের যেন ছাড়িয়ে না নিয়ে যায়। ক্লাস এইটের একটা ছেলে—নামসুধীর দত্ত, তার বাড়ি সন্ধ্যার পর একবার যেয়ো।

সন্ধ্যায় সুধীর দত্তের বাড়ি রামেন্দুবাবু অভিভাবককে ধরিতে যাইয়া বেশ দুই কথা শুনিলেন। ছেলেটি এবার প্রমোশন পায় নাই। ছেলের অভিভাবক চটিয়া খুন, ছেলে তিনি ও স্কুলে আর রাখিতে চান না। তিনি স্কুল ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন—অনুরোধ বৃথা।

রামেন্দুবাবু বলিলেন, কেন, কী অসুবিধে হল এ স্কুলে বলুন! আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, তা দূর করে দেওয়া হবে।

—পড়াশুনো কিছু হয় না মশাই আপনাদের স্কুলে। ওদের ক্লাসে যদুবাবু বলে একজন মাস্টার পড়ান, একেবারে ফাঁকিবাজ। কিছু করান না ক্লাসে।

—আপনি ও-রকম নাম করে বলবেন না। ছেলেদের মুখে শুনে বিচার করা সব সময়েঠিক নয়। এবার আমি বলছি, ওর পড়াশুনো আমি নিজে দেখব।

—তা, ওরা তো কাল যাচ্ছে নবদ্বীপে। ওর মাসির বাড়ি। কবে আসবে ঠিক নেই। হ্যাঁমাস্টারবাবু, এ হাঙ্গামা কতদিন চলবে বলতে পারেন?

—বেশী দিন চলবে বলে মনে হয় না।

—সুধীরকে জানুয়ারি মাসে ক্লাসে উঠিয়ে দেন যদি, তবে ট্রান্সফার এবার না হয় থাক। —তাই হবে। ওকে ক্লাস নাইনে উঠিয়ে দেওয়া যাবে।

রামেন্দুবাবু হৃষ্টমনে ফিরিতেছিলেন; কারণ কর্তব্য নিখুঁতভাবে সম্পাদন করিবার একটা আনন্দ আছে। পথের ধারে একস্থানে দেখিলেন অনেকগুলি লোক জটলা করিয়া উঁচু মুখে কী দেখিতেছে। রামেন্দুবাবু গিয়া বলিলেন, কী হয়েছে মশায় ?

একজন আকাশের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, দেখুন তো স্যার, ওই একখানাএরোপ্লেন—ওখানা যেন কী রকমের না?

রামেন্দুবাবু কিছু দেখিতে পাইলেন না। বলিলেন, কই মশায়, কিছু তো—

দুই-তিন জন অধীরভাবে বলিল, আঃ, দেখতে পেলেন না? এই ইদিকে সরে আসুন—ওই—ওই—

তবুও রামেন্দুবাবু দেখিতে পাইলেন না, একটা নক্ষত্র তো ওটা!

সবাই বলিয়া উঠিল, ওই মশায়, ওই। নক্ষত্র দেখছেন তো একটা ? ওই! ও নক্ষত্র নয়—জাপানি বিমান।

রামেন্দুবাবু সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, কিন্তু নক্ষত্র তো আরও অনেক—

লোকগুলি রামেন্দুবাবুর মূঢ়তা দেখিয়া দস্তুরমতো বিরক্ত হইল। একজন বলিল, আচ্ছা, এটা কি নক্ষত্র ? নীল মতো আলো দেখলেন না? চোখের জোর থাকা চাই। ও হল সেই, বুঝলেন ? চুপি চুপি দেখতে এসেছে—

আর একজন চিন্তিত মুখে বলিল, তাই তো, এ যে ভয়ানক কাণ্ড হল দেখছি!

পূর্বের লোকটি বলিল, কলকাতায় থাকা আর সে নয় জানবেন আদৌ।

সবাই তাহাতে সায় দিয়া বলিল, সে তো আমরা জানি। যে-কোন সময়—এনি মোমেন্টবোমা পড়তে পারে।

রামেন্দুবাবু সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িলেন।

পরদিন স্কুলে মাস্টারদের মধ্যে যথেষ্ট ভয় ও চাঞ্চল্য দেখা গেল। যে যে পাড়ায় থাকেন, সেই সেই পাড়া প্রায় খালি হইতে চলিয়াছে, মাস্টারদের মধ্যে অনেকের যাইবার স্থান নাই।

যদুবাবু চায়ের মজলিসে বলিতেছিলেন, সবাই তো যাচ্ছে, আমি যে কোথায় যাই!

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমারও তাই দাদা। আমার গ্রামে বাড়িঘর সারানো নেই—কতকালযাইনি। সেখানে গিয়ে ওঠা যাবে না।

—তবুও তোমার তো আস্তানা আছে ভায়া, আমার যে তাও নেই। চিরকাল বাসায় বাসায় থেকে বাড়িঘর সব গিয়েছে। এখন যাই কোথায় ?

জ্যোতির্বিনোদ বলিল, আমার বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, চিঠির পর চিঠি আসছে—বাড়ি যাবার জন্যে। বাড়ি থেকে লিখছে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসো।

হেডপণ্ডিত বলিলেন, কাল শেয়ালদা ইস্টিশানে কী ভিড় গিয়েছে হে! গাড়িতে উঠতে পারি নে—বুড়ো মানুষ, কত কষ্টে যে ঠেলেঠুলে উঠলাম!

—স্কুল বন্ধ হলে যে বাঁচি। সাহেবকে সবাই মিলে বলা যাক, স্কুল বন্ধ করবার জন্যে।

সারারাত্রি ধরিয়া গাড়িঘোড়ার শব্দ শুনিয়া যদুবাবু বিশেষ নার্ভাস হইয়া উঠিয়াছিলেন।পাড়াসুদ্ধ লোক বিছানা-বোঁচকা বাঁধিয়া হয় হাওড়া, নয় শেয়ালদহ স্টেশনে ছুটিতেছে। কেবলিতেছিল, ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া অসম্ভব ধরনে বৃদ্ধি পাইতেছে।

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, কোনো ভয় নেই দাদা। বোঁচকা মাথায় নিয়ে ঠেলে উঠবইস্টিশানে—আমরা বাঙাল মানুষ, কিছু মানিনে।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আস্‌সিংড়ি চলে যাই ভাবছি, ভাঙা ঘরে গিয়ে আপাতত উঠি।এখানে থাকলে এর পরে আর বেরুতে পারব না।

যদুবাবু সভয়ে বলিলেন, তাই তো, কী যে করি উপায়!

—কালই সাহেবকে গিয়ে আগে ধরা যাক, স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হোক।

ক্ষেত্রবাবু চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া ধর্মতলার মোড়ে আসিলেন। দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে দুই-তিনখানি ঘোড়ার গাড়ি ছাদের উপর বিছানার মোট চাপাইয়া শেয়ালদহ স্টেশনের দিকে চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন—আস্‌সিংড়ি গ্রামে যাইবেন বটে, কিন্তু সেখানে বাড়িঘরের অবস্থা কী রকম আছে, তাহার ঠিক নাই। আজ পাঁচ-ছয় বছর পূর্বেনিভাননী বাঁচিয়া থাকিতে সেই একবার গিয়াছিলেন, তাহার পর আর যাওয়া ঘটে নাই। কোনোখবরও লওয়া হয় নাই, কারণ এতদিন প্রয়োজন ছিল না।

একটিমাত্র টুইশানি অবশিষ্ট ছিল, সেখানে গিয়া দেখা গেল, আজ বৈকালে তাহারাওদেশে চলিয়া গিয়াছে। বাড়ির কর্তা আপিসে চাকরি করেন। বলিলেন, মাস্টারমশায়, আপনার এমাসের মাইনেটা আর এখন দিতে পারছিনে—খরচপত্র অনেক হয়ে গেল কিনা। জানুয়ারি মাসেশোধ করব।

—আমায় না দিলে হবে না বোস মশায়, ফ্যামিলি আমাকে দেশে নিয়ে যেতে হবে—

—তা তো বুঝতে পারছি। কিন্তু এখন কিছু হবে না।

ক্ষেত্রবাবুর রাগ হইল। এখানে দুই মাসের কমে এক মাসের মাহিনা কোনোদিনই দেয়না—তাও আজ পাঁচ টাকা, কাল দুই টাকা। নিতান্ত নিরুপায় বলিয়াই লাগিয়া থাকা। কিন্তু এইবিপদের সময় এত অবিবেচনার কাজ করিতে দেখিলে মানুষের মনে মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেহউপস্থিত হয়।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, না বোস মশায়, এ সময় আমায় দিতেই হবে। দু'মাস ধরে ছাত্র পড়ালাম, ছেলে ক্লাসে উঠল। এখন বলছেন, আমার মাইনে দেবেন না! তা হয় না—

বসু মহাশয়ও চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, মশাই, এতকাল তো পড়িয়েচেন—মাইনে পাননিকখনও বলতে পারেন কি? যদি এ মাসটাতে ঠিক সময়ে না-ই দিতে পারি—

—ঠিক সময়ে কোনোদিনই দেননি বোস মশায়, ভেবে দেখুন। তাগাদা না করলে কোনো মাসেই দেননি!

—বেশ মশাই, না দিয়েছি তো না দিয়েচি! মাইনে পাবেন না এখন! আপনি যা পারেনকরুন গিয়ে!

ক্ষেত্রবাবু ভদ্রস্বভাবের লোক, টুইশানির মাহিনা লইয়া একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির সহিত ঝগড়াকরিবার প্রবৃত্তি তাহার হইল না। কিছু না বলিয়া বাড়ির বাহির হইয়া আসিলেন। কলিকাতায় বাড়ি আছে, আপিসে মোটা চাকুরিও করেন শোনা যায়, অথচ এই তো সব বিচার! ছিঃ !

অন্যমনস্কভাবে গলির মোড়ে আসিতেই ব্ল্যাক আউটের কলিকাতায় কাহার সঙ্গে ঠোকাঠুকি হইল। ক্ষেত্রবাবু বলিয়া উঠিলেন, মাপ করবেন মশাই, দেখতে পাইনি—দুটো গ্যাসই নিবিয়েচে—

লোকটি বলিল, কে, ক্ষেত্রবাবু নাকি?

—ও, রাখালবাবু?

—আমিই। ভালই হল, দেখা হল এভাবে। আপনাদের স্কুলে কাল যাব ভাবছিলাম—

—ভাল আছেন মিত্তির মশায় ?

—আমাদের আবার ভাল-মন্দ! বই দিয়ে এসেছি পাঁচ-ছ'টা স্কুলে—এখন ধরায় যদি, তবেবুঝতে পারি। আপনাদের স্কুলে আমার সেই নব ব্যাকরণবোধখানা ধরানোর কী করলেন? চমৎকার বই। ক্লাস ফাইভ আর ফোরের উপযুক্ত বই। সন্ধি আর সমাস যেভাবে ওতে দেওয়া— বইয়ের লিস্ট হয়েছে আপনাদের?

—এখনও হয়নি।

—কেন, প্রোমোশন হয়নি? তবে বইয়ের লিস্ট হয়নি কেমন কথা?

—না, প্রমোশন হবে বুধবার। শুক্রবারে ছুটি হবে।

—আমার বইয়ের কী হল? —হেডমাস্টারের কাছে দেওয়া হয়েছে—কী হয়, বলতে পারি নে! —আমার যে এদিকে অচল ক্ষেত্রবাবু। এই অবস্থায় প্রায় দেড়শো টাকা ধার করে বইছাপালাম। প্রেসের দেনা এখনও বাকি। দপ্তরীর দেনা তো আছেই। বাসাভাড়া তিন মাসের বাকি। বই যদি না চলে, তবে খেতে পাব না ক্ষেত্রবাবু। আপনারাই ভরসা।

—বুঝলাম সবই রাখালবাবু, কিন্তু এ তো আর আমার হাতে নয়। আমি যতদূর বলবার বলেছি।

কথার মধ্যে সত্যের কিছু অপলাপ ছিল। ক্ষেত্রবাবু বলেন নাই। রাখাল মিত্তিরের বইআজকাল অচল। তবুও হয়তো চলিত, কিন্তু বড় বড় প্রকাশকের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বই চালানো রাখাল মিত্তিরের কর্ম নয়। তাহারা লাইব্রেরির জন্য বিনামূল্যে কিছু বই দেয়, প্রাইজের সময় বই কিনিলে মোটা কমিশন দেয়।

রাখাল মিত্তির ক্ষেত্রবাবুর পিছু ছাড়ে না। বলিল, আসুন না আমার ওখানে, একটু চাখাবেন—

শেষ পর্যন্ত যাইতেই হইল—নাছোড়বান্দা রাখাল মিত্তিরের হাতে পড়িলে না গিয়া উপায়নাই। সেই ছোট একতলার কুঠুরি। এই অগ্রহায়ণ মাসেও যেন গরম কাটে না। একখানা নীচুকেওড়া কাঠের তক্তপোশের উপর

মলিন বিছানা। কেরোসিন কাঠের একটা আলমারি ভর্তি বই।ঘরখানা অগোছালো, অপরিষ্কার, মেঝের উপরে পড়িয়া আছে দুইটা ছেঁড়া জামা ছেলেপুলেদের, এক বোতল আঠা, একটা আলকাতরা মাখানো মালসা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কী বই রাখালবাবু, আলমারিতে?

—দেখবেন? এ সব বই—এই দেখুন—

রাখালবাবু সগর্বে বই নামাইয়া দেখাইতে লাগিলেন।

—এই দেখুন প্রকৃতিবোধ অভিধান। পুরনো বইয়ের দোকান থেকে তিন টাকায়—আরএই দেখুন মুগ্ধবোধ—মশাই, সংস্কৃত ব্যাকরণ না পড়লে কি ভাষার ওপর দখল দাঁড়ায় ? সহর্ণেঘঃ থেকে আরম্ভ করে সব সূত্র তিনটি বছর ধরে মুখস্থ করে ভোঁতা হয়ে গিয়েছে, তাইআজ দু-এক পয়সা করে খাচ্চি। রাখাল মিত্তিরের ব্যাকরণের ভুল ধরে, এমন লোক তো দেখিনে। গোয়ালটুলি স্কুলের হেডপণ্ডিত সে দিন বললে—মিত্তির মশাই, আপনার ব্যাকরণ পড়লেছেলেদের সন্ধি আর সমাস গুলে খাওয়া হয়ে গেল। পড়া চাই—পেটে বিদ্যে না থাকলে—

—আপনার বই ধরিয়েছে নাকি?

—না, হেডমাস্টার বললে, শশিপদ কাব্যতীর্থের ব্যাকরণ আর-বছর থেকে রয়েছে ক্লাসে। এ বছর যুদ্ধের বছরটা, বই বদলালে গার্জেনরা আপত্তি করবে—তাই এ বছর আর হল না।সামনের বছর থেকে নিশ্চয়ই দেবে।

একটি বারো-তেরো বছরের রোগা মেয়ে, একটা থালায় দুটি আংটাভাঙা পেয়ালা বসাইয়া চা আনিল। রাখালবাবু বলিলেন, ও পাঁচী! এটি আমার ভাগ্নী—আমার যে বোন এখানে থাকে, তার মেয়ে—প্রণাম করো মা, উনি ব্রাহ্মণ।

—আহা, থাক থাক। এসো মা, হয়েছে—কল্যাণ হোক। বেশ মেয়েটি।

—অসুখে ভুগছে। বর্ধমানে দেশ, কেউ নেই। এবার এক জ্ঞাতি কাকা নিয়ে গিয়েছিল, ম্যালেরিয়ায় ধরেচে। যাও মা, দুটো পান নিয়ে এসো তোমার মামীমার কাছ থেকে। চা মিষ্টি হয়েছে? চিনি নেই, আখের গুড় দিয়ে—

—না না, বেশ হয়েছে।

দুধচিনিবিহীন বিস্বাদ চা, তামাক-মাখা গুড়ের গন্ধ, এক চুমুক খাইয়া বাকিটুকু গলাধঃকরণ করিতে ক্ষেত্রবাবুর বিশেষ কসরৎ করিতে হইল।

রাখালবাবু বলিলেন, তা তো হল, কী হাঙ্গামা বলুন দিকি! পাড়া যে খালি হয়ে গেল অর্ধেক!

—আপনাদের এ পাড়াতেও ?

—হ্যাঁ মশাই, আশেপাশে লোক নেই। সব পালাচ্ছে। পাশের বাড়ির ঘোষালেরা আজ সকালে সব পালাল—এখন ওরা বড়লোক, এই দিনকতক আগেও পুতুলের বিয়েতে হাজারটাকা খরচ করেছে। ফুলশয্যের তত্ত্ব করেছিল, দশজন ঝি চাকর মাথায় করে নিয়ে গেল, মায়রুপোর দান-সামগ্রী, খাট বিছানা এস্তোক! ওদের কথা বাদ দিন। এখন আমরা যাব কোথায় ?

—সেই ভাবনা তো আমারও, ভাবছি তো। গরিব স্কুল-মাস্টার—

—গরিব তো বটেই, যাবার জায়গাও তো নেই।

—আপনার দেশে বাড়িঘর—

রাখালবাবু হাসিয়া বলিলেন, দেশই নেই, তার বাড়িঘর! দেশ ছিল নদে জেলায়, কাঁচড়াপাড়া নেমে যেতে হয়। ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম। সে সব কিছু নেই। বড়হয়ে আর যাইনি, এই কলকাতাতেই—

—আমারও তো তাই।

পাঁচী পান আনিয়া রাখিয়া গেল।

—অনেক পয়সা খরচ করে বই ছাপালাম, চার-পাঁচশো টাকা দেনা এখনও বাজারে। এই হাঙ্গামাতে যদি বই বিক্রি কমে যায়, তবে তো পথে বসতে হবে। আপনাদের ভরসাতেই—

—কিছুই বুঝছিনে, কী যে হবে!

—আমাদের এখানে কিছু হবে না, কী বলেন? যুদ্ধ হচ্ছে ফিলিপাইনে আর হংকংয়ে, তারএখানে কী?

—সিঙ্গাপুর ডিঙিয়ে আসা অত সোজা নয়।

—তবে লোক পালাচ্ছে কেন?

—প্যানিক—ভয়—প্যানিক একেই বলে। আচ্ছা উঠি, রাত হল মিত্তির মশাই।

—আর একটু বসবেন না? আচ্ছা তা হলে—হ্যাঁ, একটা কথা। আনা আষ্টেক পয়সাহবে?

পকেটে যাহা কিছু খুচরা ছিল, তক্তপোশের উপর রাখিয়া ক্ষেত্রবাবু বাহিরের মুক্ত বাতাসেআসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া যেন বাঁচিলেন। ‘স্পেশাল টেলিগ্রাফ’ কাগজ বাহির হইয়াছে, কাগজওয়ালা ফুটপাথ ধরিয়া ছুটিতেছে। ক্ষেত্রবাবু একজনের হাত হইতে কাগজ লইয়া দেখিলেন—হংকং অবরুদ্ধ!..চীনসমুদ্রে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস!

ক্ষেত্রবাবু কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন।

পরদিন স্কুলে হেডমাস্টার সব মাস্টারকে আপিসে ডাকিলেন। জরুরি মিটিং।

হেডমাস্টার এ বছরের পরীক্ষার লম্বা রিপোর্ট লিখিয়াছেন, সকলকে পড়িয়া শোনাইলেন।প্রত্যেক শিক্ষকের নিকট হইতে রিপোর্ট লওয়া হয়, পরীক্ষার কাগজ দেখার পরে। সেই সবরিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া হেডমাস্টার নিজে রিপোর্ট লিখিয়া অভিভাবকদের মধ্যে ছাপাইয়াবিলি করেন। তাহার ধারণা, ইহাতে স্কুলে ছেলে বাড়িবে।

রিপোর্ট পড়িয়া সকলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কী রকম হয়েছে?

সকলেই বলিলেন, চমৎকার রিপোর্ট হইয়াছে, এমন ধারা হয় না।

—থার্ড ক্লাসের ইংরিজি নিতেন কে?

যদুবাবু বলিলেন, আমি স্যার।

—ভীষণ খারাপ ফল এবার আপনার সাবজেক্টে। আপনি লিখিত কৈফিয়ত দেবেন—

—যে আজ্ঞে স্যার।

—ক্লাস সেভেনের ইতিহাস কে নেয়?

শ্রীশবাবু বলিলেন, আমি স্যার।

—সকলের চেয়ে ভাল ছেলে মোটে ষাট পেয়েছে।

—স্যার, প্রশ্ন বড় কঠিন হয়েছিল—সিলেবাস ছাড়া প্রশ্ন হলে কী করে ছেলেরা—

—না, এমন কিছু কঠিন নয়। প্রশ্নপত্র সব আমি আর মি. আলম দেখে দিয়েছি। কমিটিতে এ কথা আমায় রিপোর্ট করতে হবে। লিখিত কৈফিয়ত দেবেন। আর এবার বাড়ি বাড়ি গিয়েএকটু ক্যাম্পাস করা দরকার হবে ছুটির পরে। নইলে ছেলে হবে না।

ক্ষেত্রবাবু উঠিয়া ভয়ে ভয়ে বলিলেন, কিন্তু স্যার, এদিকে শহর যে খালি হয়ে গেল—

সাহেব তাচ্ছিল্যের সুরে বলিলেন, কে বললে?

যদুবাবু ও শ্রীশবাবু দাঁড়াইয়া বলিলেন, সেই রকমই দেখা যাচ্ছে স্যার। ক্ষেত্রবাবু ঠিকবলেছেন।

গেম মাস্টার বিনোদবাবু বলিলেন, আমাদের পাড়াতে তো আর লোক নেই।

জগদীশ জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, আমি এক জায়গায় ছেলে পড়াই, তারা চলে গিয়েছে। তাদের বাড়ি খালি।

সাহেব মি. আলমের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কী মি. আলম, আপনি কি দেখেছেন? এইরকম হয়েছে নাকি?

মি. আলম উঠিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, না স্যার, এখানে ওখানে দু-একটা বাড়ি খালিহয়েছে বটে—কিছুই নয়।।

ক্ষেত্রবাবু প্রতিবাদের সুরে বলিলেন, কিছু না কী রকম মি. আলম! হাওড়া স্টেশনে নাকি বেজায় ভিড় হচ্চে—কুলি আর ঘোড়ার গাড়ির দর বেজায় বেড়েছে—

—ওসব গুজব। কই, আমি তো রোজ বেড়াই, কিছু দেখিনি।

এমন সময় রামেন্দুবাবু বাহির হইতে একখানা খবরের কাগজ লইয়া ঘরে ঢুকিয়া সাহেবেরটেবিলে রাখিয়া বলিলেন, দেখুন স্যার, হংকং যায়-যায়—জাপানিরা সিঙ্গাপুরে দূরপাল্লারকামানের গোলা ছুঁড়েচে।

হেডমাস্টারের কড়া ডিসিপ্লিনের নিগড় বুঝি ছুটিল! ক্ষেত্রবাবু ও শ্রীশবাবু টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া খবরের কাগজ পড়িতে গেলেন। সমবেত শিক্ষকদের মধ্যে একটা গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হইল।

—তাই তো!

—তাই তো!

—দেখ না ভায়া কাগজটা!

—সিঙ্গাপুর বিপন্ন!

—ব্যাপার কি?

সাহেব কাগজ হাতে তুলিয়া পড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, বাজে গুজব! সিঙ্গাপুরপৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য!

মি. আলম বলিলেন, বাজে গুজব—হেঁ:—

সাহেব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কাগজখানা একদিকে সরাইয়া বলিলেন, যাক এসব। তা হলেবাড়ি বাড়ি ক্যানভাসিংয়ের জন্যে কে কে রাজী আছেন বলুন? সকলের সাহায্যই আমি চাই।যদুবাবু? ক্ষেত্রবাবু? মি. আলম ?

ইহারা সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলের ডিসিপ্লিন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল। জাপানি বোমার হুজুগেপড়িয়া সে কঠোর ডিসিপ্লিনের ভিত্তি সামান্য একটু নড়িয়া উঠিয়াছিল মাত্র—তাহাও অতিঅল্পক্ষণের জন্যে।

হেডপণ্ডিত বলিলেন, স্যার, ছুটি ক'দিন হচ্চে?

সাহেব গম্ভীরস্বরে বলিলেন, পাণ্ডিট, ছুটি বেশি দিন দিতে চাই না। দোসরা জানুয়ারি খুলবে। কিন্তু তার আগে ক্যানভাসিং করবার জন্যে চার-পাঁচজন টিচারকে এখানে থাকতে হবে। আমি তাদের নামে সারকুলার করব।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমাদের মাইনেটা স্যার—

—স্কুল খুললে দেওয়া হবে।

যদুবাবু মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন, কিছু না দিলে, স্যার, আমরা দাঁড়াই কোথায় ? হাতেকিছু নেই—

—যার না পোষাবে, তিনি চলে যেতে পারেন—মাই গেট্—

যদুবাবু শিক্ষক কর্তৃক তিরস্কৃত স্কুলের ছাত্রের মতো ঘাড় নীচু করিয়া পুনরায় আসনেবসিয়া পড়িলেন।

হেডমাস্টার বলিলেন, আমি ছুটির দিন মি. আলম, রামেন্দুবাবু আর ক্ষেত্রবাবুকে চাই।তারা রোজ আসবেন আপিসে। নতুন বছরের রুটিনে অনেক অদলবদল করতে হবে। সিলেবাস তৈরি করতে হবে প্রত্যেক ক্লাসের। আপনারা তিনজন আমাকে সাহায্য করবেন। যদুবাবু?

যদুবাবু আবার দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

—আপনিও আসবেন। আপনাকে ক্লাস-টাস্কের একটা চার্ট করতে হবে গ্রীষ্মের ছুটিপর্যন্ত।

যদুবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল। আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, আমি স্যার, আমার শালীর, মানে—বিয়ে— দেশে যেতে হবে সেখানে। আমিই সব দেখাশুনো করব—

হঠাৎ মনে পড়িল পৌষ মাসে বিবাহ হয় না হিন্দুর, এ কথা সাহেব না জানিলেও অন্যান্য মাস্টারেরা সবাই জানে, হয়তো আলমও জানে। আলম সাহেবকে বলিয়া দিতেও পারে। তাই তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, বিয়ে এই সামনের বুধবারে, কিন্তু ছুটিতে আমার নাগেলে—

—ইয়েস, ইয়েস, আই আন্ডারস্ট্যান্ড।

সভা ভঙ্গ হইল। সাহেবের ঘর হইতে বাহির হইয়া যদুবাবু রামেন্দুবাবুকে পাকড়াও করিলেন।

—ও রামেন্দুবাবু, আমায় গোটা দশেক টাকা দিতে বলুন সাহেবকে। করে দিতেই হবে।না হলে মারা যাব। হাতে কিছু নেই। টুইশানির ছেলে পালিয়েছে। কোথায় পয়সা পাই বলুনতো?

ক্ষেত্রবাবু বাড়ি ফিরিতেই অনিলা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল, এসেচ ? শোনো, সব পালাচ্ছে, পাড়া ফাঁকা হয়ে গেল যে? সোমবার থেকে নাকি হাওড়ার পুল খুলে দেবে, রেলগাড়ি বন্ধকরে দেবে?

—কে বললে?

—কে বললে আবার—সবাই বলছে। তোমার ছুটির ক'দিন দেরি? এর পর যাওয়া যাবে না কোথাও— ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া নাকি দশ টাকা করে হয়েছে—বোমা নাকি শীগ্‌গির পড়বে। সিঙ্গাপুর ব্লকেড্ করেচে, দেখেছ তো?

ক্ষেত্রবাবুর ভয় হইয়া গেল। তাই তো, ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া চড়িয়া গেলে কী করিয়াকলিকাতা ত্যাগ করিবেন ? বলিলেন, কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় বল তো? জায়গা তো দেখচিএক আস্‌সিংড়ি। কতকাল সেখানে যাইনি। নিভা বেঁচে থাকতে একবার গরমের ছুটিতে সেখানে গিয়েছিলাম। বাড়িঘর এতদিনে ইটের স্তূপ হয়েছে পড়ে থেকে। বেজায় জঙ্গল সে গাঁয়ে।

—চল, গয়া যাই।

—পয়সা? অত টাকা কোথায় ? স্কুলে এক পয়সা দিলে না।

—আমার বাক্সে পাঁচ-ছ'টা টাকা আছে। আর কিছু ধার কর।

—কে দেবে ধার? সে বাজার নয়।

—কিন্তু যা হয় কর তাড়াতাড়ি। এর পর আর কলকাতা থেকে বেরুনো যাবে না সবাইবলচে।

—রান্না হয়ে থাকে, দাও। আমি একবার যদুদার বাসা থেকে আসি। দেখে আসি, কীকরছে ওরা!

যদুবাবু বাসায় পা দিতেই তাহার স্ত্রী বলিল, ওগো, কী হবে গো? সবাই চলে যাচ্ছে, কীকরবে করো! কোনদিন ঝুপ করে বোমা পড়বে, তখন—

—দাঁড়াও, একটু স্থির হতে দাও। চা কর, আগে খাই। তারপর সব শুনছি।

চা করিয়া যদুবাবুর গৃহিণী কাঁসার গ্লাসে আঁচল জড়াইয়া লইয়া আসিল।

যদুবাবু বলিলেন, কেন, পেয়ালা?

—সে ও-বেলা ধুতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে গুঁড়ো হয়ে গেল।

যদুবাবু রাগিয়া উঠিলেন, তা ভাঙবে বইকি, তোমাদের তো ভেবে খেতে হয় না। জিনিসপত্র নষ্ট করলেই হল—লাগে টাকা, দেবে গৌরী সেন! একটা পেয়ালার দাম কতআজকালকার বাজারে, তার খোঁজ রাখো?

এমন সময় বাহিরে ক্ষেত্রবাবুর গলা শোনা গেল : ও যদুদা, বাসায় আছেন নাকি?

যদুবাবু তাড়াতাড়ি চা-সুদ্ধ কাঁসার গ্লাসটা স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিলেন, এটা নিয়ে যাও—নিয়ে যাও। দেখে ফেলবে, বলবে কী? গলার সুর বাড়াইয়া বলিলেন, এসো ক্ষেত্র ভায়া—এসোএসো—

কী হচ্চে?

—এই সবে এলাম ভাই। সবে মিনিট দশেক। তারপর কী মনে করে? বোসো এইটেতে।

—বউদিদি কোথায় ? বউদিদি, বলি, একটু চা-টা না হয় করেই খাওয়ান—

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন, চা খাবে কি ভাই, পেয়ালা ভেঙে বসে আছে তোমারবউদিদি—কাঁসার গেলাসে চা খাচ্ছিলাম, তা তোমাকে কি আর তাতে—

—খুব দেওয়া যাবে। তাতেই দিন না বউদিদি।

—দাও তা হলে, ওগো, ওই চা-ই দিয়ে যাও—ক্ষেত্র ভায়া আমাদের ঘরের লোক।

চা আসিল। চা খাইতে খাইতে ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তা তো হল। এখন কী উপায় করাযাবে বলুন দিকি ? কলকাতার যা অবস্থা! লোক সব পালাচ্ছে—

—হেডমাস্টার তা বুঝবেন না। তার মতে কোনো বিপদের কারণ নেই। আবার বাড়িবাড়ি ঘুরে ক্যান্‌ভাসিং করতে হবে ছেলের জন্যে! ছেলে কোথায় ? কলকাতা শহর তো ফাঁকাহয়ে গেল!

—তা কি আর সাহেবকে বোঝানো যাবে দাদা? কাল থেকে ক্যানভাসিংয়ে না বেরুলেসাহেব রাগ করবে। আপনারও তো ডিউটি আছে?

—তাই তো, কী করা যায় ভাবচি! মুশকিল আসলে কী হয়েছে জান ভায়া, হাতে নেইপয়সা। রামেন্দু ভায়াকে ধরেছি, সাহেবকে বলে গোটাদশেক টাকা আমায় না দেওয়ালে চলবেনা।

—কোথায় যাবেন ভাবছেন?

—কোথায় যে যাই! হাতে পয়সা নেই, দেশঘর নেই। তোমার তবুও তো দেশে বাড়ি ঘর আছে, আমার যাবার স্থান নেই। এক আছে জ্ঞাতি-ভাইয়ের বাড়ি, বেড়াবাড়ি বলে গ্রাম, তাসেখানে তারা যে রকম ব্যবহার করেছে—পরের বাড়ি, কোনো জোর তো সেখানে খাটে না!তুমি কোথায় যাবে ভাবচ?

—আমারও সেই একই অবস্থা। আস্‌সিংড়িতে—মানে আমাদের দেশে—কতকাল যাইনি। বাড়িঘর এতদিনে ভূমিসাৎ—নয়তো একগলা জঙ্গল, সাপ-ব্যাঙের আড্ডা হয়ে আছে।মেয়েছেলে নিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াই কী করে? আমার স্ত্রী বলছিল, গয়াতে শ্বশুরবাড়ি—

—সেই সব চেয়ে ভাল আমার মতে। তাই কেন যাও না?

—পয়সা? পয়সা কোথায় ? স্কুলে খাটব, দু'মাস পরে এক মাসের মাইনে নেব—এই তোঅবস্থা। জানেন তো সবই।

—আচ্ছা, তোমার কী মনে হয় ভায়া? জাপানিরা কি এতদূর আসবে? সিঙ্গাপুর নিতেপারবে?

—কী করে বলব? তবে আমার এক জানাশোনা গবর্নমেন্ট অফিসার বলছিল, সিঙ্গাপুর হঠাৎ নিতে পারবে না। ওখানে যুদ্ধ হবে দারুণ, এবং সে যুদ্ধ কিছুকাল চলবে।

—তবে কলকাতাতে বোমা ফেলতে পারে, কী বলো?

—ফেলতে পারে। সাহেব যাই বলুক, কলকাতা খুব সেফ্ হবে না।

—স্কুলটাতে দু দিন বেশি ছুটির কথা বলে দেখলে হয় না?

—সাহেবকে তা বলা যাবে না। সাহেব ভিজবে না।ক্ষেত্রবাবু আর কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া বিদায় লইলেন। ব্ল্যাক-আউটের কলিকাতা, ঘুটঘুটে অন্ধকার—কাল হইতে আলো আরও কমাইয়া দিয়াছে। মোড়ের কাছে এক জায়গায়ঘোড়ার গাড়ির আড্ডা। ক্ষেত্রবাবুর কৌতূহল হইল, গাড়ির ভাড়া কেমন হাঁকে একবারদেখিবেন।

রাস্তা পার হইতে ভয় করে। অন্ধকারের মধ্যে দূরে বা নিকটে বহু আলো তাহার দিকে আসিতেছে—ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে বোঝা যায় না, কত বেগে সেগুলি এদিকে আসিতেছে। ক্ষেত্রবাবু সন্তর্পণে রাস্তা পার হইয়া গাড়ির আড্ডার কাছে গিয়া বলিলেন, ওরে গাড়োয়ান, ভাড়া যাবি?

একখানা গাড়ির ছাদে একটা লোক শুইয়া ছিল। উঠিয়া বলিল, কাঁহা যানে হোগা বাবুজি?

—হাওড়া ইস্টিশানে।

—আভি যাইয়েগা ?

—হ্যাঁ, এখুনি।

ক’ আদমী আছে?

—তিন-চারজন আছে—মালপত্তর। কত ভাড়া নিবি?

—এক বাত বোলেগা বাবুজি? চার রূপেয়া!

—কত?

—চার রূপেয়া বাবুজি। কাল ইস্‌সে আউর বাঢ়েগা বাবুজি। কাল পান্-ছ রূপেয়া হোগা। দিন দিন বাড়তে যাতা হ্যায়—যাবেন আপনি? সওয়ারি কোথা থেকে যাবে?

ক্ষেত্রবাবু কী একটা অজুহাত দেখাইয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। তাহার হাত-পায়েন অবশ হইয়া আসিতেছে—সম্মুখে যেন ঘোর বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে, প্রলয় অথবা মৃত্যু, স্ত্রীপুত্র লইয়া এই ব্ল্যাক-আউটের ঘুটঘুটে অন্ধকারাচ্ছন্ন কলিকাতা শহরে তিনি বোতলের ছিপি আঁটা অবস্থায় বুঝি মারা পড়িলেন! ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া দিনে দিনে যদি অসম্ভব অঙ্কের দিকেছোটে, তবে তার মতো গরিব স্কুল-মাস্টার তো নিরুপায়!

মোড়ের মাথায় বিষু ভট্‌চাজের সঙ্গে অন্ধকারে প্রায় মাথা ঠুকিয়া গেল। পরস্পরকেচিনিয়া পরস্পর ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বিষ্ণু হাওড়ার রেলওয়ে মালগুদামে কাজ করে, বলিল, ওঃ, জানেন ক্ষেত্রদা, কী কাণ্ড আজ হাওড়া স্টেশনে! প্রত্যেক ট্রেন ছাড়ছে, লোকে লোকারণ্য।লোক গাড়িতে উঠতে পারছে না—দশ টাকা, পনেরো টাকা করে কুলিরা নিচ্ছে। আবার শুনচি, হাওড়া ব্রিজ দিয়ে গাড়ি-ঘোড়া যাওয়া বন্ধ করে দেবে। এত ভিড় যে, স্ট্র্যান্ড রোড একেবারেজ্যাম—ই.আই.আর.-এর গাড়িতে ওঠবার উপায় নেই।

—তুমি এখনও আছো যে?

—আমি আর কোথায় যাব? ফ্যামিলি পাঠিয়ে দিয়েছি বীরভূম—মামাশ্বশুর-বাড়ি।

ক্ষেত্রবাবু বাসায় ঢুকিলেন। অনিলা বলিল, কী হল গো? যদুবাবু কী বললে?

—বলবে আর কী! সব একই অবস্থা। সেও ভাবছে কোথায় যাবে—জায়গা নেই—

—গয়া যাবে?

—যাব কি, ই.আই.আর.-এর গাড়িতে নাকি যাওয়ার উপায় নেই!

—তবে কী করবে? স্কুল তো এখনও বন্ধ হল না!

—বন্ধ হলে কী হবে? আমার ছুটির মধ্যে ডিউটি পড়েছে—আমার যাবার জো নেই—

অনিলা স্বামীর হাত ধরিয়া মিনতির সুরে বলিল, ওগো, আমার মুখের দিকে চেয়ে তুমি চাকরি ছেড়ে দাও। এই বোমার হিড়িকে তোমাকে এখানে ফেলে রেখে আমার কোথাও গিয়ে শান্তি হবে না। ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে চাইতে হবে, লক্ষ্মীটি, শুধু তোমার-আমার কথাভাবলে হবে না।

ক্ষেত্রবাবুর মনে হইল, তাহার মাথার উপর ভীষণ বিপদ সমাগত। স্ত্রীর গলার সুরে, নিজের মুখের কথায় যেন কোনো মহা ট্র্যাজেডির ইঙ্গিত দিতেছে, সে ট্র্যাজেডির বেড়াজালএড়াইয়া কোথাও পলাইবার পথ নাই।

সারারাত্রি বড় রাস্তা দিয়া ঘড়-ঘড় করিয়া ঘোড়ার গাড়ি আর ঠুনঠুন করিয়া রিক্‌শাছুটিতেছে—ক্ষেত্রবাবু বিনিদ্র চক্ষে সারারাত্রি ধরিয়া শুনিয়াই চলিলেন। অনিলা ঘুমাইয়াপড়িয়াছে, ছেলেমেয়েরা ঘুমাইতেছে, সম্মুখে কী বিপদ, ইহাদের সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নাই।কী করিয়া উদ্যত জাপানি বোমার হাত হইতে ইহাদের বাঁচাইবেন? বাঁচাইতে পারিবেন কি শেষ পর্যন্ত ? হাতে টাকা-পয়সা কোথায় ?

সারারাত্রি ক্ষেত্রবাবু বিছানায় এপাশ ওপাশ করিলেন।

পরদিন স্কুলের প্রমোশন। সাহেব খুব সকালে উঠিয়া—অভিভাবকদের পড়িয়া শোনাইবারজন্য যে রিপোর্ট লিখিয়াছেন, তাহা আর-একবার পড়িয়া দেখিতে বসিলেন। আজ ছেলেদেরপ্রমোশনের পর অভিভাবকদের সভায় এই রিপোর্ট পড়া হইবে—প্রতি বৎসর হইয়া থাকে, অভিভাবকদের নিমন্ত্রণ করা হয়, এবারেও হইয়াছে।

“বড়ই আনন্দের কথা, সপ্তম শ্রেণীর ইংরেজি পরীক্ষার ফল এবার যথেষ্ট আশাপ্রদ; যদিও ক্লাসের সর্বোচ্চ নম্বর শতকরা বাহান্ন, তবুও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রত্যেকউত্তরের খাতা আমাকে যথেষ্ট সন্তোষ দান করিয়াছে। ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে হরিচরণ এবারগ্রামারে বিশেষ উন্নতি করিয়াছে, যদিও ক্রিয়াপদের যথার্থ প্রয়োগ এখনও সে শিক্ষা করে নাই। গ্রামার শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক এজন্য যত্ন লইতেছেন। শ্রীমান নবীনচন্দ্র গুঁই ইংরাজি আর্টিকলের ব্যবহারে বালকসুলভ ভ্রম প্রদর্শন করা সত্ত্বেও তাহার গ্রামারের জ্ঞান উন্নতির পথে অগ্রসরহইতেছে। নবম শ্রেণীর অঙ্কের ফল এ বৎসর আশাতীত ভাল। শ্রীমান গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নব্বই নম্বর পাইয়া অঙ্কে ক্লাসের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। আমি এই বালকের গতবৎসরে অঙ্ক পরীক্ষার ফলের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—বিগত বৎসরের ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় শ্রীমান গোপাল বীজগণিত ও জ্যামিতিতে যথাক্রমে আটচল্লিশও বত্রিশ নম্বর মাত্র পায়—এক বৎসরের মধ্যে সেই বালকের এই উন্নতি শুধু যে কেবলঅঙ্কশিক্ষকের কৃতিত্বের পরিচায়ক তাহা নহে, বালকের নিজের অধ্যবসায় ও আগ্রহেরও নিদর্শন বটে। আমি এজন্য তাহাকে একটি স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র দিব স্থির করিলাম। শ্রীমান লালগোপাল ধর ইতিহাসে এ বৎসর...” ইত্যাদি।

অভিভাবকদের কাছে এই ধরনের রিপোর্ট পাঠ কোনো স্কুলেই হয় না—কিন্তু সাহেবের বিশ্বাস, ইহাতে অভিভাবকেরা সন্তুষ্ট থাকে, স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বাড়ে। এই ধরনের রিপোর্ট পাঠনাকি ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলের একটি বৈশিষ্ট্য। কৃতী বালকদিগকে স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র দানআর একটি বৈশিষ্ট্য; যদিও ছেলেরা আড়ালে বলাবলি করে, রৌপ্যপদক দিতে অর্থব্যয় আছে, প্রশংসাপত্র দিতে খরচ শুধু কাগজের।

মাস্টারেরা বেলা নয়টার মধ্যে আসিয়া গেল। কাল সারকুলার দেওয়া হইয়াছিল—বিভিন্নমাস্টারের বিভিন্ন কাজ। কেহ প্রমোশন-প্রাপ্ত ছেলেদের নাম, ক্লাস ও সারি তালিকা করিতেছে, কেহ ভাল ছেলেদের পরীক্ষার খাতাগুলি আলাদা করিয়া রাখিতেছে, কেহ নতুন ক্লাসের বইয়ের লিস্টগুলি তৈয়ারি করিতেছে। দুইজনে মিলিয়া একখানা বিজ্ঞাপন লিথো করিতেছে [এই স্কুলেআধুনিকতম শিক্ষাবিজ্ঞান অনুমোদিত পদ্ধতিতে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়, হেডমাস্টার মি.জি. বি. ক্লার্কওয়েল এম. এ. (লিড্‌স) বি.এড. (লন্ডন) এল.টি. (কর্ক) এস.সি.এম.এস. (অমুক)স্বয়ং নবম ও দশম শ্রেণীতে ইংরাজি পড়ান এবং শিশু-শ্রেণীতে কথ্য ইংরেজি শিক্ষা দেন।আমরা স্পর্ধার সহিত বলিতে পারি—]।

বিজ্ঞাপন ছাপাইবার পয়সা নাই—তাই লিথো করা। অভিভাবকদের হাতে বিলি করা হইবে। হেডমাস্টারের নানা ফাইফরমাশ খাটিতে খাটিতে মাস্টারেরা হিমসিম খাইয়া গেল।

বেলা দশটা বাজিল। এ কয়দিন ছেলেরা তেমন নাই—কারণ পরীক্ষার পর একরকমছুটিই ছিল। আজ প্রমোশনের দিন, অন্য অন্য বছর বেলা সাড়ে নয়টার সময় হইতে ছেলেদেরভিড় হয়—এবার জনপ্রাণীর দেখা নাই। বেলা এগারোটা বাজিল, কেহই নাই। সাড়ে এগারোটারসময় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন মাত্র ছাত্র আসিল—তিনশো সাড়ে তিনশো ছেলেদের মধ্যে। দুইজনমাত্র অভিভাবক দেখা দিলেন প্রায় বারোটার সময়। আর কেহই আসিল না। হেডমাস্টার রীতিমতো নিরাশ হইলেন—কত কষ্ট করিয়া লেখা রিপোর্ট কাহার সামনে পাঠ করিবেন? তবুও তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন, নিজের ঘর হইতে গাউন ঝুলাইয়া ও শ্লেটের মতো দেখিতে হ্যাটমাথায় দিয়া সাজিয়া-গুজিয়া মাস্টারদের লইয়া ক্লাসে ক্লাসে প্রমোশন দিতে গেলেন।

মি. আলম বলিলেন, স্যার, নীচের তলায় কোনো ক্লাসে ছেলে নেই—ছোট ছোট ছেলেদেরক্লাস একেবারে ফাঁকা। সেখানে কি যেতে হবে?

সাহেব হাইকোর্টের জজের মতো গম্ভীর সুরে বলিলেন, নিয়ম যা, তার এতটুকুব্যতিক্রমহবার জো নেই আমার স্কুলে। শূন্য ক্লাসের সামনেই প্রমোশনের লিস্ট পড়া হবে।

সুতরাং উপরের ক্লাসের প্রমোশন লিস্ট পড়া শেষ করিয়া হেডমাস্টার দলবল লইয়ানীচেকার শূন্য ক্লাসগুলিতে অবতীর্ণ হইলেন।

হেডমাস্টার ডাকিলেন, রমেন্দ্র বোস প্রোমোটেড্ টু নেকস্‌ট হাইয়ার ক্লাস, অমুকপ্রোমোটেড্ টু নেকস্‌ট হাইয়ার ক্লাস, ইত্যাদি।

ফাঁকা হাওয়া এ-জানালায় ও-জানলায় হা-হা করিতেছে। কড়িকাঠে টিকটিকি টিক্‌টিক্‌করিয়া উঠিল; হাসি পাইলেও কোনো মাস্টারের হাসির জো নাই। শ্রীশবাবু গেম-মাস্টারবিনোদবাবুর পাঁজরায় আঙুলের গুঁতা মারিলেন। যদুবাবু ক্ষেত্রবাবুকে চিমটি কাটিলেন।

উপরে আসিয়া রিপার্ট পড়িবার সময় দেখা গেল, সেই দুইজন অভিভাবক আপিসে বসিয়াআছে। তাহারা সাহেবের বার্ষিক প্রোগ্রেস রিপোর্ট শুনিতে আসে নাই, আসিয়াছে তাহাদেরছেলেদের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইতে।

সাহেবের ইঙ্গিতে মি. আলম তাহাদের আড়ালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারাএ স্কুল থেকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন কেন? ওদের এ বছরের ফল বেশ ভালই। হেডমাস্টারেররিপোর্টটা শুনুন না—

একজন বলিল, রিপোর্ট শুনে কী করব মশাই, আমাদের ফ্যামিলি সব এখান থেকে চলেগিয়েছে কাটোয়ায়, আজ আট-দশ দিন হল। সেখানে এখন সবাই থাকবে। এখানে বাড়ি চাবিবন্ধ, ছেলে থাকবে কার কাছে? সেখানেই ভর্তি করে দেব।

অন্য লোকটি বলিল, আমাদের দেশ মশাই বর্ধমানে। আমাদের দোকান ছিল, উঠিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। দেশের স্কুলে ভর্তি করব। আপনি সাহেবকে বলুন, ট্রান্সফার আজই দিতে হবে।আমাদের পাড়ায় লোক নেই, থাকব কী ভরসায়?

—রিপোর্টটা শুনুন না!

—না মশাই, মন ভাল না। ওসব শোনবার সময় নেই। আমার ব্যবস্থাটা করে দিন তাড়াতাড়ি।

মি. আলম ফিরিয়া আসিলে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কী হল?

—স্যার, ওরা শোনে না। ট্রান্সফার না নিয়ে ছাড়বে না মনে হচ্ছে।

—ছেলে এল না কেন আজ?

রামেন্দুবাবু বলিলেন, ছেলে কোথায় যে আসবে স্যার? সব ভেগেছে!

নমো নমো করিয়া মিটিং শেষ হইল। রিপোর্ট পাঠ হইল স্কুলের মাস্টারদের সামনে। মিটিংঅন্তে হেডমাস্টারের নানারকম সারকুলার বাহির হইল—এ মাস্টারকে এ করিতে হইবে, ওমাস্টারকে ও করিতে হইবে। ছুটির সারকুলার বাহির হইল—দোসরা জানুয়ারি স্কুল খুলিবে।হেডমাস্টারের নিকট মাস্টারেরা বিদায় লইলেন। অতি সাধের লিথো-করা-বিজ্ঞাপন কাহাদের মধ্যেবিলি করা হইবে? স্কুলের বোর্ডে খানকতক আঠা দিয়া জুড়িয়া দেওয়া হইল।

চায়ের দোকানে যদুবাবু আর শ্রীশবাবু হাসিয়া বাঁচেন না।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, সাহেবের কী কাণ্ড! কোনো ত্রুটি হবার জো নেই!

যদুবাবু বলিলেন, নাঃ, হেসে আর বাঁচিনে—হাসতে হাসতে পেট ফুলে উঠল। হাসতেওপারিনে সাহেবের সামনে—

এই সময় জ্যোতির্বিনোদ একটা পুঁটুলি হাতে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, আজ শেষ দিনটা, একটু ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করা যাক যদুদা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, হাতে পোঁটলা কিসের হে?

—আজ বাড়ি যাচ্ছি রাত্রের গাড়িতে।

—এ ক'দিনের জন্যে ?

—না দাদা, বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে। যাই চলে, যা হয় হবে। এখন কলকাতা আসাবোধ হয় হবে না।

সাহেব কি ছুটি দেবে?

—না হয় চাকরি ছেড়ে দেব। দেশে ঘর আছে, ভিক্ষে করে খাব। বামুনের ছেলে, তাতেলজ্জা নেই।

যদুবাবুর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁত করিয়া উঠিল। এই জ্যোতির্বিনোদের মতো সামান্য দরের লোকে যদি চাকরি ছাড়িয়া দিবার মতো মরীয়া হইয়া উঠিতে পারে, তবে বিপদ কত বেশি!

—কে একজন বলিল, ক্ষেত্রদার হোমিওপ্যাথিটা যা হোক চলছিল—

—আর হোমিওপ্যাথি ভায়া! পাড়ায় নেই লোক, ডাক্তারি করতাম একটু-আধটুঅবসরমত, তাও গেল—পাড়া খালি।

যদুবাবু হঠাৎ যেন শীতকালেও ঘামিয়া উঠিতে লাগিলেন। শ্রীশবাবু, শরৎবাবু, গেমমাস্টার বিনোদবাবু, হেডপণ্ডিত, সবাই আজ উপস্থিত। বড়দিনের ছুটি হইয়া যাইতেছে—তাহারউপর এই গোলমাল। কী হইবে কে জানে? একটু ভাল করিয়া খাওয়া-দাওয়া করিয়া লওয়াযাক। ইঁহাদের ভাল খাওয়ার দৌড়—চার পয়সা হইতে ছয় পয়সা বা আট পয়সা। একখানাটোস্টের জায়গায় দুইখানা টোস্ট। তাহাই সকলে আমোদ করিয়া খাইলেন। ইঁহারা অল্পেই সন্তুষ্ট, অভাবের মধ্যে সারা জীবন এবং যৌবনের প্রথম অংশ অতিবাহিত করিয়া সংযম ও মিতব্যয়েঅভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

ইঁহাদের মধ্যে জগদীশ জ্যোতির্বিনোদ অমিতব্যয়িতার প্রথম উদাহরণ দেখাইয়া বলিলেন, ওহে দোকানদার, যদুবাবুকে আরও একখানা কেক দাও, শ্রীশবাবুকে একখানা টোস্ট দাও, বিনোদকে—

যদুবাবু একগাল হাসিয়া বলিলেন, আমাদের জ্যোতির্বিনোদের হার্টটা যাই বলো বেশ ভাল!

—আর দাদা, হার্ট! এবার কলকাতা থেকে চলে যাচ্ছি। বোধ হয় এই শেষ দেখা—চাকরিআর করব না—

—কেন, কেন?

—বাড়ির সকলে বলছে, প্রাণ বাঁচলে অনেক চাকরি মিলবে—চলে এসো বাড়ি।

যদুবাবু কথাটা এই কিছুক্ষণ আগেই একবার শুনিয়াছেন ইহার মুখ হইতে, তবুও আর একবার জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিয়া বিপদের গুরুত্বটা ভাল করিয়া যেন বুঝিতে চাহিলেন।

ক্ষেত্রবাবুকে বলিলেন, তারপর ক্ষেত্র ভায়া, ব্যাপার কী দাঁড়াল বলো তো? সত্যি কিকলকাতা ছেড়ে যেতে হবে?

ক্ষেত্রবাবুও ঠিক এই কথাই ভাবিতেছেন। চা খাইতে খাইতে এই মাত্র ভাবিতেছিলেন, আস্‌সিংড়ি যাওয়া ভাল, না ডিহিরি-অন-সোনে শ্বশুরবাড়িতে? যদুবাবুর কথায় যেন একটু বিস্মিত হইলেন। ভয়ানক বিপদ নিশ্চয় সম্মুখে, নতুবা যদুদার মনেও ঠিক একই সময়ে সেই একই কথা উঠিল কেন? বলিলেন, তা যেতে হবে বইকি। সবাই যখন পালাল—

গেম্‌-মাস্টার বলিলেন, আমার এক বন্ধুর বাড়িতে রেডিও আছে। টোকিও থেকে নাকি বলেছে, সাতাশে তারিখে কলকাতায় নিশ্চয়ই বোমা ফেলবে—

যদুবাবু সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, অ্যাঁ!

ক্ষেত্রবাবুর নিজের স্নায়ুসমূহের উপর কর্তৃত্ব আরও দৃঢ়তর। তিনি বলিলেন, কোন্‌ সাতাশে? এই সাতাশে?

—এই সামনের সাতাশে দাদা। আজ হল সতেরো।

যদুবাবুর সামনে এইবার দোকানী জ্যোতির্বিনোদের অর্ডারি সেই কেকখানা দিয়া গেল।যদুবাবুর তখন আর কেক খাইবার রুচি নাই—অন্য সময়ে হইলে পরের দেওয়া চার পয়সা দামের ভাল কেকখানা কী তৃপ্তির সঙ্গেই একটু একটু করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া চায়ের সঙ্গে খাইয়াশেষ করিতে অন্তত দশ-পনেরো মিনিট করিতেন—পাছে তাড়াতাড়ি ফুরাইয়া যায়! আজ কিন্তুযদুবাবুর মনে হইল, তিনি মিউনিসিপ্যালিটির জবাইখানার মধ্যে বসিয়া আছেন, চারিধারে গরুর বদলে মানুষের কাটা হাত, পা, ঘিলু-বার হওয়া শূন্যগর্ভ নরমুণ্ড, চাপ চাপ রক্ত, থেঁতলানোধড়, ছটকিয়া পড়া দন্তপাটি—শবের উপরে শব, রক্তমাখা চুলের বোঝা, উগ্র কর্ডাইটের গন্ধ, মৃত্যু, আর্তনাদ।

যদুবাবু নিজের অজানিতে শিহরিয়া উঠিলেন।

কোথায় যাইবেন তিনি? যাইবার কোনো জায়গা নাই। বেড়াবাড়ি গিয়া উঠিবেন অবনীরখোশামোদ করিয়া, হাতে পায়ে ধরিয়া? এ বিপদসঙ্কুল স্থানে মরণের ফাঁদের মধ্যে নিশ্চেষ্ট হইয়াবসিয়া থাকার চেয়ে তাও যে ভাল। ভাগ্যে আজ রামেন্দুবাবুকে ধরিয়া কহিয়া গোটাকতক টাকা সাহেবের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছেন!

সম্মুখের টেবিলস্থ পাত্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ইতিমধ্যে কখন কেকখানা খাইয়া ফেলিয়াছেন অন্যমনস্ক অবস্থায়। টেবিল হইতে উঠিয়া বলিলেন, তোমরা তা হলে বোসো,আমিআসি—

জ্যোতির্বিনোদ বলিল, আরে বসুন বসুন যদুবাবু, আর এক পেয়ালা চা দেবে? আরএকখানা কেক্‌?

—আরে, না হে না। আমার সময় নেই সত্যি। একটা জরুরি কাজ আছে, আমি চলি—অপরের চা ও খাবার যদুবাবু বোধ হয় জীবনে এই সর্বপ্রথম প্রত্যাখ্যান করিলেন।

বেলা সাড়ে পাঁচটা। শীতের বেলা, সন্ধ্যার বেশি দেরি নেই। ব্ল্যাকআউটের কলিকাতায়বেশি ঘোরাঘুরি করা চলিবে না, তবুও যদুবাবু শ্যামবাজারে তাহার এক জানাশোনা লোকেরআড়তে গিয়া কিছু টাকা ধারের চেষ্টা একবার দেখিলেন। যদি কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে হয়, বেশ কিছু রেস্ত থাকা দরকার হাতে।

টালার পুলের পাশ দিয়া গলিটা নামিয়া গেল। যদুবাবু দুরদুরু বক্ষে আড়তের নিকটবর্তী হইলেন, কী জানি কি ঘটে! কত টাকা চাহিবেন? দশ, না ত্রিশ? পাওয়া যাইবে কিএ বাজারে ? বিশেষত এস্থলে আলাপ-পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। লোকটি তাঁহার শালার সহপাঠী, শালার সঙ্গে কয়েকবার ইতিপূর্বে এখানে আসিয়াছেন—একসময়ে যাতায়াত ছিল, এখন কমিয়া গিয়াছে।

আড়তের টিনের চালা নজরে পড়িতেই যদুবাবুর বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, জিভশুকাইয়া আসিল।

পথের ধারে খালের জলে একটা হাঁড়ি-বোঝাই ভড় হইতে লোকজন হাঁড়ি নামাইতেছিল।যদুবাবু লক্ষ্য করিলেন, অনেকগুলি মাটির তোলোহাঁড়ি ডাঙায় সাজাইয়া এক পাশে রাখিয়াদিয়াছে। একপাশে স্তূপাকার কলিকা। লুঙ্গি-পরা একজন মাঝি আরও কলিকা নামাইতেছে।

যদুবাবু ভাবিলেন, এ হাঁড়িতে আর কি কেউ ভাত রেঁধে খাবে? কলকাতা শহর তো ফাঁকা —এত কল্কেতেই বা তামাক খাবে কে?

তখন একেবারে আড়তের সামনে তিনি পৌঁছিয়া গিয়াছেন।

সামনেই একজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, বছর পঞ্চাশেক বয়স, মাথায় টাক, রঙ খুবগৌরবর্ণ, গায়ে হাতকাটা বেনিয়ান। লোকটি গুড়গুড়িতে তামাক খাইতেছিলেন।

যদুবাবু পৈঠা দিয়া উঠিতে উঠিতে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, এই যেসীতানাথবাবু, ভাল আছেন?

—এই যে যদুবাবু, আসুন-বসুন। তারপর কোথা থেকে? রামনাথ কোথায় ?

রামনাথ যদুবাবুর শ্যালক, আজ বছর কয়েক যদুবাবু তাহার কোনো খবর জানেন না; সেও ভগ্নীপতির খবরাখবর রাখে না। কিন্তু সে কথা এস্থলে বলা ঠিক হইবে না। যাহার সুবাদে আড়তের মালিকের সঙ্গে পরিচয়, সে-ই যদি খোঁজখবর না রাখে, তবে ইহার নিকটও যদুবাবুকে কিঞ্চিৎ খেলো হইতে হয় বইকি। সুতরাং তিনি বলিলেন, রামু সেইখানেই আছে। মধ্যে আসবে লিখেছিল, ছুটি পাচ্ছে না—

—সেই জব্বলপুরেই আছে? আছে ভাল?

—হ্যাঁ, তা ভাল আছে।

—আপনাদের স্কুল ছুটি হয়ে যায়নি ? আপনি এখনও স্কুলে আছেন তো?

—আছি বইকি! নয়তো কী আর করব বলুন? আপনাদের মতন তো ব্যবসা-বাণিজ্য শিখিনি।

আড়তের মালিক হাসিয়া বলিলেন, আপনাদের তো ভাল, বিছানা-বাক্স বাঁধলেন, কলকাতা থেকে পালালেন, আমাদের কী হয় বলুন তো? গুদামভরা মাল নিয়ে এখন যাই কোথায় ? বোমাপড়ে, এখানেই যা হয় হোক। বসুন, চা খাবেন? ওরে, দু পেয়ালা চা করতে বলো ঠাকুরকে?

চা খাইয়া এ-কথা ও-কথার পরে যদুবাবু আসল কথাটি উত্থাপন করিবার পূর্বে যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করিয়া লইলেন। তাহার পর শুষ্কমুখে বার দুই-তিন ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন, আপনার কাছে এসেছিলাম সীতানাথবাবু, হাতে বিশেষ কিছু নেই, একেবারেই খালি। কলকাতার বাইরে যেতে হলে কিছু হাতে রাখা দরকার। গোটা কুড়ি টাকা যদি আমাকে ধার দেন এসময় তবে বড়ই উপকার করা হয় আমি অবিশ্যি যত সত্বর সম্ভব হয়, আপনার ধার শোধ করব, জানুয়ারি মাসের মাইনে থেকে—

চাহিবার ভাষা অবশ্য ইহাই। আড়তদার সীতানাথবাবু স্কুল-মাস্টার নহেন, লোক চরাইয়া খান। টাকা ধার লইলে কেহ স্বেচ্ছায় শোধ দিয়া যায় বাড়ি বহিয়া, ইহা বিশ্বাস করেন না। যদুবাবুর সঙ্গে তেমনি ঘনিষ্ঠতাও তাঁহার নাই, এ অবস্থায় যদুবাবু একেবারে কুড়ি টাকা ধারচাওয়াতে কিঞ্চিৎ বিস্মিতও হইয়াছিলেন। বেশ অমায়িকভাবে হাসিয়া, কথার সঙ্গে কিছুমাত্রডালপালা না জুড়িয়া যথেষ্ট ভদ্রতা ও বিনয়েরসহিত বলিলেন, টাকা হবে না। এ সময় নয়—

যদুবাবু আর কোনো কথা বলিতে পারিলেন না। সীতানাথবাবুর গলার সুরে হৃদ্যতা বাআত্মীয়তার লেশমাত্র নেই। চাঁচাছোলা কেতাদুরস্ত ভাবের ভদ্রতার সুর। শুনিলে ভয় হয়, দ্বিতীয়বার আর যাচ্ঞা করা চলে না। তবুও প্রাণের দায় বড় দায়—কাল সকালে তিনি কলিকাতা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবেনই, যেদিকে দুই চোখ যায়,

এখানে লজ্জা করিলে চলিবে না।সুতরাং আবার বলিলেন, তা দেখুন সীতানাথবাবু, একটু দেখুন। হয়ে যাবে এখন। আমার বড়দরকার। কলকাতা থেকে চলে যাবার উপায় নেই, আমাকে একটু সাহায্য করুন—

—হবে না। পারব না। মাপ করুন—

সীতানাথবাবু হাতজোড় করিলেন এমন ভঙ্গিতে, যেন তিনি বিশেষ কোনো অপরাধকরিয়া ফেলিয়াছেন যদুবাবুর কাছে।

তবুও যদুবাবু আবার বলিলেন, তবে না হয় আমায় পনেরেটা কি দশটা টাকা দিন যাপারেন—আমি যে বড় টানাটানিতে পড়েছি কিনা—জানুয়ারি মাসের মাইনে পেলেই—

সীতানাথবাবু কী ভাবিয়া বলেন, পাঁচটা টাকা নিয়ে যান, এসেছেন যখন! ও গোপাল, ক্যাশ থেকে পাঁচটা টাকা দাও তো!ওদিকে একজন বৃদ্ধ লোক বসিয়া খাতাপত্র লিখিতেছিল, সে বলিল, খাতায় কী লিখববাবু?

—আমার নিজ নামে হাওলাত লিখে রাখ। এই নিন—আসুন।

যদুবাবু নমস্কার করিয়া সীতানাথবাবুর আড়ত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। শ্যামবাজারেরমোড় পর্যন্ত আর আসিতে পারেন না, রাস্তা পার হইতে পারেন না, ঘুটঘুটে অন্ধকার। ওখানা কীআসে—রিক্‌শা, না মোটর?

আলো চলিয়া আসিতেছে—অন্ধকারের মধ্যে কত জোরে আসিতেছে বোঝা যায় না, ঘাড়ে পড়িবে নাকি?

বাড়ি আসিলেন তখন দশটা রাত্রি।যদুবাবুর স্ত্রী বলিল, এলে ? আমি ভেবে মরি, এত রাত পর্যন্ত এই অন্ধকারে—

—শোনো, বিছানা-বাক্স গুছিয়ে নাও—কাল সকালের ট্রেনেই বেরুতে হবে, আর নয়এখানে—

যদুবাবুর স্ত্রী অবাক হইয়া যদুবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, সে কী গো! যাবে কোথায়একটা ঠিক কর আগে!

—অত ঠিক করার সময় নেই। চল বেড়াবাড়ি যাই।যদুবাবুর স্ত্রী শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, ওগো, তুমি মাপ করো। সেখানে আমি যাব না।

যদুবাবু মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, তবে মরগে যাও—যাবে কোথায় ? দাঁড়াবার জায়গা আছে কোথায় জিগ্যেস করি ? এখানে মর বোমা খেয়ে!

—তা সেও ভাল। অবনী ঠাকুরপোর বউ আর মায়ের খিটিং খিটিং দাঁতের বাদ্যি আমারসহ্য হবে না। তার চেয়ে মরি বোমা খেয়েই মরি।

—তবে মর, যা হয় কর। আমি কিছু জানিনে—

—তুমি যাও না নিজে। রেখে যাও আমায় এখানে—

আহারাদি করিয়া যদুবাবু মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বেড়াবাড়ি যদি না যাওয়াযায়, তবে কোথায় গিয়া উঠিবেন এখন? দিদির বাড়ি? হুগলি জেলার যে পল্লীগ্রামে তাহারদিদির বাড়ি, ভগ্নীপতির মৃত্যুর পরে বহুদিন কেন, বহুকাল সেখানে যাওয়া হয় নাই। বাড়িঘরেরকী আছে না আছে, তিনি জানেনও না। সেইখানেই অগত্যা যাইতে হয়। মোটের উপর যেখানেহয়, কাল সকালেই পলাইতে হয়। ভাবিবার সময় নাই।

একবার কী একটা শব্দ উঠল, যদুবাবু চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এরোপ্লেনের শব্দ, সাইরেন বাজিল নাকি?

পোঁ—ও—ও—ও—

ক্রমশ শব্দটা মাথার উপরে আসিতেছে। যদুবাবুর প্লীহা চমকাইয়া গেল। জাপানি প্লেন যে নয়, তাহা কে বলিল? যদুবাবুর স্ত্রী বলিল, এই দেখ একখানা উড়োজাহাজ আলো জ্বালিয়ে মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে!

যদুবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, চুপ চুপ, হ্যারিকেনটা ঘরের মধ্যে নিয়ে যাও—ঘরের মধ্যেনিয়ে যাও—বোমা! বোমা! জাপানি বোমা!

আবার সেই রক্তাক্ত জবাইখানার দৃশ্য তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিল—রক্ত, চুল, অস্থি, মাংস। স্ত্রীকে বলিলেন, বেঁধে নাও, বিছানা-টিছানা বেঁধে ফেল—ক'টা বেজেছে দেখ তো, দেশেই যাব ঠিক করলাম, নিজের দেশে।

আজ রাতটা কি কোনো রকমে কাটিবে না?

সকাল হইতে না হইতে যদুবাবু ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিতে গেলেন। হাওড়া স্টেশনেযাইতে কেহ হাঁকিল তিন টাকা, কেহ হাঁকিল সাড়ে তিন টাকা। একজন বলিল, হাওড়ার পুলবন্ধ হয়ে গিয়েছে বাবু, কোনো গাড়ি যেতে দিচ্ছে না—

যদুবাবু চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, কে বললে?

—হামরা সব জানি বাবু।

দুইখানা রিক্‌শা ঠুন্‌ঠুন্ করিয়া যাইতেছিল। তাহাদের থামাইয়া, বারো আনায় রিক্‌শা ঠিক করিয়া তাহাদের বাসার সামনে আনিলেন। তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই। যদি হাওড়ার পুল বন্ধ থাকে, বালি ব্রিজ হইয়া রিক্‌শা ঘুরাইয়া লইবেন—যত টাকা লাগে! কলিকাতা হইতেবাহির হইতেই হইবে। এ মৃত্যুর ফাঁদ হইতে বাহির হইতে পারিবেন না কি কোনো রকমে ? জাপানি বোমা !!!

জিনিসপত্র রিক্‌শায় বোঝাই দিয়া মলঙ্গা লেন হইতে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে পড়িয়াবউবাজার দিয়া হাওড়ার পুলের দিকে চলিলেন। একটু একটু ফরসা হইয়াছে। পুল নির্বিঘ্নে পারহইয়া গেল, অত ভোরেও দলে দলে ছ্যাকরা গাড়ি, মোটর, রিক্‌শা, ঠ্যালাগাড়ি, মোট-মাথায় মুটে, পথচারীর দল চলিয়াছে পুল বাহিয়া। যদুবাবু নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, তবে কি পুল পার হইতে পারিয়াছেন সত্যই? বোধ হয় এ-যাত্রা তবে রক্ষা পাইয়া গেলেন!

স্টেশন লোকে লোকারণ্য অত সকালেও। বউ-ঝি, ছেলে-মেয়ে, লটবহর, মুটে, বিছানা, ধামা, ট্রাঙ্ক, গুড়ের ভাড়, তেলের টিন, ছাতালাঠির বান্ডিল, চ্যাঁ-ভ্যাঁ, হৈ-চৈ। টিকিট কাটিতে গিয়া দেখিলেন, টিকিটের জানালা খোলে নাই। অথচ সেখানে সার বাঁধিয়া লোক দাঁড়াইয়া। গেটে ঢুকিবার উপায় নাই, পিষিয়া তালগোল পাকাইয়া কোনোরকমে প্ল্যাটফর্মে ঢুকিলেন। গাড়ির দরজায় চাবি—লোকজন জানালা দিয়া লাফাইয়া ডিঙাইয়া কামরার মধ্যে ঢুকিতেছে। যদুবাবু একভদ্রলোককে বলিলেন, মশায়, একটু দয়া করে যদি সাহায্য করেন মেয়েদের।

যদুবাবুর স্ত্রী বসিবার জায়গা পাইলেন, কিন্তু তিনি নিজে অতি কষ্টে দাঁড়াইবার স্থানটুকুপাইলেন। এই সময় যদুবাবুর স্ত্রী বলিলেন, ওগো, সেই ছোট বালতিটা? সেটা সেই টিকিট ঘরেরসামনে—সেখানেই পড়ে আছে—

সর্বনাশ! যদুবাবু অমনি ছুটিলেন। আছে, ঠিক আছে। বালতিটা কেহই লয় নাই। ভিড়ের মধ্যে জিনিসপত্র চুরি যায় না। কাছে কাছে সর্বদাই লোক। সকলেই ভাবে, তাহার মধ্যে কাহারওজিনিস।

গেটে পুনরায় ঢুকিবার সময় বেজায় ভিড়। সারি সারি মুটে মোটঘাট মাথায় দাঁড়াইয়া,পিছনে বউ-ঝি, ছেলে-মেয়ে, পুরুষ। গেট আবার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। একটু পরে কেন যে হঠাৎগেট খুলিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। নরনারীর দল ধীর মন্থর গতিতে গেটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। একটি অল্পবয়সী বধূ দুই হাতে দুইটি ভারী পোঁটলা ঝুলাইয়া ভিড়েপিষিয়া যাইতেছে। যদুবাবুর মনে সেবা-প্রবৃত্তি জাগিল। আহা, কতটুকু মেয়ে, এই ভিড় সহ্য করাকি ওদের কাজ? যদুবাবু গিয়া বলিলেন, মা, আপনারপুঁটুলিটা দিন আমার হাতে—

বউটিকে সামনে দিয়া হাত দিয়া প্রায় বেড়িয়া ভিড়ের সংস্পর্শ হইতে বাঁচাইয়া, তাহাকেগেট পার করিয়া দিলেন। বউটির সঙ্গে উনিশ-কুড়ি বছরের ছোকরা, তাহার দুই হাতে দুইটি ভারী ট্রাঙ্ক। সে যদুবাবুকে বলিল, স্যার, আপনি কোন্ গাড়িতে যাবেন ? শেওড়াফুলি? তা হলেএক গাড়িতেই—

যদুবাবু বধূটিকে অনেক কষ্টে স্ত্রীর পাশে একটু জায়গা করিয়া বসাইয়া দিলেন। ট্রেন ছাড়িল।

পুনর্জন্ম।

যদুবাবু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। জাপানি বোমার পাল্লা হুগলি জেলা পর্যন্ত পৌঁছিবে না।

ক্ষেত্রবাবু শেষ পর্যন্ত আস্‌সিংড়ি গ্রামে যাওয়াই স্থির করিলেন। প্রায় আজ দশ বছর পরেযাওয়া। বহু কষ্টে ভিড়, অসুবিধা, অতিরিক্ত খরচ, ধাক্কাধুক্কি সহ্য করিয়া গ্রামে আসিয়াপৌঁছিলেন সন্ধ্যার কিছু আগে। গিয়া দেখিলেন, পৈতৃক বাড়ির পশ্চিম দিকের কুঠুরিতে গ্রামেরএক গরিব গৃহস্থ আশ্রয় লইয়াছে, তাহারা জাতিতে কৈবর্ত। তাহারা মনের আনন্দে গাছের ডাব ইঁচড় ইত্যাদি পাড়িয়া খাইতেছে, বাঁশঝাড়ের বাঁশ কাটাইতেছে, উঠানে প্রকাণ্ড তরিতরকারিরক্ষেত করিয়াছে। কোনোকালে কেহ আসিয়া এ-সব কাজের কৈফিয়ত চাহিবে, তাহারাকোনোদিনও ভাবে নাই। হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা বাড়ির মালিকদের আকস্মিক আবির্ভাবে তাহারা সন্ত্রস্ততটস্থ হইয়া পড়িল।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কে হে! ও, পাঁচু না? তোমরাই আছো?

পাঁচু হাত কচলাইয়া বলিল, আজ্ঞে আমরাই। বাড়িঘর সেবার পড়ে গেল ঝড়ে, তা বলিবাবুর বাড়ি পড়ে রয়েছে, তাই আমরা—

—আছো, ভালই। বাপের ভিটেতে সন্ধে পড়ছে। তা ওদিকে অত জঙ্গল করে রেখেছকেন? নিজেরাই থাকো, একটু ভাল করে রাখলে পারো। ওদিকের ঘরগুলো ভাল আছে?

—না বাবু। ওই একখানা ঘর ভাল ছিল, আমরাই থাকি। ওদিকের ঘরের ছাদ দিয়ে জল পড়ে।

—যাই হোক, এখন রাত্তিরটা থাকার ব্যবস্থা কী করা যায় ?

—ওদিকের ঘর দুটো পরিষ্কার করে দিই বাবুকে। এখনআসুন।

সেই ভাঙা ঘরের স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে জিনিসপত্র, স্ত্রীপুত্র লইয়া ক্ষেত্রবাবু সেই সন্ধ্যা হইতে অধিষ্ঠিত হইলেন। অনিলার আদৌ ইচ্ছা ছিল না এখানে আসিবার। শুধু টাকাপয়সার অভাবে গ্রামে আসিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে।

অনিলা বলে, সাপখোপ কামড়াবে নাকি! মেঝের ওপর শোয়া—তোমার এখানেতক্তপোশ নেই?

—ছিল—সবই। আজ দশ বছর আসিনি, লোকে চুরিই করুক বা উইয়েই খাক— পাঁচ-ছয় দিন কাটিয়া গেল।

গ্রামে আসিয়া নূতন জীবন শুরু হইয়াছে ক্ষেত্রবাবুর। সকালে উঠিয়া জেলেপাড়া হইতেমাছ সংগ্রহ করিয়া আনেন, বন-বাগান হইতে এঁচড় ডুমুর পাড়িয়া আনেন, কয়লা পাওয়া যায়না—সুতরাং কাঠ কুড়াইয়া আনেন। সকালে সাড়ে নয়টায় খাওয়ার পরিবর্তে বেলা বারোটায় খান।

অনিলা বলে, প্রাণ গেল বাপু, একটু কথা বলি কার সঙ্গে, এমন লোক খুঁজে মেলা দুর্ঘট!

—কেন, কাকাদের বাড়ি যাও, দত্তদের বাড়ি যাও—

—কী যাব, কেউ কথা বলতে পারে না। শুধু গেঁয়ো কথা—কী রাঁধলে ভাই? কতক্ষণরান্নার কথা বলা যায় বল তো? এর চেয়ে ডিহিরি গেলে খুব ভাল হত। শুনলে না আমার কথা!

শীঘ্রই কিন্তু এ অভাব দূর হইল।

গ্রামের একটা বাড়িতে কলিকাতা হইতে একঘর গৃহস্থ আসিল। ক্ষেত্রবাবুর মতো তাহারাও এই গ্রামের বাসিন্দা, কলিকাতায় বাড়ি আছে, বড়বাজারে মশলার ব্যবসা করিয়া বেশ সঙ্গতিপন্নঅবস্থা। তাহারা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে আরও দুই ঘর বোমা-ভীত-পরিবার। শেষোক্ত দলের একটি পরিবারের থাকিবার স্থান নাই, পূর্বোক্ত

গৃহস্থের প্রাচীন ঠাকুরদালানে দরমার বেড়া দিয়া আবরু সৃষ্টি করিয়া এক ঘর সেখানে রহিল। অপর পরিবারের জুন্য গ্রামে ঘর খুঁজিয়া মিলিলনা। সকলেই গরিব, কোঠাবাড়ি বেশি নাই—যাহা দুই-একখানা আছে, তাহাতে মালিকদের নিজেদেরই কুলায় না।

ক্ষেত্রবাবুর কাছে লোক আসিয়া বলিল, আপনার একখানা ঘর ভাড়া দেবেন?

ক্ষেত্রবাবু অবাক হইলেন। গ্রামের ভাঙা কুঠুরি কেহ ভাড়া লইবে, একথা কে কবে শুনিয়াছে? ভরসা করিয়া বলিলেন, তা দিতে পারি।

কী নেবেন?

ক্ষেত্রবাবু ভাবিয়া বলিলেন, তিন টাকা।

লোকটি এই গ্রামেরই লোক। বলিল, তিন টাকা কেন? পনেরো টাকা হাঁকুন না। তাইদেবে।

ক্ষেত্রবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, পনেরো টাকা বাড়িভাড়া কে দেবে? এই ভাঙা বাড়ির একখানা ঘরের ভাড়া তিন টাকা, তা-ই বেশি। পাগল!

—আপনি জানেন না, ওরা টাকার আন্ডিল, কারে না পড়লে কি করতে এসেছে এইপাড়াগাঁয়ে ? ঠিক দেবে, নইলে বাড়ি পাচ্ছে কোথায় ?

ক্ষেত্রবাবু হাজার হোক স্কুল-মাস্টার, অত ব্যবসাবুদ্ধি মাথায় খেলিলে আজ সতেরোআঠারো বছর ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলে পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনে মাস্টারি করিবেন কেন? তিনিস্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেলেন। অনিলা বলিল, সে কী গো, ওই ঘর আবার ভাড়া! ওরআছে কী যে, ভাড়া দেবে? তারা বিপদে পড়ে এসেছে, ওই ভাঙা দুটো ঘরে থাকতে চাইছে, এতেই বোঝো। এমনি থাকতে দাও, কথা বলবার মানুষ পাওয়া যাচ্ছে এক ঘর, এই না কত!

ক্ষেত্রবাবু ক্ষীণ সুরে বলিলেন, তিনটে টাকা দিতে চাচ্ছে—আর বাড়াচ্ছিনে অবিশ্যি। দিন তিনটে টাকা—নিই।

—নাও গে যাও, কিন্তু আর এই পয়সা বেশি বোলো না।

পরদিন ক্ষেত্রবাবুর ভাঙা ঘরে ভাড়াটেরা আসিয়া গেল—একটি বধূ, তিন ছেলেমেয়ে, প্রৌঢ়া ননদ। শোনা গেল, বধূটির স্বামী কাজ করে ইছাপুরে বন্দুকের কারখানায়। ছুটি পাইলেইএকবার আসিয়া দেখিয়া যাইবে। অনিলা বধূটির সঙ্গে খুব ভাব করিয়া ফেলিল, তার নাম কুসুমকুমারী, বাপের বাড়ি বাগবাজার—বৃন্দাবন মল্লিকের গলি। কলিকাতা ছাড়িয়া বাহিরে আসা এই প্রথম, বিশেষ করিয়া আস্‌সিংড়ির মতো অজ পল্লীগ্রামে। প্রত্যেক কাজেই অসুবিধা, না আছেদেওয়াল টিপিলেই আলো, কল টিপিলেই জল, না আছে ভাল রাস্তাঘাট, না আছে একটা টকিবায়স্কোপ।

তবুও দিন যায় কায়ক্লেশে। মেয়েছেলে, কেহ নিজের বাপেরবাড়ি শ্বশুরবাড়িকে অপর মেয়ের কাছে ছোট হইতে দিতে চায় না। কুসুম বাগবাজারের গল্প করে তো অনিলা ডিহিরিঅন-সোনের গল্পে তাহাকে ছাড়াইয়া যাইতে চায়।

শীত কাটিয়া বসন্ত পড়িল। ক্ষেত্রবাবুর মনে পড়িল, আমের বউলের গন্ধ কতদিন এমন পান নাই, বাঁশবন, মাঠে ঘেঁটুফুল ফোটার দৃশ্য কতকাল দেখেন নাই। বহুদিন পূর্বের বিস্মৃত শৈশবকালের স্মৃতি অতীত মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়া শৈশবের মাতাপিতার কত হাসি ও কথার টুকরাভুলিয়া-যাওয়া স্নেহস্বর লইয়া মনের মধ্যে উঁকি মারে।

হাতের পয়সা ফুরাইয়া গেল। অনিলা পিতৃগৃহ হইতে আসিবার সময় লুকাইয়া সামান্যকিছু অর্থ আনিয়াছিল, তাহা দিয়াই এতদিন চলিল, নতুবা ক্ষেত্রবাবু স্কুল হইতে বিশেষ কিছু আনেন নাই। ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল আর খোলে নাই, আঠারোই ডিসেম্বরের পরে কলিকাতার কোনো স্কুলই খুলে নাই—ক্ষেত্রবাবু স্কুল হইতে পত্র পাইয়া জানিয়াছেন, খবরের কাগজেওদেখিয়াছেন।

স্কুল কি উঠিয়া গেল! হেডমাস্টারের নামে দুই-তিনখানা পত্র দিয়াও উত্তর না পাওয়াতেবৈশাখ মাসের প্রথমে ক্ষেত্রবাবু নিজেই কলিকাতা গেলেন। সে কলিকাতা আর নাই, রাস্তা দিয়াকত কম লোকজন চলিতেছে, তেল বন্ধ হওয়ার দরুন মোটরগাড়ির সংখ্যা বহু কমিয়া গিয়াছে, রাত আটটার পর ঘুটঘুটে অন্ধকার!

পিটার লেনের মোড়ে ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল-বাড়িটার আর সে শ্রীছাঁদ নাই। গেটভিতর হইতে ভেজানো ছিল। ঢুকিয়া ক্ষেত্রবাবু ডাকিলেন, ও মথুরা-মথুরা!

নীচের তলায় ঘর হইতে কেবলরাম বাহির হইয়া আসিল। ক্ষেত্রবাবুকে দেখিয়া তাড়াতাড়িদুই হাত জোড় করিয়া মাথা নীচু করিয়া বলিল, কেমন আছেন বাবু?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, ও কেবলরাম, সাহেব কোথায় ?

কেবলরাম হতাশার সুরে দুই হাত তুলিয়া বলিল, তিনি কলকাতায় নেই। নাগপুরেগেছেন। আমার মাইনে চুকিয়ে দিয়ে গেলেন যাবার সময়।

—স্কুল!

—উঠে গিয়েছে বাবু।

—তবে তোকে মাইনে দিচ্ছে কে এখানে?

—হেডমাস্টার বললেন, তুই এখানে থাক্। চিঠিপত্র এলে তার নামে পাঠাতে বলে দিয়েছেন। যদি এর পরেস্কুল চলে—কিন্তু তা চলবে না বাবু, বাড়িওলার পাঁচ মাসের ভাড়াবাকি, শুনছি নাকি নোটিশ দিয়েছে।

—ছেলেপিলে কেউ আসে না?

—কে আসবে বাবু, কে আছে কলকাতায়? ওই পাশের গলির কেষ্ট আসে, আর আসে শিবরাম—ওই কুণ্ডু লেনের বাবুদের বাড়ির সেই দুষ্টু ছেলেটা। ওরা এসে খোঁজ নেয়, কবে স্কুলখুলবে। আমি বলি—যাও ছেলেরা, স্কুল যদি খোলে, খবর পাবে।

—মাস্টারেরা?

—কেবল হেডপণ্ডিত এসেছিলেন সাহেবের ঠিকানা নিতে। আর শ্রীশবাবু এসেছিলেনটাকার কী হল জানতে। আর কেউ আসে না। শ্রীশবাবু ঢাকায় চাকরি পেয়েছেন, জ্যোতির্বিনোদমশাই দেশের স্কুলে চাকরি নিয়েছেন।

—নাগপুরে সাহেব কী করছেন জানো? তার ঠিকানা কী?

—তিনি কী করছেন তা জানিনে। ঠিকানা নিয়ে যান, আমার কাছে সেদিনও চিঠিদিয়েছেন।

ক্ষেত্রবাবু ঠিকানা লইয়া বিষণ্ণ মনে স্কুল হইতে বাহির হইলেন। আজ সতেরো বৎসরের কত সুখ-দুঃখের লীলাভূমি, কত ছেলে এই দীর্ঘ সতেরো বছরে আসিয়াছে গিয়াছে, কত অস্পষ্টকাঁচা উৎসুক মুখ মনে পড়ে এখানকার মাটিতে আসিয়া দাঁড়াইলে। মুখই মনে পড়ে, মুখের অধিকারীর নাম মনে পড়ে না। ক্লার্কওয়েল সাহেব, যদুবাবু, জ্যোতির্বিনোদ, মি. আলম—আজ সকলের সঙ্গেই আর একবার দেখা করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু কে কোথায় আজ ছত্রভঙ্গ হইয়াগিয়াছে!

পুরানো চায়ের দোকানটিতে ঢুকিয়া ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, ওহে, চা দাও এক পেয়ালা।

দোকানী দেখিয়া ছুটিয়া আসিল : মাস্টারবাবু যে! আসুন, আসুন। ভাল সব?

—ভাল। তোমাদের সব ভাল ?

—আর কী করে ভাল হবে বাবু! আপনারা সব চলে গেলেন, তিন-তিনটে স্কুল কাছে, সব বন্ধ। বিক্রি-সিক্রি নেই, দোকান চলে কী করে বলুন?

ক্ষেত্রবাবু বসিয়া বসিয়া আপনমনে চা খাইতে লাগিলেন। কোথায় গেল সে পুরানোদিন! ওইখানটাতে বসিত জ্যোতির্বিনোদ, এখানটাতে রামেন্দুবাবু, ক্ষেত্রবাবুর পাশে সব সময়েই বসিত যদুদা, আর ওই হাতলহীন চেয়ারটা ছিল নারাণদার (আহা বেচারি! ভালই হইয়াছে স্বর্গেগিয়াছে, স্কুলের এ দুর্দশায় বেচারির প্রাণে বড়ই কষ্ট হইত।) বাঁধা-ধরা আসন। এখানে বসিয়াদুঃখের মধ্যেও কত আনন্দ, কত মজলিস করা গিয়াছে গত দশ-বারো চৌদ্দ বছর। আজ কেউনাই কোনো দিকে। সব ছত্রভঙ্গ।

স্কুল আর বসিবে না। কলিকাতার সব স্কুল যদিও দুই পাঁচ মাস পরে খোলে, তাহাদেরস্কুল আর বসিবে না। বসিতে পারে না—আর্থিক অবস্থা খারাপ। বাড়িওয়ালা আর মাসখানেকদেখিয়া 'টু লেট' ঝুলাইয়া দিবে। মাস্টারেরা পেটের ধান্ধায় যে যেখানে পারিয়াছে, চাকুরিতেঢুকিয়া পড়িয়াছে, নয়তো তাঁর মতো সুদূর পল্লীগ্রামে আত্মগোপন করিয়াছে।

ক্লার্কওয়েল সাহেবের মতো একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতীর আজ কী দুরবস্থা, তাহার খবর কেরাখে?

—ক' পয়সা?

—মাস্টারবাবু, আপনাদের খেয়েই মানুষ। এতদিন পরে পায়ের ধুলো দিলেন—একপেয়ালা চা খেয়েছেন, ওর আর কী দাম নেব? না মাস্টারবাবু, মাপ করবেন।

—আচ্ছা, আমাদের স্কুলের আর কোনো মাস্টার যদি এখানে চা খেতে আসে, তবেআমার কথা বোলো তাকে, কেমন তো? মনে থাকবে? আমার নাম ক্ষেত্রবাবু। বোলো—আমিতাদের কথা ভুলিনি, কেমন তো?

চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া দুই-একটি টুইশানির ছাত্রদের বাড়ি গেলেন। বাড়িতালাবন্ধ। মেয়েছেলে নাই, ভাবে মনে হইল। পুরুষেরা যদি বা থাকে, কর্মস্থল হইতে সকালসকাল ফিরিবার তাগিদ নাই। ক্ষেত্রবাবু অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতে লাগিলেন। ধর্মতলারকাছাকাছি আসিলে একটি তরুণ যুবক আসিয়া খপ করিয়া তাহার পায়ের উপর পড়িয়া ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিল, স্যার, ভাল আছেন? চিনতে পারেন?

—হ্যাঁ, রাজেন দেখছি যে! তা আর চিনতে পারব না? তুই কাদের সঙ্গে সঙ্গে যেন পাসকরি'ম, কোন্ বছর?

—বছর পাঁচ হয়ে গেল স্যার। মনে রেখেছেন, এই যথেষ্ট। আমি শিবুদের ব্যাচে পাসকরি। শিবুকে মনে আছে? শিবনাথ ভট্চাজ্জি—ক্ষীরোদ ডাক্তারের ছেলে।

ক্ষেত্রবাবু ভাল মনে করিতে পারিলেন না; কিন্তু বলিলেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কী করচিস্?

—এ. আর. পি. তে ঢুকেছি স্যার। বেকার বসেছিলাম, আজ অনেক দিন। এবার—

—বেশ, বেশ। আচ্ছা চলি।

সন্ধ্যার দেরি নাই। আবার সেই ব্ল্যাক-আউটের কলিকাতা। আর কলিকাতায় থাকিয়া লাভনাই। রাত সাড়ে আটটায় গাড়ি আছে শিয়ালদহে। ছেলেদের জন্য কিছু সস্তার বিস্কুট ওলেবেঞ্চুস কিনিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই ক্ষেত্রবাবু স্টেশনে আসিয়া জমিলেন।

যদুবাবু আজ মাস দুই শয্যাগত।

হাওড়া জেলার যে পল্লীগ্রামে তিনি গিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া দেখিলেন, ভগ্নীপতিরঘরবাড়ির অবস্থা যা, তাহাতে সেখানে মানুষের বাস করা চলে না। তবুও থাকিতে হইল, কী করিবেন—অভাব। কিন্তু মাসখানেক পরে যদুবাবুর ম্যালেরিয়া ধরিল। অর্থের অভাব, তদুপরি থাকিবার কষ্ট—এ গ্রামে আত্মীয়বন্ধু কেহ নাই, হাতেও নাই পয়সা।

গ্রামের নাম কমলাপুর, তারকেশ্বর লাইন হইয়া যাইতে হয়—শেওড়াফুলি হইতে পাঁচ-ছয়ক্রোশ দূরে। গ্রামের ভদ্রলোকেরা সকলেই ডেলি-প্যাসেঞ্জার, সকালে কেহ আটটা চল্লিশ, কেহনয়টা দশের ট্রেন ধরিয়া কলিকাতায় ছোটে, আবার ঝাড়নে বাজারহাট বাঁধিয়া বাড়ি ফেরে।যেটুকু গল্পগুজব করে—হয় আপিস, নয়তো ফুটবল, আজকাল অবশ্য যুদ্ধের গল্প।

পাশেই অবিনাশ বাঁড়ুজ্জের বাড়ি। কলিকাতা হইতে রাত নয়টার সময় প্রৌঢ় ভদ্রলোক বাড়ি ফিরিলে যদুবাবু উদ্বেগের সুরে জিজ্ঞাসা করেন, আজ যুদ্ধের খবর কী অবিনাশবাবু?

অবিনাশবাবু যুদ্ধের আলোচনা করিতে বসেন। তোজো বা ওয়াভেল বা চার্চিল যাহা নাভাবিয়াছেন, অবিনাশবাবু তাহা ভাবিয়া বুঝিয়া বিজ্ঞ হইয়া বসিয়া আছেন। সিঙ্গাপুর বা ব্রহ্মদেশকী করিলে রক্ষা পাইতে পারিত, ব্রিটিশের কী ভুল হইল, কোন্ পথ ধরিয়া কী ভাবে যুদ্ধ করিলেআপার বর্মা এখনও রক্ষা হয়—এসব কথা অবিনাশবাবু খুব ভালই জানেন। কলিকাতায় দিন পনেরোর মধ্যে বোমা পড়িবে, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। বোমারু বিমানের আক্রমণের চিত্র তাহার মতো কেহ আঁকিতে পারে না।

শুনিয়া শুনিয়া যদুবাবুর কী হইয়াছে, আজকাল তিনি যেন সর্বদাই সশঙ্ক।

একদিন রাত্রে আহার করিতে বসিয়া হঠাৎ উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন, এরোপ্লেনের শব্দেরমতো একটা শব্দ না?

স্ত্রীকে বলিলেন, দাঁড়াও, ও কিসের শব্দ গো?

—কই?

—ওই যে শোনো না—আলো সরাও, আলো ঘরে নিয়ে যাও, ঘরে নিয়ে যাও। জাপানিপ্লেন হতে পারে—

—তোমার হল কী ? ও তো গুবরে পোকা উড়ছে জানালার বাইরে।

—না না, গুবরে পোকা কে বললে? দেখে এসো আগে—দুধ দিতে হবে না, আগে দেখে এসো—

যদুবাবুর স্ত্রী ঝাঁটার আগায় পোকাটাকে উঠানে ফেলিয়া দিয়া বলিল, জাপানি এরোপ্লেন ঝাঁট দিয়ে তফাত করে রেখে এলাম গো। এখন নিশ্চিন্দি হয়ে বসে দুধ দিয়ে ভাত দুটি খাও। এক চাক্‌লা আম দিই!

সংসারের বড় কষ্ট, অথচ ভয়ে যদুবাবু কলিকাতায় গিয়া স্কুলে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার খোঁজখবর করিতে পারেন না। স্কুলে চিঠি লিখিয়াও জবাব পাইলেন না। ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থান, শরীরের মধ্যে অসুখ ঢুকিল—প্রায়ই অসুখে ভোগেন। অথচ ঔষধ নাই, পথ্য নাই। থাকিবারও খুব কষ্ট।

যদুবাবু বলেন, এর চেয়ে বেড়াবাড়ি ছিল ভাল।

যদুবাবুর স্ত্রী বলে, সেখানেও যে সুখ তা নয়, তবে তুমি সঙ্গে থাকলে আমি বনেওথাকতে পারি। সেবার তুমি আমায় ফেলে রেখে এলে একা—কী করে থাকি বলো তো?

যদুবাবু বলেন, তুমি অবনীর দিদিকে একখানা চিঠি লেখো। আম-কাঁঠালের সময় আসছে, চলো যাই। কতকাল বেড়াবাড়ি বাস করিনি। আসল কথা কী জানো, কলকাতা ছাড়া কোনোজায়গায় মন টেকে না। কথা বলবার মানুষ নেই—আমার যে সব বন্ধু ছিল কলকাতায়, তাদেরকেউ পোস্টমাস্টার, কেউ মার্চেন্ট অফিসের বড় কেরানী, দুশো টাকার কম মাইনে নয়। স্কুল মাস্টারকে সবাই খাতির করত। শিক্ষিত লোক শিক্ষিত লোকের মর্ম বোঝে।

—কেন, ওই অবিনাশবাবু—উনিও তো ভাল চাকরি করেন!

—ওই অবিনাশটা? আরে রামোঃ, রেল-আপিসে কাজ করে, সেকালের এন্ট্রান্স পাস—ওর দরের লোকের সঙ্গে কি আমাদের বনে? ওই দেখ না কেন, দুটো ছেলে রয়েছে, আমি তার বাড়ির পাশে একজন কলকাতার বড় স্কুলের মাস্টার, পড়া না কেন টুইশানি? দে না দশটা টাকামাসে ? এমন পাবি কোথায় তোদের এইপাড়াগাঁয়ে? পেটে বিদ্যে থাকলে তবে তো! রেলআপিসের কেরানী আর কত ভাল হবে!

অবনীর দিদিকে চিঠি লেখা হইল, কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে যদুবাবুএকদিন হঠাৎ জ্বর হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। যদুবাবুর স্ত্রী গিয়া অবিনাশবাবুর স্ত্রীর কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন। অবিনাশবাবু তখন অফিস হইতে ফেরেন নাই, তাহার চাকর পাঠাইয়া পাশেরগ্রামের ভূষণ ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলেন।

ভূষণ ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া বলিলেন, মাথায় হঠাৎ রক্ত উঠিয়া এমন হইয়াছে। খুব সাবধানে থাকা দরকার। চিকিৎসাপত্র করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ করিতে যদুবাবুর স্ত্রীকে শেষ সম্বল হাতের রুলি বিক্রয় করিতে হইল।

এই সময় হঠাৎ একদিন অবনী আসিয়া হাজির। সে একটা পুঁটলি হইতে গোটাকয়েককমলালেবু ও পোয়াটাক মিছিরি যদুবাবুর বিছানার এক পাশে রাখিয়া একগাল হাসিয়া বলিল, নিতে এসেছি দাদা, চলুন। বউদিদি দিদিকে পত্র লিখেছিলেন আপনার অসুখের খবর দিয়ে। দিদি বললেন—যাও ওদের গিয়ে এখানে নিয়ে এসো।

যদুবাবু মিনতির সুরে বলিলেন, তাই নিয়ে চলো ভায়া, এখানে আমার মন টেকে না।

—বউদিদি কই?

—বোধ হয় ঘাটে গিয়েছে। বোসো,আসছে এখুনি।

অবনীকে দেখিয়া যদুবাবু যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। নির্বান্ধব স্থানে তবুও একজন দেশেরলোক, জ্ঞাতির সান্নিধ্যলাভ কম কথা নয়!

অবনী ইহাদের সঙ্গে করিয়া বেড়াবাড়ি আনিয়া ফেলিল। যে ঘরে পূর্বে যদুবাবুর স্ত্রীর স্থান হইয়াছিল, সেই ঘরখানাতেই এবারও যদুবাবুরা আসিয়া উঠিলেন। ঘরখানা সেই রকমই আছে, বরং আরও খারাপ, আরও স্যাঁতসেঁতে। দেওয়ালে নোনা লাগার ছোপ আরও পরিস্ফুট হইয়াছে।

গ্রামে ডাক্তার নাই, আশপাশের ষোল খানা গ্রামের মধ্যে কুত্রাপি ডাক্তার নাই, দুই-একজনহাতুড়ে বদ্যি ছাড়া। তাহাদেরই একজন আসিয়া যদুবাবুকে দেখিল। পুরাতন জ্বরে ভাত খাওয়ারপরামর্শ দিল। বলিল, নাতি-খাতি সেরে যাবে অখন, ও গরম হয়েছে, গরমের দরুন অসুখডাসারছে না।

রুলি বিক্রয়ের টাকা ফুরাইয়া আসিতেছে দেখিয়া যদুবাবুর স্ত্রী স্বামীকে বলিল, হ্যাঁগো, কাল তো ওরা বলছিল—এক মণ চাল কিনতে হবে, অবনীর হাতে এখন টাকা নেই, তা তোমার ইয়েকে একবার বলো। আমি তোমাকে আর কী বলব, সব বিদ্যে তো জানি। এক মণ চালের দামদিতে গেলে তোমার ওষুধপথ্যির পয়সা থাকে না। অথচ ওদের হাঁড়িতে খাওয়াদাওয়া, না দিলেও তো মান থাকে না। কী করি?

যদুবাবু বিরক্তির সুরে বলিলেন, তোমাদের কেবল পয়সা আর পয়সা, একটা লোক শুষচেবিছানায়—জানি নে ও-সব, যাও এখান থেকে—

যদুবাবুর স্ত্রীর আর কোনো গহনাপত্র নাই, স্বামী বিশেষ কিছু দেন নাই, বরং বাপের বাড়ি হইতে আনীত যাহা কিছু ধুলাগুড়ো ছিল, তাহাও স্বামী ফুঁকিয়া দিয়াছেন অনেকদিন পূর্বে।

এখন উপায়? ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিবাহের সময় শ্বশুরের দেওয়া বেনারসী শাড়িখানা লুকাইয়া গ্রামের মধ্যে অবস্থাপন্ন রায়বাড়ির গিন্নির কাছে লইয়া গেল।

রায়বাড়ির গিন্নি বলিলেন,এসো এসো ভাই। কবে এলে? শুনলাম নাকি ঠাকুরপোর বড়অসুখ?

যদুবাবুর স্ত্রী কাঁদিয়া বলিল, সেই জন্যেই আসা। কলকাতার স্কুল উঠে গিয়েছে, হাতে এক পয়সা নেই, অথচ ওঁর অসুখ। আমার এই ফুলশয্যের বেনারসীখানা বিক্রি করে দিন। নইলে উপায় নেই। এই দেখুন ভাল কাপড়, এখনও নষ্ট হয়নি—এক জায়গায় কেবল একটু পোকায় কেটেচে—

রায়গিন্নির অবস্থা ভাল। দুই ছেলে চাকুরি করে, জমিজমাও আছে। বাড়ির কর্তা আগেকোর্টের নাজির ছিলেন—সেকালের নাজির, দুই পয়সা উপার্জন করিয়াছিলেন। একটি মেয়েবিধবা, বাপের বাড়ি থাকে, কিন্তু তাহার শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভালই—স্ত্রীধন হিসাবে কিছুকোম্পানির কাগজও আছে।

রায়গিন্নি বলিলেন, ফুলশয্যের বেনারসী কেন বিক্রি করবে ভাই? দু-পাঁচ টাকা দরকারথাকে, নিয়ে যাও। আবার যখন তোমার হাতে আসবে, দিয়ে যেয়ো।

যদুবাবুর স্ত্রী বলিল, না, আপনি একেবারে বিক্রি করিয়েই দিন। ধার করলে একদিন শোধদিতে হবে, তখন কোথায় পাব?

স্ত্রীর মুখে এ কথা শুনিয়া যদুবাবু চটিয়া গেলেন। বলিলেন, ধার দিতে চাচ্ছিল, নিলেইহত। কাপড়খানা থাকত, টাকাও চার-পাঁচটা আসত। কাপড়খানা ঘুচিয়ে দিয়ে এলে? এমনপাথুরে বোকা নিয়ে কি সংসার করা চলে?

যদুবাবুর স্ত্রী কোনো প্রতিবাদ করিল না। অবুঝ স্বামী, রোগ হইয়া আরও অবুঝ হইয়া গিয়াছে। তাহাকে মিষ্টি কথায় ভুলাইয়া রাখিতে হইবে, ছেলেমানুষকে যেমন লোকে ভোলায়।টাকাকড়ির বিষয়ে মানুষের সঙ্গে সোজাসুজি ব্যবহার ভাল। ফাঁকি দিয়া, ঠকাইয়া কতদিন চলে? স্বামীকে সে কথা বোঝানো শক্ত।

এদিকে অবনীদের ধারণা, যদুবাবু প্রভিডেন্ট ফান্ডের মোটা টাকা আনিয়াছেন সঙ্গে। স্বামীস্ত্রী লইয়া সংসার, এতদিন কলিকাতায় চাকরি করিয়াও দুই-পাঁচ হাজার বা ব্যাঙ্কে কোন নাজমাইয়া থাকিবেন? বাইরের লোকের সামনে অবনী বলে, দাদার হাতে পয়সা আছে। গভীর জলের মাছ, এ কি আর তুমি আমি?

যদুবাবুকে বলে, দাদা, টাকা ব্যাঙ্কে রাখা ভাল না, যে বাজার!

যদুবাবু বলেন, তা তো বটেই।

—তা আপনি যদি রেখে এসে থাকেন ব্যাঙ্কে, একদিন না হয় আমিই যাই—চেক লিখে দিন, টাকাটা উঠিয়ে আনি।যদুবাবু ভাঙেন তবু মচকান না। ব্যাঙ্কের ত্রিসীমানা দিয়া যে তিনি কস্মিনকালে হাঁটেন নাই, অবনীকে এই সোজা কথাটা বলিলেই হাঙ্গামা চুকিয়া যায়; কিন্তু তা তিনি বলিলেন না।এমন ভাবে কথা বলিলেন, যাহাতে অবনীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, দাদার অনেক টাকা কলিকাতারব্যাঙ্কে মজুত।

সেই দিন হইতে উহাদের দিক হইতে নানা ধরনের তাগিদ আসিতে লাগিল। আজ অবনীর মেয়ে উমার কাপড় নাই, কাল কাছারির খাজনা না দিলে মান থাকে না, পরশু অবনীর নিজের জুতা এমন ছিঁড়িয়াছে যে একজোড়া নতুন জুতা ভিন্ন ভদ্রসমাজে সে মুখ দেখাইতে পারিতেছে না। তা ছাড়া সংসারের বাজার-খরচের প্রায় সমুদায় ভার পড়িল যদুবাবুদের অর্থাৎযদুবাবুর স্ত্রীর উপর। ফলে বেনারসী শাড়ি বিক্রির পঁচিশ টাকা, দিন-কুড়ির মধ্যেই কয়েক আনাপয়সায় আসিয়া দাঁড়াইল।

যদুবাবুর স্ত্রী জানে, স্বামীর কাছে কিছু চাওয়া ভুল। তোরঙ্গের তলায় একটা সিঁদুরেরকৌটার মধ্যে বহুকালের দুল ভাঙা, নথের টুকরা, এক কুচি চুড়ির গুঁড়া, দুই-চারটা সিঁদুরমাখানোলক্ষ্মীর টাকা ইত্যাদি ছিল। সব গৃহিণীই এগুলি লুকাইয়া কুড়াইয়া রাখিয়া দেন, যদুবাবুর স্ত্রীও তাহা করিয়াছিলেন। কতকালের স্মৃতি-জড়ানো এই অতিপ্রিয় দ্রব্যগুলির দিকে চাহিয়া তাঁহারচোখে জল আসিল। শেষ সম্বল সোনার কুচি—লোকে কথায় বলে। সত্যিই সেই শেষসম্বলটুকুও কি হাতছাড়া করিতে হইবে, অবস্থা এত মন্দ হইয়া আসিয়াছে?

অবনী একদিন যদুবাবুর কাছে ভূমিকা ফাঁদিয়া বলিল, দাদা একটা কথা বলি। এ মাসে আমায় কিছু টাকা দিন। একটা গরু বিক্রি আছে আদাড়ি জেলেনীর, বাইশ টাকা দাম চায়—

এবেলা এক সের ওবেলা এক সের দুধ দিচ্ছে। আপনার অসুখের জন্যে দুধের তো দরকার।গরুটা কিনে রাখি, সব হাঙ্গামা মিটে যায়।

যদুবাবু স্বভাবসিদ্ধভাবে উত্তর দিলেন, তা—তা বেশ। মন্দ কী? হ্যাঁ, সে ভালই।

অবনী উৎসাহ পাইয়া বলিল, কবে দিচ্ছেন টাকাটা ? আজ না হয় পাঁচটা টাকা দিন, বায়নাকরে আসি। হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে—

আসলে সেদিন আড়ংঘাটার বাজারে অবনীর পাঁচ টাকা ধার শোধ দেওয়া ওয়াদাছিল, কুণ্ডুদের দোকানে অনেক দিনের দেনা, নতুবা তাহারা নালিশ রুজু করিবে বলিয়াশাসাইয়াছে।

যদুবাবু বলিলেন, তা এখন তো হয় না। তোমার বউদিদির কাছে চাবি। সে ঘাটে গিয়াছে।

যদুবাবুর উপর হইতে চাপ গিয়া পড়িল এবার তাঁহার বেচারি স্ত্রীর উপর। বউদিদি কেনদিবেন না, দাদা যখন বলিয়া দিয়াছেন ? আসল কথা, দাদা তো কঞ্জুস আছেনই, বউদিদি হাড়কঞ্জুস। হাত দিয়া জল গলে না।

করট ও ফিঙে পাখি গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিন ধরিয়া বাঁশঝাড়ে ডাকে, প্রস্ফুটিত তুঁতপুষ্পেরঘন সুবাসে যদুবাবুর জানালার বাহিরের বাতাস ভরপুর, রোগগ্রস্ত যদুবাবু নিজের বিছানায়বালিশে ঠেসান দিয়া বসিয়া বসিয়া শোনেন। সামনের নারিকেল গাছের গায়ে একটা গিরগিটি, যখনই যদুবাবু চাহিয়া দেখেন, সেই গিরগিটিটা ওই গাছের গায়ে একই জায়গায়।দেখিয়া দেখিয়া রুগ্ন উদ্‌ভ্রান্ত যদুবাবুর মনে হয়, ওই গিরগিটি তাহার এই বর্তমান শয্যাশায়ীঅবস্থার প্রতীক। ওটাও যেমন নারিকেল গাছের গায়ে অচল অনড়, তিনিও তেমনিই এইআলো-আনন্দহীন কক্ষে, পুরানো ভাঙা কোঠার কেমন একপ্রকার নোনা-ধরা গন্ধের মধ্যেশয্যাগত, উত্থানশক্তিরহিত।

কবে শরীর সারিবে কে জানে? যেদিন ওই গিরগিটিটা ওখান হইতে সরিয়া যাইবে?

অবনীর বড় ছেলে কালীকে ডাকিয়া বলিলেন, এই শোনো, ওই গিরগিটিটাকে ওখান থেকে তাড়াতে পারবি?

বালক অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কেন জ্যাঠামশাই?

—দে না, দরকার আছে।

—একটা কঞ্চি নিয়ে আসি জ্যাঠামশায়। খোঁচা দিয়ে তাড়াই। আপনি উঠবেন না, শুয়েশুয়ে দেখুন।

তাড়ানো হইল বটে, কিন্তু আবার পরদিন সকালে উঠিয়া যদুবাবু সভয়ে চাহিয়াদেখিলেন, গিরগিটিটা আবার সেই নারিকেলগাছের গায়ে স্বস্থানে জাঁকিয়া বসিয়া আছে। যদুবাবুহতাশ হইয়া বালিশের গায়ে ঠেস দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

অসুখ সারে না। দিন দিন দুর্বল হইয়া আসিতেছে দেহ, পাড়াগাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তারেরওষুধে ফল হয় না। জ্যৈষ্ঠ মাস গিয়া আষাঢ় মাস পড়িল। বর্ষার জলের সঙ্গে সঙ্গে হু-হু করিয়ামশককুল দেখা দিল, ফুটা ছাদ দিয়া জল পড়িতে লাগিল রোগীর বিছানায়, এক-এক দিন রাত্রে বিছানা গুটাইয়া ঘরের কোণে জড়সড় হইয়া স্বামী-স্ত্রীতে কাটাইতে হয়।

যদুবাবুর স্ত্রী বলে, কপালে এতও ছিল!

যদুবাবু চটিয়া বলেন, তুমি ও-রকম নাকে কেঁদো না বলে দিচ্ছি। কথায় বলে, পুরুষের দশ দশা। রেখেছিলাম তো কলকাতায় বাসা করে এতাবৎকাল। জাপানিদের তো আমি ডেকেআনিনি। পড়ে গিয়েছি বিপদে, তা এখন কী করি বলো? সুদিন আসে, কলকাতায় গিয়ে উঠব।আবার—তা বলে নাকে কেঁদে কী হবে?

যদুবাবুর স্ত্রী বলিল, আমার জন্যে কিছু বলিনি, তোমার জন্যেই বলি। তোমার কি এতকষ্ট করা অভ্যেস আছে কখনও? চিরকাল টুইশনি করে এসেছ, শীতকালে গরমজল করে দিয়েছি হাত-পা ধুতে তোমার ঠাণ্ডা সহ্যি হয় না কোনো কালে—

—আচ্ছা থাক্ থাক্, তার জন্যে নাকে কেঁদে কী হবে? আবার হবে সব—কেবল ওইঅবনীটার জ্বালায়—

কিন্তু লক্ষণ ক্রমশ খারাপ দেখা দিল। আষাঢ় মাস পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই যদুবাবু যেনআরও দুর্বল হইয়া পড়িলেন। জ্বর রোজ আসে, কোনোদিন ছাড়ে, কোনোদিন ছাড়ে না।

সেদিন জগন্নাথের স্নানযাত্রা। সকালের দিকে বৃষ্টি হইয়া দুপুরের পর বৃষ্টিধৌত সুনীলআকাশে ঝলমলে সোনালী রোদ উঠিল। আতাগাছটাতে, ফুটন্ত ফুলে ভরা আকন্দগাছটাতে, বাঁশঝাড়ের মাথায় অদ্ভুত রঙের রোদ মাখানো। আতাফুলের কুঁড়ির মৃদু সুবাস শৈশবের কথাস্মরণ করাইয়া দেয়।

অবনীর মেয়ে টুনি বলিতেছে, মা, আমি পঞ্চমীর পালুনি করে পান্ত ভাত খেতে পারবনা কিন্তু বলে দিচ্ছি, চিঁড়ে খাব।

যদুবাবুর মনে পড়িল, তাহার মা যদুবাবুর বাল্যদিনে মনসার পালুনি করিয়া পাতে যেচিঁড়ার ফলার রাখিয়া উঠিতেন, তাহা খাইবার জন্য তাহাদের দুই ভাইবোনে কাড়াকাড়ি পড়িয়াযাইত। কোথায় সে বাল্যকালের মা, কোথায় বা সেই ছোট বোন মঙ্গলা। চল্লিশ বছরের ঘন কুয়াশায় তাহাদের মুখ মনের দর্পণে আজ অস্পষ্ট।...

তারপর কতকাল গ্রামছাড়া। ১৯০০ সালের পর আর গ্রামে এভাবে বাস করা হয় নাই।সেই সালেই যদুবাবু এন্ট্রান্স পাস করেন বোয়ালমারি হাই স্কুল হইতে। দাড়িওয়ালা বৃদ্ধরামকিঙ্কর বসু ছিলেন হেডমাস্টার। যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনই বেতের বহর ছিল তাঁহার। রামকিঙ্কর বোসের বেত খাইয়া অনেক ডেপুটি মুন্সেফ পয়দা হইয়া গিয়াছে সেকালে।

যদুবাবুকে বলিয়াছেন—যদু, তুমি বড় ফাঁকিবাজ, টেস্ট পরীক্ষায় টুকে পাস করলে, চিরকালই পরের টুকে পাস করলে,জীবনের পরীক্ষায় যেন এরকম ফাঁকি দিয়ো না, বড্ড ফাঁকেপড়ে যাবে।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। কী সুন্দর অপরাহ্ণে নীল আকাশ! কী সুন্দর সোনার রঙেরসূর্যালোক! ছোট গোয়ালে-লতার ঝোপে একজোড়া বনটিয়া আসিয়া বসিল। ছেলেবেলায় যদুবাবুপাখি বড় ভালবাসিতেন। পদা বুনো নামে তাঁহাদের এক পৈতৃক প্রজা ছিল, তাহার সঙ্গে মিশিয়াফাঁদ পাতিয়া জলচর পক্ষী ধরিতেন—মরাল, পানকৌড়ি, বক, শামকুড়—কতকাল এসব দেখেননাই! গানের তাল কবে কাটিয়াছিল, স্মরণ নাই। বর্তমানের সঙ্গে অতীতের অনতিক্রমণীয়ব্যবধান।

যেন তাঁহার নবদৃষ্টি জাগ্রত হইয়াছে এই রোগশয্যায়। টুইশানির ছুটাছুটি নাই, সারাদিনঠেসান দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকা। কতকাল এত দীর্ঘ অবকাশ ভোগ করেন নাই।ভগবানের কথা কখনও ভাবেন নাই, আজ মনে হইল—তিনি আছেন। না থাকিলে এই সুন্দরস্মৃতির বাস্তবতা কোথা হইতে আসিল? ভগবান না থাকিলে ওই অনাথা নিঃসম্বল বিধবাকে কেদেখিবে? তাহার দিন ফুরাইয়াছে, তিনি জানেন।

জীবন কি ফাঁকি দিয়া কাটাইলেন।

সুদীর্ঘ জীবনের বহু কথা আজ যেন মনে পড়িতেছে, গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরেরকর্মজীবনের ইতিহাস—না, ফাঁকি কেন দিবেন? ফাঁকি দেন নাই। নারাণদা সাধুপুরুষ ছিলেন—স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন—নারাণদা বলিতেন, জীবনকে সার্থক করিতে হইলে তাহাকে মানুষেরকোনো না কোনো কাজে, সমাজের কোনো না কোনো উপকারে লাগানো চাই।

তিনিও জীবনকে বৃথা যাইতে দেন নাই। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কত ছাত্র লেখাপড়াশিখিয়া তাহার হাতে মানুষ হইয়াছে। হয় নাই কি? নিশ্চয়ই হইয়াছে। সেই সব ছেলেই সাক্ষী আজ, পরকালে মৃত্যুপারের দেশের বড় দরবারে তাহারা সে সাক্ষ্য দিবে একদিন, যদুবাবু আশাকরেন।

দুই-একটা অন্যায় কাজ, দুই-একটা—চুরি ঠিক বলা যায় না—চুরি নয়, তবে হ্যাঁ, একটুআধটু খারাপ কাজ যে না করিয়াছেন এমন নয়। তিনি তাহা স্বীকারই করিতেছেন। ভগবান গরিব মানুষের অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

বেলা গেল।...

গিরগিটিটা নারিকেলগাছের গুঁড়িতে ঠায় বসিয়া আছে.. ভগবান দয়াময়, গরিবের অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

যদুবাবুর স্ত্রী এক বাটি বার্লি লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, নেবু দিয়ে বার্লি দেব, না মিছরিদেব? পরে থামিয়া বলিল, আজ গুনে দেখলাম, এগারোখানা আমসত্ত্ব হয়েছে, বুঝলে? কলকাতার বাসায় নিয়ে যাব হাঙ্গামা মিটে গেলে। তুমি দুধ দিয়ে খেতে ভালবাস বলে আমসত্ত্ব দিলাম মরে-কুটে—সেরে ওঠো তুমি।

স্ত্রীকে হঠাৎ বিস্মিত করিয়া দিয়া তিনি তাহাকে পুরানো আমলের আদরের সুরে অনেকদিন পরে বলিলেন, বিছানায় এসে কাছে একটুখানি বোসো না! এসো—

ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল দিন-পাঁচ ছয় খুলিয়াছে। দুই-তিনজন ব্যতীত অন্য সব শিক্ষকআসিয়াছেন। আসেন নাই কেবল জ্যোতির্বিনোদ আর শ্রীশবাবু। তাহারা দেশের স্কুলে চাকরিপাইয়াছেন। ছেলেরাও বেশি নাই, এ-ক্লাসে পাঁচজন ও-ক্লাসে দশজন। অনেকে বলিতেছে—স্কুলটিকিবে না।

আর আসেন নাই যদুবাবু। সাহেবের সারকুলার-বই লইয়া কেবলরাম ক্লাসে ক্লাসেফিরিতেছে—স্কুলের সুযোগ্য প্রবীণ শিক্ষক যদুগোপাল মুখুজ্জের পরলোকগমনে স্কুল দুই দিন বন্ধরহিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় একাদিক্রমে উনিশ বৎসর এই স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া ছাত্র ও শিক্ষক সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে স্কুলের যে অপরিসীম ক্ষতিহইল..ইত্যাদি ইত্যাদি।